Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.06.18 19:32:10 +06'00'

সমগ্র কিশোর সাহিত্য

- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

www.boiRboi.blogspot.com

সূচীপত্র

গল্প :

নিদারুণ প্রতিশোধ	১
আল্-কাবলি	৪
জগন্নাথের ঠ্যাঙা	৯
একাদশীর রাঁচী যাত্রা	১৩
দুর্যোধনের প্রতিহিংসা	১৭
তালিয়াং	২৩
ন্যাংচাদার 'হাহাকার'	২৭
হারানো মেডেল	৩৩
প্রভাত সঙ্গীত	৩৫
গুরুপ্রাপ্তি	৪১
চুল কাটার ভয়ে	৪৫
ভূতুড়ে কামরা	৪৮
একটি খুনের ঘটনা	৫২
ভূত মানে ভূত	৫৬
টুটুনের প্রতিজ্ঞা	৫৯
দিবা দ্বিপ্রহরে	৬২
তিন আনার আমের জন্যে	৬৪
ছেলে ধরার ইতিহাস	৬৭
পুরুষ	৭১
দুপুর বেলার লোকটা	৭৫
জয়দ্রথ বধ	৭৯

উপন্যাস :

কম্বল নিরুদ্দেশ	৮৫
জয়ধ্বজের জয়রথ	১২৬
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ	১৫৬
রাঘবের জয়যাত্রা	১৭৮

প্রবন্ধ :

রামমোহন	২২৩
রবীন্দ্রনাথ	২৪৭

নাটক :

ভীম বধ	২৫১
পরের উপকার করিও না	২৫৮

উপাখ্যান :

কমলাসাগরের উপাখ্যান	২৬৭

www.boiRboi.blogspot.com

নিদারুণ প্রতিশোধ

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে পটলডাঙার টেনিদা বেশ মন দিয়ে তেলে-ভাজা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই কপকপ করে বাকী বেগুনী দুটো মুখে পুরে দিয়ে বললে, এই যে শ্রীমান প্যালারাম, কাল বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে? খেলার মাঠে তোর যে টিকিটাও দেখতে পেলুম না, বলি ব্যাপারখানা কী?

আমি বললুম, আমি মেজদার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম।—বটে—বটে! তা কী রকম দেখলি?—খাসা! ডি-লা-গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস্ যাকে বলে! হাতী-বাঘ, সিংগি, ফ্লায়িং ট্রাপিজ্, মোটর সাইকেল কত কী! কিন্তু জানো টেনিদা সব চাইতে ভালো হল শিম্পাজীর খেলা। চা খেলো, চুরুট ধরালো—আরে ছোঃ ছোঃ!—টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে পাতিনেবুর মত করে বললে, রেখে দে তোর শিম্পাজী। আমার কুট্টি মামার বন্ধু রামগিদ্ধড়বাবু একবার একটা গোদা হনুমানের যে খেল্ দেখেছিলেন, তার কাছে কোথায় লাগে তোর সার্কাসের শিম্পাজী! নস্যি—স্রেফ্ নস্যি।—তাই নাকি?—আমি টেনিদার কাছে ঘন হয়ে বললুম: রামগিদ্ধড়বাবু কোথায় দেখলেন সে খেলা?—উড়িষ্যায়।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, বুঝেছি। পুরীতে গিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে আমি কয়েকটা বড়ো হনুমান দেখেছিলুম।

ধ্যাত্তোর পুরী! ওগুলো আবার মনিষ্যি—থুড়ি হনুমান নাকি? গাদা গাদা জগন্নাথের পেসাদ খেয়ে নাদাপেট নিয়ে বসে আছে—গলায় একটা করে মাদুলি পরিয়ে দিলেই হয়। হনুমান দেখতে গেলে জঙ্গলে যেতে হয়, মানে কেওনঝড়ের জঙ্গলে।

—কেওনঝড়! সে আবার কোথায়?—তাই যদি জানবি, তা হলে পটলডাঙায় বসে পটোল দিয়ে সিংগি মাছের ঝোল খাবি কেন র‍্যা? নে, গপ্পো শুনবি তো এখন মুখে ইস্কুপ এঁটে চুপটি করে বসে থাক্—বকের মত বক্‌বক্ করিস্ নি।

বক তো বক্‌বক্ করে না—ক্যাঁ-ক্যাঁ করে। চোপ রাও! বক বক্‌বক্ করে না? তা হলে তো কোনদিন বলে বসবি কাক কা-কা করে না, পাঁঠার মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ডাকে?

—হয়েছে, হয়েছে, তুমি বলে যাও!—বলবই তো, তোকে আমি তোয়াক্কা করি নাকি? এখন আমাকে ডিস্টার্ব করিস নি। মন দিয়ে রামগিদ্ধড়বাবুর গল্প শুনে যা—বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে পারবি। হয়েছে কি, রামগিদ্ধড়বাবু কনট্রাক্টারের কাজ করতেন। মানে, পুল-টুল রাস্তাঘাট এইসব বানাতে হত তাঁকে। সেই কাজেই তাঁকে সেবার কেওনঝড়ের জঙ্গলে যেতে হয়েছিল।

কুলি, তাঁবু, জীপগাড়ী—এইসব নিয়ে সে এক এলাহী কাণ্ড! বনের ভেতরেই একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখে রামগিদ্ধড় তাঁবু ফেলেছেন। মাইল দুই দূরে পাহাড়ী নদীর ওপর একটা পুল তৈরী হচ্ছে, সকালে বিকালে সেখানে জীপ নিয়ে রামগিদ্ধড়বাবু কাজ দেখতে যান।

জঙ্গলে এনতার হনুমান, গাছে গাছে তাদের আস্তানা। কিন্তু লোকজনের উৎপাতে আর জীপের আওয়াজে তারা এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। রামচন্দ্রজী তো

২৮৮৫

আর নেই—কার ওপরে আর ভরসা রাখবে বল্? কুলিরা অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঢোল আর খঞ্জনী বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' বলে গান গাইত, কিন্তু সেই বিকট চীৎকার শুনে কি আর অবোলা জীব কাছে আসতে সাহস পায়?

তবু একটা কাণ্ড ঘটল।

সেদিন দুপুরবেলা তাঁবুর বাইরে বসে রামগিন্ধড় চাপাটি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, সামনে গাছের ডালে বসে একটা গোদা হনুমান জুলজুল্ করে তাকাচ্ছে। মুখের চেহারাটা ভারী করুণ—'কাঙালকে কিছু দিয়ে দিন দাতা'—ভাবখানা এই রকম।

রামগিন্ধড়বাবুর ভারী মায়া হল। একটা চাপাটি ছুঁড়ে দিলেন, হনুমান সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথাটা একবার সামনে ঝুঁকিয়ে দিলে, যেন বললে, 'সেলাম হুজুর।' তার পরেই টুপ করে গাছের ডালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পরের দিন রামগিন্ধড় যেই খেতে বসেছেন, ঠিক হনুমানটা এসে হাজির। আজও রামগিন্ধড় তাকে একটা চাপাটি দিলেন, সে-ও তেমনি করেই তাঁকে সেলাম দিয়ে, চাপাটি নিয়ে উধাও হল।

এমনি চলতে লাগল মাসখানেক ধরে। রোজ খাওয়ার সময় হনুমানটা আসে, তার বরাদ্দ চাপাটিখানা নিয়ে চলে যায়, যাওয়ার সময় তেমনি মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে। আর কোন রকম বিরক্ত করে না, কোনোদিন একখানার বদলে দুখানা চাপাটি চায় না। মানে সেই বর্ণ-পরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মতো আর কি—যাহা পায়, তাহাই খায়।

তা খাচ্ছিল, চলছিলও বেশ, রামগিন্ধড়বাবুই একদিন গোলমালটা পাকিয়ে বসলেন। সেদিন কুলিদের সঙ্গে বকাবকি করে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ—অন্যমনস্ক-ভাবে খেয়েই চলেছেন। ওদিকে সেই গোপাল-মার্কা সুবোধ হনুমান যে কখন থেকে ঠায় বসে আছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। ধীরে-সুস্থে সব কটা চাপাটি চিবুলেন, বড় একবাটি দুধ খেলেন, তারপর মোটাসোটা গোঁফজোড়া মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। হনুমানের কথা তাঁর মনেও পড়ল না।

পরদিন যেই চাপাটির থালা নিয়ে বসেছেন—অমনি 'হুপ্' করে এক আওয়াজ। ব্যাপার কি যে হল ভাল করে ঠাহর করবার আগেই রামগিন্ধড় দেখলেন, থালার আটখানা চাপাটি বেমালুম ভ্যানিশ্। তাঁর নাকের সামনে মস্ত একটা ল্যাজ একবার চাবুকের মতো দুলে গেল, 'হুপ' করে শব্দ, আর একবার গাছের ডাল ঝর্ ঝর্ করে নড়ে উঠল—বাস, কোথাও আর কিছু নেই।

দু একজন কুলি হৈ হৈ করে উঠল, ঠাকুর হায়-হায় করতে লাগল আর রাম-গিন্ধড় স্রেফ্ হাঁ করে রইলেন। আঁ—এইসা বেইমানি! রোজ রোজ হতচ্ছাড়া হনুমানকো চাপাটি খিলাচ্ছি—আর সে কিনা অ্যায়সা বেতমিজ। আর কোনো জানোয়ার হলে রামগিন্ধড় তাকে গুলি করে মারতেন, কিন্তু মহাবীরজীর জাতভাইকে তো আর সত্যিই গুলি করা যায় না। সে তো মহাপাপ।

রাগের চোটে রামগিন্ধড় মুখের এক গোছা গোঁফই টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, দাঁড়াও—রামগিন্ধড় চৌধুরী খাস বালিয়া জিলার রাজপুত! আমিও তোমায় ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। পরদিন ঠাকুর-কে ডেকে বললেন, এখানে সব চাইতে ঝাল যে মিরচাই—মানে লঙ্কা পাওয়া যায়, তারই বাটনা করো ছটাকখানেক। আর তাই দিয়ে তৈরী কর্ দুখানা চাপাটি। তারপর আমি দেখে নিচ্ছি হনুমানজীকে—

খেতে বসেই কোনদিকে না তাকিয়ে—মানে থালাসুদ্ধ লোপাট হওয়ার কোনো

www.boiRboi.blogspot.com

চান্স্ না দিয়েই রামগিন্ধড় সেই লংকাবাটা ভর্তি চাপাটি দুখানা ছুঁড়ে দিলেন মাটিতে। আবার শব্দ হল 'হুপ্'—হনুমান নেমে পড়ল, কুড়িয়ে নিলে চাপাটি, রোজকার মতো সেলাম করলে, তারপরেই টুপ করে গাছের ডালে। রামগিন্ধড়ের কুলিরা তাঁর দুপাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল যাতে কোনো অঘটন না ঘটে। আর দু মিনিটের ভেতরেই গাছের ওপর থেকে নিদারুণ এক চিৎকার শোনা গেল। হনুমান এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, আওয়াজ হতে লাগল : খ্যাঁ—খ্যাঁ—খ্যাঁ, খোঁ—খোঁ উপুস্—গুপুস্! পাখিরা চিৎকার করে পালাতে লাগল, গাছের ছেঁড়া পাতা উড়তে লাগল চারদিকে। মানে, দ্বিতীয়বার হনুমানের মুখ পুড়ল, ওর শুরু হয়ে গেল দস্তুরমতো লংকাকাণ্ড!

গাছ থেকে হনুমান চেঁচাতে লাগল : খ্যাঁ-খ্যাঁ-খ্যোঃ-খ্যোঃ, আর নীচ থেকে সদল-বলে রামগিন্ধড় হাসতে লাগলেন : হ্যাঃ—হ্যাঃ—হোঃ—হোঃ! হনুমান আজ আচ্ছা জব্দ হয়েছে। রামগিন্ধড়ের চাপাটি লুট! মানুষ চেনো না! বোঝো এখন।

খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে হনুমান কোন্‌দিকে ছটকে পড়ল কে জানে। আর রামগিন্ধড় আরো আধঘন্টা ভুঁড়িকাঁপানো অট্টহাসি হেসে তাঁর সেই জীপ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাজ দেখতে। হনুমানের মুখ পুড়িয়ে মনে মনে তো বেজায় খুশি হয়েছেন, কিন্তু রামায়ণে রাবণের যে কী দশা হয়েছিল, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন তখন, টের পেলেন বিকেলেই।

কাজ দেখে যখন ফিরে আসছেন, বনের মধ্যে তখন ছায়া নেমেছে। দিব্যি ঝির-ঝিরে হাওয়া বইছে, চারিদিকে পাখিটাখি ডাকছে, রামগিন্ধড়ের মেজাজটাও ভারি খুশি হয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে জীপ চলেছে আর রামগিন্ধড় গুণগুণ করে গান গাইছেন : আরে হাঁ—বনুমে চলে রামচন্দ্রজী, সাথমে চলে লছমন ভাই—এই সময় জীপের ড্রাইভার বটকুল সিং বললে, আরে এ কোন্ বেকুবের কাণ্ড। রাস্তাজুড়ে গাছের ডাল ভেঙে রেখেছে! এখন যাই কী করে? রামগিন্ধড় দেখলেন তাই বটে। ছোট বড়ো ডালপালা দিয়ে বনের ছোট পথটি যেন একেবারে ব্যারিকেড্ করে রাখা হয়েছে। বুনো লোকগুলোর কারবারই আলাদা! বিরক্ত হয়ে বললেন, গাড়ী থামিয়ে রাস্তা সাফা করো বটকুল সিং! বটকুল সিং জীপ থেকে নেমে রাস্তা পরিষ্কার করতে যাচ্ছে, আর ঠিক তখন—গুপ—গাপ, হুপ—হুপ—গবাং—

সমস্ত বন যেন একসঙ্গে ডাক ছেড়ে উঠল। গাছের মাথায় মাথায় ঝড় বয়ে গেল, আর বললে বিশ্বাস করবিনে প্যালা, দুপ-দাপ শব্দে কোত্থেকে কমসে কম দেড়শো হনুমান লাফিয়ে পড়ে রামগিন্ধড়বাবুর জীপ গাড়ী ঘেরাও করে ফেললে। দ্বিতীয় লংকাকাণ্ডের পর এ যেন দ্বিতীয় রাবণ বধের ব্যবস্থা।

ব্যাপার দেখেই তো বটকুল সিংয়ের হয়ে গেছে! সে তো 'আরে বাপ' বলে বন-বাদাড় ভেঙে দৌড়! রামগিন্ধড়ও জীপ থেকে লাফিয়ে পড়লেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোদা হনুমান তাঁকে জাপটে ধরলে।

—বাবারে মা-রে—গেছিরে—বলে পরিত্রাহি হাঁক ছাড়লেন রামগিন্ধড়, কিন্তু দেড়শো হনুমানের গুপ গাপ শব্দে তাঁর চ্যাঁচানি কোথায় তলিয়ে গেল। তখন কী হল বল্ দিকি? দুটো হনুমান তাঁর দুকান শক্ত করে পাকড়ে ধরলে, একটা তাঁর দু গালে ঠাই ঠাই করে বেশ ক'বার চড়িয়ে দিলে।

—জান গিয়া জান গিয়া—বলে যেই রামগিন্ধড় চেঁচিয়ে উঠে হাঁক ছেড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই যে হনুমান—সকালে যাকে খুব জব্দ করেছিলেন, সে রামগিন্ধড়ের মুখের ভেতর একখানা চাপাটি গলা পর্যন্ত ঠেসে দিলে।

কোন্ চাপাটি বুঝেছিস তো? মানে, লঙ্কা বাটায় লাল টুকটুকে সেই দোসরা নম্বরের চীজটি। জিভে সেটা লাগতে না লাগতেই রামগিন্ধড়ের মুখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। একবার ফেলে দিতে গেলেন মুখ থেকে—কিন্তু সাধ্য কী! তক্ষুনি দু'গালে ধাম্ ধাম্ করে দুই থাপ্পড়!

অগত্যা রামগিন্ধড় নিজের কীর্তি সেই চাপাটি খেলেন, মানে খেতেই হল তাঁকে। দেড়শো হনুমানের সঙ্গে তো আর চালাকি নয়। দেড়শো হাতের দেড়শোটি চাঁটি খেলে রামাগন্ধড়ও রাম-ইঁদুর হয়ে যাবেন। কিন্তু চাঁটি বাঁচাতে যা খেলেন তা চাপাটি নয়—সোজাসুজি দাবানল—যাকে বলে! চিবুনি দিতেই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, মনে হতে লাগল গলা থেকে চাঁদি পর্যন্ত কী বলে—একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলছে! রামগিন্ধড় কেবল তারস্বরে বলতে পারলেন: জল—তার পরেই সব অন্ধকার!

ওদিকে কুলির দল আর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বটকুল যখন ফিরে এল, তখন হনুমানদের এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই। কেবল রামগিন্ধড় পথের মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর সেই চাপাটির চোট সামলাতে পাক্কা একটি মাস হাসপাতালে।

তাই বলছিলুম, আমার কাছে সার্কাসের শিম্পাঞ্জীর গপ্পো আর করিসনি। আসল খেল্ দেখতে চাস তো সোজা কেওনঝড়ের জঙ্গলে চলে যা!

এই বলে পটলডাঙ্গার টেনিদা আমার চাঁদিতে কড়াং করে একটা গাঁট্টা মারল আর তার পরেই তিন চারটে বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে সোজা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে হাওয়া হয়ে গেল।

আলু-কাবলি

সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে প্রোফেসার গড়গড়ি দেখতে পেলেন, সামনের ছোট মাঠটার ভেতরে দুটি ছেলে মারামারি করছে।

দু' জনকেই স্কুলের ছাত্র বলে মনে হল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের মতো বয়েস হবে। একটি বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান, আর একটি রোগা পটকা। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, রোগা ছেলেটিই মার খাচ্ছিল, জোয়ানটি তাকে ইচ্ছামতন পিটিয়ে যাচ্ছিল।

আর কেউ হলে মাঝে পড়ে থামিয়ে দিত, কিন্তু প্রোফেসার গড়গড়ি তা করলেন না। অনেকদিন তিনি বিলেতে ছিলেন। সে দেশের পথে-ঘাটেও ছেলেদের তিনি

মারামারি করতে দেখেছেন। আর এও দেখেছেন—ওপর-পড়া হয়ে আগে থেকেই কেউ থামিয়ে দেয় না—একজন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে, জয়-পরাজয়ের একটা মীমাংসা হলে, তখনই তারা ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এখন সব মিটে গেছে, এবার বন্ধুর মতো হ্যান্ডশেক করে বাড়ি চলে যাও।'

সুতরাং প্রোফেসার গড়গড়ি মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে, মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। রোগা ছেলেটি এখনো হার মানে নি, প্রচুর মার খেয়েও সমানে হাত চালিয়ে যাচ্ছে, অতএব এখনো তাঁর কিছু করবার নেই। সময় হলে তবেই তিনি আসরে নামবেন।

নতুন বাড়ি করে এই পাড়ায় তিনি এসেছেন মাত্র দিন তিনেক হল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বলতে গেলে আলাপই হয়নি, আর পাড়ার ছেলেরা তো তাঁকে চেনেই না। যদি চিনত তাহলে জানতে পারত এই লম্বা রোগা মাঝবয়েসী লোকটির শরীর একেবারে ইস্পাতে গড়া। দু হাতে তিনি সিংহের শক্তি ধরেন; জানতে পারত সোজা খাড়া শরীরটার মতই তাঁর মনের মধ্যেও কোনো ঘোর-পাঁচ নেই। প্রোফেসার গড়গড়ি ন্যায়-বিচার পছন্দ করেন আর সে কাজটা চটপট সেরে ফেলাই তাঁর অভ্যাস।

তাঁর ন্যায়-বিচারের একটা নমুনা দিই। প্রোফেসার গড়গড়ি মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু বাজে খরচ ভালোবাসেন না, মোটা চালে চলেন, ট্রেনে থার্ড ক্লাসে ওঠেন। সেবার কোন্ একটা স্টেশন থেকে রাত আটটা নাগাদ গাড়ীতে উঠেছেন। ট্রেনে খুব একটা ভিড় ছিল তা নয়, সবাই-ই বসে যেতে পারে, তবু কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে। কারণটা আর কিছুই নয়—একটি দশাসই চেহারার লোক একখানা গোটা বেঞ্চি জুড়ে পরম আরামে লম্বা হয়ে রয়েছে।

রাত আটটার সময় একজন বয়স্ক লোকের কিছুতেই এভাবে শুয়ে পড়া উচিত নয়—একথা প্রোফেসার গড়গড়ির মনে হল। মনে আরো অনেকেরই হয়েছিল, কিন্তু লোকটির ভীমের মত চেহারা আর প্রকাণ্ড গোঁফজোড়া দেখে কেউ আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি—নির্বিবাদেই চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। প্রোফেসার গড়গড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হলেন না। লোকটাকে একটু ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন: 'এ জী!'

লোকটা চোখ পাকিয়ে তাকালো। বললে, 'কেয়া?'

প্রোফেসার গড়গড়ির হিন্দী ভালো আসে না। তবু যতটা পারেন সাজিয়ে গুজিয়ে, বেশ গরম গলায় বললেন, 'আপ কি চারঠো টিকিট কিয়া হায়?'

লোকটি ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেয়া মৎলব?'

'মৎলব এই হায় কি, চারঠো টিকিট নেহি কিয়া তো চার আদ্‌মির জায়গা দখল করকে কেন শুয়ে পড়া হায়। উঠিয়ে—হাম্‌লোগ ভি বৈঠেংগে।'

লোকটি সংক্ষেপে বললে, 'তবিয়ৎ খারাপ হ্যায়।'

'তবিয়ৎ খারাপ? দেখকে তো সে রকম মনে নেহি হোতা হায়। বেশ তাগড়াই চেহারাই তো মালুম হচ্ছে। কেয়া বিমার?'—বলেই প্রোফেসার গড়গড়ি তার গায়ে হাত দিলেন: শরীর তো বেশ ঠাণ্ডা—'বোখার-টোখার তো শুরু নেহি হুয়া।'

লোকটা যদি বলত যে পেটে ব্যথা-ট্যথা কিছু হচ্ছে, তা হলে—মনে মনে সন্দেহ থাকলেও প্রোফেসার গড়গড়ি সেটা বিশ্বাস করতে রাজী হতেন। কিন্তু দশাসই লোকটা সেদিক দিয়েই গেল না। গড়গড়ির হাতটা গায়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'যাঃ—ভাগ। হাম শুতে রহেংগে—হামারা খুশি।'

'শুতে রহেংগে? আপকো খুশি?' প্রোফেসার গড়গড়ি বললেন, 'তা হলে প্ল্যাটফর্মে গিয়েই শুয়ে থাকা হোক, সেখানে অনেক জায়গা হ্যায়।'

বলেই, আর এক সেকেন্ডও দেরী না করে—লোকটিকে সোজা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেললেন আর পত্রপাঠ তাকে প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—কম্বল-টম্বল সবসুদ্ধুই একেবারে।

গাড়ীসুদ্ধু লোক থ! যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে বেঞ্চিতে বসে পড়ে প্রোফেসার গড়গড়ি ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরালেন, অন্য যাত্রীদের ডাক দিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন—জায়গা তো রয়েছে।'

আর লোকটি? প্ল্যাটফর্মে খানিকক্ষণ হাঁ করে বসে থেকে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে, একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে—সেই যে কামরার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল আর ভেতর-মুখো হল না।

প্রোফেসার গড়গড়ি এইরকম ন্যায়পরায়ণ লোক। বাড়ির গোয়ালা নিয়মিত দুধে জল দিচ্ছিল—অল্প-স্বল্প ওরা দেয়ই, গড়গড়ি কিছু মাইন্ড করেন নি। কিন্তু তাঁকে চুপচাপ দেখে গোয়ালার সাহস বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দুধটা শুধু রইল রঙেই—বাকীটা স্রেফ কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ কলের জল।

তখন প্রোফেসার গড়গড়ি একদিন গোয়ালাকে ডেকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। বললেন, 'অতি লোভ ভালো নয়, তার ফল ভবিষ্যতে খারাপ হয়।' গোয়ালা মন দিয়ে সব শুনে মাথা নেড়ে চলে গেল আর পরের দিনই জলের মাত্রা আরো একটু বাড়িয়ে দিলে।

অগত্যা প্রোফেসার গড়গড়িকে ন্যায়-বিচারের দায়িত্বটা নিতেই হল। তিনি একদিন গোয়ালাকে জাপটে ধরলেন, তারপর দারুণ শীতের সকালে বাড়ির চৌবাচ্চা থেকে পাক্কা তিন ঘটি কনকনে জল গোয়ালাকে জোর করে গিলিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজেই দ্যাখো এবার, জল খেতে কেমন লাগে।'

গোয়ালা পালিয়ে গেল, পরদিন এল আর এক নতুন গোয়ালা। কিন্তু এর পর থেকে গড়গড়ি একেবারে নির্জলা খাঁটি দুধ পেতে লাগলেন।

এ-হেন ন্যায়-পরায়ণ লোক দুটি ছেলেকে মারামারি করতে দেখে চট করে কিছু করে বসবেন, এমন হতেই পারে না। হাতের মোটা ওয়াকিং স্টিকটার ওপর ভর করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন, ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়!

কতদূর আর গড়াবে! একটু পরেই জোয়ান ছেলেটা রোগা ছেলেটিকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে চড়ে বসল। তারপর যখন ঘুঁষ করে আরো মারতে যাচ্ছে, তখন গড়গড়ি একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বিজয়ীকে তুলে আনলেন। বললেন, 'ব্যাস, হয়ে গেছে। এইবার শেক্ হ্যান্ড্ করো—তারপর সোজা বাড়ি চলে যাও।'

মোটা ছেলেটা তো আর ইংরেজের বাচ্চা নয় যে এ-সব কথা সে বুঝবে! সে পাল্টা চোখ পাকিয়ে বললে, 'আপনি কে মোসাই ফর-ফর করতে এসেচেন? আমি ওর বদন বিগড়ে দেব! আলুকে ও এখনো চেনে না!'

ছেলেটির মেজাজ দেখে প্রোফেসার গড়গড়ি বেশ কৌতূহল বোধ করলেন।

'ওঃ, তোমার নাম বুঝি আলু? তুমি বুঝি খুব বিখ্যাত লোক?'

আলু চোখ বাঁকা করে এমন ভাবে তাকালো—যেন সম্রাট আলেকজান্ডারকে প্রশ্নটা করা হয়েছে।

'মোসাই বুঝি অন্য পাড়ার লোক?'

'ছিলুম আগে। এখন দিন তিনেক হল তোমাদের পাড়ার বাসিন্দে হয়েছি।'

'অ।'—আলু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'তাই আমার নাম শোনেননি এখনো। শুনবেন শুনবেন, আস্তে আস্তে শুনবেন।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশি শোনবার দরকার নেই, এতেই বোধ হয় তোমাকে চিনতে পারছি। তা মারা-মারি করছিলে কেন এর সঙ্গে?'

'মারামারি! ফুঃ।' আলু যেন কথাটা ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলে: 'ওই ফড়িংটার সঙ্গে মারামারি করব? পিটছিলুম মোসায়, হাতের সুখ করে নিচ্ছিলুম। ফড়িংটার সাহস দেখুন—পাল্টা লড়ে যাচ্ছে আমার সঙ্গে! আপনি চলে যান মোসাই, আমি ওকে তুলোধোনা করে দিচ্ছি।'

গড়গড়ি চেয়ে দেখলেন রোগা ছেলেটির দিকে। ঘাসের ওপর বসে পড়ে সে হাঁপাচ্ছে। তার শার্ট ছেঁড়া, ঠোঁটের কোণে রক্ত। চোখে একটু জলও দেখা গেল যেন।

গড়গড়ি বললেন, 'তোমার নাম কি?'

রোগা ছেলেটা গোঁজ হয়ে রইল, জবাব দিলে না। আলু বললে, 'ও? ওর নাম কাবুল।'

'তাই বুঝি আলু আর কাবুলে মিলে আলু-কাবুলি তৈরি হচ্ছিল?'

'হেঃ—হেঃ—হেঃ!'—আলু হেসে উঠল: 'মোসাই তো বেশ মজা করে কথা বলতে পারেন। তা স্যারের নামটা কি?' বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো। প্রোফেসার গড়গড়ি আড় চোখে একবার চেয়ে দেখলেন কেবল।

রোগা ছেলেটি—অর্থাৎ আলু কাবলির কাবুল তখন উঠে চলে যাওয়ার উপক্রম করছিল। প্রোফেসার গড়গড়ি মোটা গলায় বললেন, 'দাঁড়াও হে ছোকরা, দরকারী কথা আছে।' তাঁর গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল যে ছেলেটা থমকে গেল, এমন কি বেপরোয়া আলুর পর্যন্ত হাতটা সিগারেট সুদ্ধু কেঁপে উঠল একবার।

আলু বললে, 'বেশ জবরদস্ত গলাটি তো মোসাইয়ের। তা নামটা বললেন না?'

'হবে এখন, নামের জন্যে ভাবনা কি!'—গড়গড়ি হাসলেন: 'আমাকেও আস্তে আস্তে চিনবে। তা ওকে তুমি মারছিলে কেন?'

'মারব না?'—আলু গড়গড়ির মুখের ওপরেই একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলে: 'ও আমাকে গেরাজ্জি করে না।'

'করে না নাকি?'

'একেবারে না। ক্লাসের ফাস্ট্ বয় কিনা, অহঙ্কারে পা পড়ে না মাটিতে, আমি ফেল করি, টুক্লিফাই করি—এ সব বলে বেড়ায়।'

'করিসই তো ফেল, টুকলিই তো করিস্'—কাবুল কাঁদো কাঁদো গলায় বললে।

আলু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার ওপর—গড়গড়ি মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হচ্ছে, হচ্ছে, ঠ্যাঙানি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। কাবুল, ডোন্ট্ ডিস্টার্ব—আলুকে বলতে দাও।'

আলু বললে, 'ও সবে আমি গ্রাহ্যি করি না মোসাই। আমার বাপের পয়সায় আমি ফেল করি, হাতের জোরে টুকলি করি, ভয় পাই নাকি? কথাটা কি জানেন, ও আমাকে একদম খাতির করে না।'

'তোমাকে খাতির করা দরকার বুঝি?'

'দরকার নয়? আমার গায়ে জোর আছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো আমার নামে কাঁপে।'

'ও কাঁপে না?'

'না। কাল সিনেমায় যাব বলে ওর কাছে একটা টাকা চেয়েছিলুম, দেয়নি। পরশু বলেছিলুম, চপ-কাটলেট খাওয়া—বলেছে গুণ্ডাকে আমি খাওয়াই না। টিংটিঙেটার আস্পর্দা দেখেছেন?'—বলেই আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল।

গড়গড়ি বললেন, 'ঠিক।'

'ঠিক না?'—আলু মুরুব্বিয়ানা চালে হাসল: 'মোসাই দেখছি বেশ সমঝদার লোক!'

গড়গড়ি এবার কটমট করে তাকালেন কাবুলের দিকে।

'দ্যাখো ছোকরা, ক্লাসের ফার্স্ট-বয় হলেই হয় না। গায়ে যদি জোর না থাকে, তা হলে জোয়ানদের কথা মানতে হবে, আর নইলে মার খেতে হবে। দুনিয়ায় এই নিয়ম।'

কাবুলের চোখ জ্বলে উঠল: 'দুনিয়া বুঝি গুন্ডাদের জন্যে?'

'না, শক্তিমানের জন্যে।'—গড়গড়ির স্বর কঠোর হল: 'মন আর শরীর দুটোই শক্ত হওয়া দরকার। শুধু ফার্স্ট বয় হলেই চলে না। মাস্‌ল্‌ও জোরালো করতে হয়। হয় গুণ্ডার কাছে হার মানো নইলে গুন্ডাকে ঠান্ডা করো—আর কোনো রাস্তা নেই। তোমাকে আলু পিটিয়েছে, বেশ করেছে। ইউ ডিজার্ভ ইট।'

কাবুল আবার বোঁ বোঁ করে চলে যাচ্ছিল, গড়গড়ি সেই ভয়ঙ্কর গলায় বললে, 'দাঁড়াও।'

কাবুল চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, এমন কি গলার আওয়াজটা আলুরও ভালো লাগল না। সিগারেটে আর একটা সুখের টান দিয়ে বললে, 'মোসায়ের গলাটি বেশ জোরালো। কিন্তু কথাটা বলেছেন বেড়ে। জোর যার মুল্লুক তার।'

গড়গড়ি বললেন, 'ঠিক।'

আলু উৎসাহ পেয়ে বললে, 'যার জোর আছে তাকে মানতে হয়। নইলে ঠ্যাঙানি খেতে হয়।'

গড়গড়ি বললেন, 'তা-ও ঠিক।'

'তা হলে মোসাই কথাটা বুঝিয়ে দিন ওদিকে। আজ আপনি এসেছেন বলে পার পেয়ে গেল, নইলে আমি ওকে—'

গড়গড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'বলতে হবে না। কিন্তু তোমাকেও যে একটা কথা বোঝাবার আছে হে আলু!'

আলু খিক খিক করে হেসে বললে, 'আমাকে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে। আমি যদি বলি, আমার গায়ে তোমার চেয়ে বেশি জোর আছে—মানবে তো আমাকে?'

'কি বললেন?'

'ঠিক বলছি, আমার গায়ে বেশি জোর আছে, সুতরাং তুমি আমাকে মেনে চলবে। কাজেই আমার মতো বয়স্ক লোকের মুখের সামনে তুমি যে অসভ্যের মতো কথা বলছ, বাঁদরের মতো সিগারেট ধরিয়েছ, তার জন্যে এক্ষুনি তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে।'

'ক্ষমা চাইব!'—আলু হা হা করে হেসে উঠল: 'হাতি ঘোড়া গেল তল, মোসা বলে কত জল! আপনার মতো কত মক্কেলকে আমি ইঁট মেরে—'

আর বলতে হল না। এইবার ন্যায়-বিচারের সময় হয়েছে।

হাতের লাঠিটা ফেলে দিয়ে গড়গড়ি বললেন, 'আমার জোর পরখ করতে চাও বুঝি? বেশ-বেশ!'

তারপর দুম্ দুম্ শব্দে দুটি কিল পড়ল আলুর পিঠে। মাত্র দুটি। আলু তাতেই আলুর দম—একেবারে চোখ উল্‌টে বসে পড়ল ঘাসের ওপর—মনে হল সে গুঁড়ো হয়ে গেছে!

গল্পটা এখানে শেষ নয়।

আলু অর্থাৎ আলোক চৌধুরী আজকাল প্রোফেসার গড়গড়ির সব চেয়ে ভক্ত

শিষ্য। পাড়ার 'গুন্ডাদমন সমিতির' সে ক্যাপ্টেন, লোকে বলে, খাসা ছেলে। এমন কি টুক্‌লি না করেই, সে ফার্স্ট ডিভিসনে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছে এবার।

আর কাবুল—মানে স্কলারশিপ পাওয়া জুয়েল ছাত্র কমল গুপ্ত, এখন তার প্রাণের বন্ধু। কমল গুপ্তের হাতের মাস্‌লও এখন দেখবার মতো—আলোক আর কমল পাঞ্জা লড়লে কে জিতবে, জোর করে বলা শক্ত।

জগন্নাথের ঠ্যাঙা

দুখীরাম গরীব ভিখিরী।

বয়েস বেশি নয়, জোয়ানই বলা চলে তাকে। কিন্তু তার মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এক কথায় বিশ্বসংসারে কেউ নেই। তাতেও দুখীরামের দুঃখ ছিল না, খেটে খুটে, পেটের ভাতের যোগাড়টা সে করতে পারত। কিন্তু একটা পা আবার তার খোঁড়া। কাজেই ভিক্ষে ছাড়া তার আর গতিই নেই।

দুপুরের চড়া রোদ্দুরে পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় দুখীরাম ভিক্ষে করে ফিরছিল। দারুণ গরম—বাতাসে যেন আগুন ছুটছে। দুখীরাম আর চলতে পারল না, পথের ধারে মস্ত একটা অশথগাছ গোল করে ঠান্ডা ছায়া ছড়িয়েছে, হাতের লাঠিটা পাশে রেখে সেখানেই শুয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল তার বিকেলে। উঠতে গিয়ে দেখল, লাঠিটা নেই। সে ঘুমুচ্ছে দেখে, কোনো দুষ্টু লোক মজা করবার জন্যে লাঠিটা নিয়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে। গরীব ভিখিরীর ভাঙা লাঠি চুরি করবে, এমন চোর অবশ্য বিশ্বসংসারে নেই।

কিন্তু লাঠি চুরিই যাক আর কেউ ফেলেই দিক, দুখীরামের অবস্থা সঙ্গীন। লাঠি ছাড়া দু' পা হাঁটাই তার পক্ষে মুশকিল। এখন সে ভিক্ষেয় বেরুবে কী করে আর কেমন করেই বা বাড়ীতে ফিরে যাবে? তার নিজের কুঁড়েঘরটাও যে এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে!

একে তো সারাটা দিন ভিক্ষে-শিক্ষে করে বিশেষ কিছুই হয় নি, পেটে খিদের আগুন জ্বলছে, তার ভেতরে এই বিপদ। দুখীরাম আর সইতে পারল না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল সে।

তখন হঠাৎ একটা শব্দ শুনল সে: ঠপাস। মনে হল, তার পেছনেই ওপর থেকে কী একটা পড়ল।

চমকে তাকিয়ে দুখীরাম দেখলে, একখানা লাঠি। যে-সব লাঠি হাতে করে

www.boiRboi.blogspot.com

বাবুরা বেড়াতে বেরোয়, ঠিক সেই রকম দেখতে, তবু একেবারে সে রকমটি নয়। কালো কুচকুচে লাঠিটার রঙ, গোটা কয়েক গাঁট আছে তাতে; হাতলের গায়ে রঙীন কাচের ছোট-ছোট দুটো চোখ বসানো—হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখ দুটো মিট-মিট করে তাকাচ্ছে।

দুখীরাম ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল।

এ কার লাঠি? কাছাকাছি লোকজন কেউই তো নেই। অশথগাছটা থেকেই ওটা পড়ল মনে হচ্ছে, কিন্তু অশথগাছে লাঠি গজায় এ-কথা কে কবে শুনেছে? কাকে অবশ্য গেরস্থ-বাড়ী থেকে মুখে করে এটা-ওটা নিয়ে আসে, কিন্তু এত বড়ো একটা লাঠি বয়ে আনতে গেলে একটা নয়, অন্ততঃ ডজন তিনেক কাক দরকার। এক হনুমান-বাঁদরের কীর্তি হতে পারে, কিন্তু এ-তল্লাটে তো ও-সব কিছুই নেই!

তবে এ লাঠি কার?

দুখীরাম কিছুক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর ভাবল, যারই হোক—আমি তো এখন কুড়িয়ে নিই। একটা লাঠি আমার নেহাৎই দরকার, নইলে এক পা-ও আমি হাঁটতে পারছি না। পরে গাঁয়ের ভেতর জিজ্ঞেস করে মালিককে ওটা ফেরত দেব। কিছু বকশিশও মিলে যাবে নিশ্চয়।

দুখীরাম লাঠিটার দিকে হাত বাড়ালো, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, সে হাত দিয়ে চেপে ধরবার আগেই লাঠিখানা তার মুঠোর মধ্যে এসে ঢুকল। যেন ওটা জীবন্ত, সে কখন ওকে ডাকবে, তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দুখীরামের সারা শরীর শিউরে উঠল। কিন্তু আদৌ তার ভয় করল না। লাঠিটাকে হাতে নেওয়া মাত্র যেন সে কেমন জোর পেলো গায়ে, পেটে খিদে তেষ্টা সত্ত্বেও ভারী স্ফূর্তি হল তার মনে। দুখীরাম লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে পড়ল, চলতে লাগল গ্রামের দিকে।

খাসা লাঠি। যেমন হাল্কা তেমনি শক্ত। দুখীরামের ওটা নিয়ে চলতে এত আরাম লাগল যে, সে যে খোঁড়া, সে কথা বেমালুম ভুলেই গেল সে।

পথের ধারে প্রাণকেষ্ট হালদারের বাড়ী। লোকটা ভারী খারাপ। একটা বিতিকিচ্ছিরি খেঁকী কুকুর সে পোষে, আর রাস্তায় গরীব-দুঃখী দেখলেই তার দিকে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা জানত বলেই, ভয়ে ভয়ে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছিল দুখীরাম। প্রাণকেষ্ট বাড়ীর সামনে একটা খাটিয়ায় বসে বিড়ি টানছিল, সে ঠিক দেখতে পেলো দুখীরামকে। শয়তানীর হাসিতে প্রাণকেষ্টর মুখ ভরে উঠল।

'খোক্কোস, লে—লে—ছো—ছো—'

খোক্কোস হল প্রাণকেষ্টর সেই বিটকেল খেঁকী কুকুরটার নাম। সে মনিবের খাটিয়ার তলায় বসে কটাং কটাং করে এঁটুলি কামড়াচ্ছিল, শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপরেই —'ঘঁু—উ—উ—খ্যা—খ্যা—খ্যা' বলে সোজা তাড়া করল দুখীরামকে।

দুখীরামের প্রাণ উড়ে গেল। খোঁড়া পা নিয়ে সে যে কোন্ দিকে পালাবে ঠিক করতে পারল না। খোক্কোস তার সামনে গিয়ে সমানে খ্যাঁক-খ্যাঁক করতে লাগল আর দুখীরামের দুর্গতি দেখে খাটিয়ার ওপর কুটপাট হতে লাগল প্রাণকেষ্ট।

কিন্তু হাসি তার বেশিক্ষণ রইল না।

হঠাৎ ঝাঁ করে দুখীরামের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লাঠিটা। তারপরেই ধপাং ধপাং! কুকুরের পিঠে সে লাঠির ঘা কতক পড়তেই 'কাঁই-কাঁই' করে খোক্কোস

www.boiRboi.blogspot.com

ল্যাজ গুটিয়ে ছুট লাগালো, বোধ হয় এক ছুটে মাইল তিনেক পেরিয়ে গেল সে।

এবার লাঠি গিয়ে নামল প্রাণকেষ্টর পিঠে। সে কি মার! 'বাপ্ রে—মা রে' করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে প্রাণকেষ্টর দাঁত-কপাটি লেগে গেল। আর সেই মুহূর্তে যেন শূন্য থেকে শোনা গেল কার গম্ভীর গলা : এ হল জগন্নাথের ঠ্যাঙা। যে সব বদমাস লোক অকারণ পরকে কষ্ট দেয়, এ হল তাদেরই দাওয়াই।

আর প্রাণকেষ্টকে শায়েস্তা করা লাঠি সুড়ুৎ করে ফিরে এল দুখীরামের হাতে।

দুখীরাম হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কী যে ঘটল, সে তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারল না। শুধু দেখতে পেলো ত্রিসীমানায় খেঁকীর কোনো চিহ্ন নেই আর প্রাণকেষ্ট তখনো 'বাপরে—মা-রে—গেলুম রে—' বলে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে।

দুখীরাম আবার এগিয়ে চলল।

এতক্ষণে বুঝতে পারল সে নিজে চলছে না, লাঠিটাই যেন তাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেদিকে সে যেতে চাইছিল, সেদিকে যেতে পারল না—তার বদলে লাঠি তাকে পাশের গ্রামের দিকে নিয়ে চলল। দুখীরাম কিছু ভাবতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্নের ঘোরে সে পথ চলছে।

চলতে চলতে বেলা গড়িয়ে এল, মাঠের ওপারে সূর্য ডুবল, অন্ধকার নামল। দুখীরাম ভাবছিল অনেক আগেই তার কুঁড়েতে ফেরা উচিত ছিল, রাত হয়ে গেলে এতটা পথ সে হাঁটবে কী করে! কিন্তু নিজের ইচ্ছায় সে কিছুই করতে পারছে না—লাঠিটাই তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাচ্ছে।

পাশের গ্রাম মদনপুর, আর গ্রামে ঢুকতেই যার মস্ত বাড়ী, তার নাম বদন মণ্ডল। বদন মস্ত মহাজন। দারুণ বড়ো লোক, তার বাড়ীতে নাকি টাকা-পয়সায় ছাতা পড়ে। কিন্তু হলে কী হয়, তার মতো নিষ্ঠুর লোভী ভূ-ভারতে নেই। কী করে দেনার দায়ে গরীবের ভিটে-মাটিটুকু পর্যন্ত কিনে নেবে, এই তার রাতদিনের চিন্তা।

আজ বদনের বাড়ীতে দারুণ ভোজের আয়োজন। কী যেন একটা মামলায় সে জিতেছে, তাই বিরাট রকম খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করছে সে। বিস্তর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন জড়ো হয়েছে, পেট্রোম্যাকস জ্বলছে, মাছ-মাংস-পোলাওয়ের গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। দুখীরামের পেটের খিদেটা সে-গন্ধে আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

ভোজের আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দুখীরাম। হাত পেতে করুণ গলায় বললে, 'বাব গরীবকে যদি দয়া করে দুটো খেতে দেন—'

চোখ পাকিয়ে বদন মণ্ডল চেঁচিয়ে উঠল : 'আঃ, এ অযাত্রাটা আবার এখন কোথা থেকে এল! এই, কে আছিস?'

'সারাদিন খেতে পাই নি বাবু—দয়া করুন বাবু—'

বদন মণ্ডল চাকরগুলোকে ধমকে বললে, 'চুপ করে দেখছিস কী সব? ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দে-না ভিখিরীটাকে। আপদগুলো হাড় জ্বালিয়ে খেলে!'

'মার-মার' করে ছুটে এল চাকরেরা। আর—

আর তক্ষুনি দুখীরামের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল লাঠিটা।

তারপরে কী যে হল কেউ জানে না! চারদিকে শুধু 'গেলুম রে' রব, দমাদম, ধপাধপ, ঝনাঝন আওয়াজ। যেন প্রলয়কাণ্ড চলতে লাগল। আলোগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো, বাসনপত্র তচনচ খাবার-দাবার ধুলো-কাদায় মাখামাখি—অতিথি, ঠাকুর,

বাড়ীর লোকজন—ঠ্যাঙানি খেয়ে কে যে কোন্ দিকে ছুটে পালালো বোঝাই গেল না।

সব চেয়ে বেশি লাঠি পড়ল বদন মণ্ডলের পিঠে—সেটা বলাই বাহুল্য। আর শূন্য থেকে মোটা গম্ভীর গলায় কে যেন বললে, 'যারা লোভী, যারা নিষ্ঠুর, গরীবকে যারা খেতে দেয় না, জগন্নাথের ঠ্যাঙা এই ভাবেই তাদের শায়েস্তা করে থাকে।'

এক বছর কেটে গেছে। দুখীরাম এখন বদন মণ্ডলের জামাই। তার হাতের ঠ্যাঙার গুণ দেখে মণ্ডল বুঝেছে, খোঁড়া আর গরীব হলে কী হয়, দুখীরাম আসলে একটি সাংঘাতিক লোক—তাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। তাই নিজের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দুখীরামকে ঘর-জামাই করে রেখে দিয়েছে।

রাজার হালে আছে দুখীরাম, মাংস-মাছ, দুধ-ঘি মিঠাই-মোণ্ডা খেয়ে হাতির মতো মোটা হচ্ছে। সে যে কোনো দিন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত, সে-কথা তার মনেও পড়ে না। তার চাল-চলনই আলাদা এখন।

সেদিন দুপুরে রুপোর থালায় ভাত খাচ্ছে দুখীরাম, পাতে তার মস্ত একটা রুইমাছের মুড়ো। শাশুড়ী পাখা হাতে তাকে বাতাস করছেন। এমন সময় কী করে অন্দরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল এক ভিখিরী-বউ, সঙ্গে তার হাড়-জিরজিরে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে।

কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে ভিখিরী-বউ বললে, 'দুটি খেতে পাই মা?'

চাকর-বাকর হৈ-চৈ করে উঠল : 'বেরো—বেরো—'

ভিখিরী-বউ কেঁদে কেঁদে বললে, 'আমি কিছু চাইনে মা—বাচ্চাগুলো খিদেয় মরে গেল, যদি—'

এবার বেজায় রেগে দুখীরাম বললে, 'কী জ্বালা, এ-সব ভিখিরীর জন্যে কি একমুঠো ভাতও শান্তিতে খাওয়া যাবে না? করছিস কি সব—মেরে তাড়িয়ে দে না—'

দরজার কোণায় দাঁড়িয়েছিল দুখীরামের লাঠিটা। হঠাৎ যেন হাওয়ায় উড়ে এল সেটা।

তারপরেই দমাদম্—ধপাধপ্—ঝনাঝন। কোথায় গেল রুপোর থালা, কোথায় গেল মাছের মুড়ো—কোথায় বা উবে গেলেন শাশুড়ী! তিন ঘা ঠ্যাঙানি খেয়েই চিৎ হয়ে পড়ল দুখীরাম।

শূন্য থেকে আবার সেই মোটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল : 'শিক্ষা পেয়েও যারা তা ভুলে যায়, জগন্নাথের ঠ্যাঙা এমনি ভাবেই তাদের তা মনে করিয়ে দেয়!'

জ্ঞান হয়ে দুখীরাম দেখলে, সে সেই অশথতলায় পড়ে আছে, গায়ে তার ভিখিরীর সেই ছেঁড়া পোশাক, পাশে তার সেই পুরোনো অষ্টাবক্র লাঠিটা।

www.boiRboi.blogspot.com

একাদশীর রাঁচী যাত্রা

টেনিদা বললে, আমার একাদশী পিসেমশাই—

আমি বললুম, একাদশী পিসে! সে আবার কি রকম?

—কি রকম আর? হাড় কঞ্জুস। খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে লোকে নাম করে না—একাদশী বলে। কালকে সন্ধ্যেবেলায় তিনি রাঁচী গেলেন।

বললুম, ভালোই করলেন। রাঁচী বেশ জায়গা। হুড্রু আছে, জোনা ফল্স আছে। আমরা একবার ওখান থেকে নেতার হাট—

বাধা দিয়ে টেনিদা বললে, তুই থাম না—কুরুবক কোথাকার। একটা কথা বলতে গেলেই বকবকানি শুরু করে দিবি। একাদশী পিসে ও-সব হুড্রু-জোনা-নেতার হাট কিছু দেখতে যান নি। তিনি গেছেন কাঁকেতে।

—কাঁকে?—আমি চমকে বললুম, সেখানে তো—

আমার পিঠে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা বললে, ইয়াহ্—এতক্ষণে বুঝেছিস। সেখানে পাগলা-গারদ। তোর নিজের জায়গা কিনা, তাই কাঁকে বলবার সঙ্গে সঙ্গেই খুশি হয়ে উঠলি!

আমি ব্যাজার মুখে বললুম, মোটেই না, কাঁকে কক্ষনো আমার নিজের জায়গা নয়। বরং বল্টুদা বলছিল, তুমি নাকি চিড়িয়াখানার গাব্বে হাউসে দিন কয়েক থাকার কথা ভাবছ।

—গাব্বে হাউস?—খাঁড়ার মতো নাকটাকে আকাশে তুলে টেনিদা বললে, কে বলেছে? বল্টু? ওই নাট-বল্টুটা?

—হুঁ। সে কাল আমায় আরো জিজ্ঞেস করছিল, কি রে প্যালা তোদের টেনিদার ল্যাজটা ক' ইঞ্চি গজালো?

টেনিদা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বললে, অলরাইট। ফুটবলের মাঠে একবার বল্টেকে পেলে আমি দেখিয়ে দেব।

আমি ভালোমানুষের মতো বললুম, সে তোমাদের ব্যাপার—তোমরা বুঝবে। কিন্তু একাদশী পিসের কথা কী বলছিলে?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, থাম—ফাঁচ ফাঁচ করিস নি। দিলে মেজাজ চটিয়ে—এখন বলছে একাদশী পিসের কথা বলো। বলব না—ভাগ!

কিন্তু টেনিদার মেজাজ কী করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে তো জানি। তক্ষুনি মোড় থেকে এক ঠোঙা তেলে-ভেজা কিনে আনলুম। আর গরম গরম আলুর চপে কামড় দিয়েই টেনিদা একেবারে জল হয়ে গেল।

—প্যালা, ইউ আর এ গুড্ বয়।

আমি বললুম, হুঁ।

—এই জন্যেই আমি তোকে এত ভালবাসি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—হাবুল সেন আর ক্যাবলাটার কিচ্ছু হবে না।

আমি বললুম, হবেই না তো। এই গরমের ছুটিতে—আমাদের ফেলে—একটা

গেল মামাবাড়ীতে আম খেতে, আর একটা মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেল শিলঙে। বিশ্বাসঘাতক!

টেনিদা বেগুনী চিবুতে চিবুতে বললে, বল—ট্রেটর। ওতে জোর বেশি হয়।

বললুম, মরুক গে, ওদের কথা ছাড়ো। কিন্তু তোমার সেই একাদশী পিসে—

—ইয়েস—একাদশী পিসে। টেনিদা বললে, তাঁর কথাই বলতে যাচ্ছিলুম তোকে। আমার ঠিক রিয়েল পিসে নন—মা-র যেন কী রকম খুড়তুতো দাদামশাইয়ের মাসতুতো ভাইয়ের মামাতো শ্বশুরের—

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, থাক, এতেই হবে। মানে তিনি তোমার পিসে-মশাই—এই তো?

—হাঁ, পিসেমশাই। বাঁকুড়ায় উকিল। খুব পশার—বুঝলি? বাড়ী—গাড়ী, বিস্তর টাকা। এক ছেলে পাঞ্জাবে ইঞ্জিনিয়ার, আর এক ছেলে যেন কোথায় প্রফেসারী করে। মানে এত পয়সা-কড়ি যে এখন পিসে ইচ্ছা করলে সব ছেড়ে বসে বসে গড়গড়া টানতে পারেন। কিন্তু ওসবে একাদশী পিসের সুখ নেই। খালি টাকা টাকা—টাকা। কিন্তু তার একটা পয়সা খরচ করতে হলে তাঁর পাঁজরা ভেঙে যায়।

—কী করেন তা হলে টাকা দিয়ে?

—কেন, ব্যাঙ্কে জমান। একটা কানা কড়িও তোলেন না তা থেকে। বলেন—গুরুর আদেশ। গুরু নাকি বলে দিয়েছেন ব্যাঙ্কের জমানো টাকা কখনো তুলতে নেই, তাতে পাপ হয়।

—সত্যিই ওঁর গুরু আছে নাকি?

—ঘোড়ার ডিম, সব বানানো। ওঁদের কে এক কুলগুরু নাকি একবার কিছু প্রণামীর আশায় ওঁর বাড়ীতে এসেছিলেন—একাদশী পিসে মোটা একখানা আইনের বই নিয়ে তাঁকে এমন তাড়া লাগালেন যে গুরুদেব এক ছুটে বাঁকুড়ার বর্ডার পেরিয়ে একেবারে মানভূম—মানে পুরুলিয়া ডিসট্রিক্টে চলে গেলেন।

—ডেন্‌জারাস!

—ডেনজারাস বলে ডেনজারাস! বাড়ীতে লোকজন টেঁকে না—ঝি-চাকর আসে, কিন্তু মোটা মোটা চালের আধপেটা ভাত, আধপোড়া দু-একখানা রুটি, খোসাসুদ্ধ কড়াইয়ের দ.ল আর ডাঁটার চচ্চড়ি দিন তিনেক খেয়েই তারা বাপরে—মা-রে বলে ছুটে পালায়। যাওয়ার আগে যদি মাইনে চায়, একাদশী পিসে বলেন, 'মাইনে! চুক্তি ভঙ্গের দায়ে এক্ষুনি তোদের নামে এক নম্বর ঠুকে দেব।'

পিসেমশাইয়ের বাড়ীতে গরু আছে, দুধও হয়—কিন্তু দুধ পিসেমশাই কাউকে খেতে দেন না—বলেন, 'ও তো শিশুর খাদ্য।' দুধ তিনি বিক্রী করেন। ঘি? আরে রাখো—কোন ভদ্রলোকে ঘি খায়? এক সের তেলে তাঁর বাড়ীতে ছ' মাস রান্না হয়। মাংস?

পিসে বলেন, 'ছিঃ জীবহিংসা করতে নেই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, পরের বাড়ীতে গিয়ে তিনি মাংস খান না?

—খাবেন না কেন? পেলেই খান। কিন্তু জীব-হিংসের পাপ তো অন্যের। পিসের কী দোষ?

—আর মাছ?

—হুঁ, মাছ একটু অবিশ্যি না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। দুটো ছোট ছোট সিঙ্গি মাছ আনলে তাঁর মাসখানেক চলে যায়।

—সে কি!

টেনিদা মিট মিট করে হাসল: বুঝতে পারছিস না? মাছ দুটোকে হাঁড়িতে জীইয়ে রাখা হয়। আর রোজ সকালে পিসেমশাই একখানা দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে সেই মাছদের ল্যাজ থেকে—এই মনে কর—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের একভাগ কেটে নেন।

আমি একটা বিষম খেলুম: কত বললে?

—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

—কাটতে পারে কেউ? ইম্‌পসিবল!

—তুই ইম্‌পসিবল বললেই হবে? যে লোক ও-ভাবে পয়সা জমাতে পারে সে সব পারে। এমন ভাবে কাটেন যে মাছ দুটো টেরও পায় না—পরদিন সে ল্যাজ আবার গজিয়ে যায়। আর সেই ল্যাজের কাটা টুকরোটা দিয়ে এক বাটি ঝোল রান্না করে খান একাদশী পিসে—বলেন, 'সিঙ্গি মাছের ঝোল খুব বলকারক!'

আমি বললুম, তাতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু মাছ দুটো মরে গেলে?

—বাড়ীতে বিরাট ভোজ। সবাই সেদিন ঝোলে আঁশটে গন্ধ পায়। তারপর সাতদিন আর মাছ আসে না। পিসে বলেন—এত মাছ খাওয়া হয়েছে; এগুলো আগে হজম হোক!

—তা এখন পিসে হঠাৎ কাকে গেলেন কেন?

—আরে যেতে কি আর চেয়েছিলেন? তাঁকে যেতে হল। সেই কথাই বলি। এখন হয়েছে কী জানিস? সারা জীবন ওই কড়াইয়ের দাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে খেতে শেষকালে পিসিমা গেলেন দারুণ চটে।—ওদিকে টাকায় শ্যাওলা জমে গেল, এদিকে আমরা না খেয়ে মরি! বিদ্রোহ করলেন পিসিমা।

—বিদ্রোহ!

—তা ছাড়া আর কি! সামনা-সামনি কিছু বললেন না, কিন্তু চমৎকার প্ল্যান আঁটলেন একটা। পিসে তো কড়াইয়ের দাল, চচ্চড়ি আর তাঁর সেই খেয়ে নিয়মিত কোর্টে চলে যান। আর পিসিমা কী করেন? তক্ষুনি চাকরকে বাজারে পাঠান—গলদা চিংড়ি, ইলিস মাছ, পাকা পোনা, ভাল মাংস, ডিম এইসব আনান। সেগুলো তখন রান্না হয়, পিসিমা খান, ঝি চাকর খায়—বাড়ীতে যে দুটো মড়াখেকো বেড়াল ছিল তারা দেখতে দেখতে তেল-তাগড়া হয়ে যায়।

আমি বললুম, এ কিন্তু পিসিমার অন্যায়! পিসেকে ফাঁকি দিয়ে—

টেনিদা রেগে বললে, কিসের অন্যায়? পিসে যদি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করেও না খেয়ে শিঁটকে হয়ে থাকেন—সে তাঁর খুশি। তাই বলে পিসিমা কষ্ট পেতে যাবেন কেন? আর অনেক দিনই ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবিয়েছেন, চিবুতে চিবুতে দাঁতই পড়ে গেছে গে টাকয়েক, শেষ বয়সে ইচ্ছে হবে না একটু ভালমন্দ খাবার?

—তা বটে।

—এই ভাবেই বেশ চলে যাচ্ছিল। পিসেমশাই কিছুই টের পেতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে বেড়াল দুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিত। পিসিমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'বেড়াল দুটো কী খাচ্ছে-টাচ্ছে বলো তো? এত মোটা হচ্ছে কেন?' পিসিমা ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলতেন, 'ওরা আজকাল খুব ইঁদুর মারছে—তাই।' 'ওঃ—ইঁদুর মারছে!' শুনে পিসেমশাই খুব খুশি হতেন, বলতেন, 'ইঁদুর মারা খুব ভালো, ও ব্যাটারা ধান-চাল, কলাই-টলাই খেয়ে ভারী লোকসান করে।'

সবই তো ভালো চলছিল, কিন্তু সেদিন হঠাৎ—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ?

—পিসেমশাই কোর্টে গিয়ে দেখলেন—কে মারা গেছেন, কোর্ট বন্ধ। একটু গল্প-গুজব করে, পরের পয়সায় দু-একটা পান-টান খেয়ে বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ বাড়ী ফিরলেন তিনি। ফিরেই তিনি স্তম্ভিত! এ কী! সারা বাড়ী যে মাছের কালিয়ার গন্ধে ম-ম করছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের দালের সুবাসে বাতাস ভরে গেছে যে! এ তিনি কোথায় এলেন—কার বাড়ীতে এলেন! জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন!

দরজায় গাড়ী থামার শব্দে ওদিকে তো পিসিমার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু পিসিমা দারুণ চালাক আর মাথাও খুব ঠান্ডা। তিনি এক গাল হেসে বললেন, 'এসো। এসো। তুমি যাওয়ার পরেই তোমার এক মক্কেল—কী নাম ভুলে গেছি—প্রকান্ড একটা রুই মাছ ভালো সোনামুগের দাল আর ফুলকপি পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই রান্না করছিলুম।'

'অ—মক্কেল।'—পিসেমশাই একটু আশ্বস্ত হলেন কিন্তু তারপরেই আঁতকে উঠে বললেন, 'কিন্তু তেল, ঘি? মশলা-পাতি?'

'সব সে পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে খুব ভাল'—পিসেমশাইয়ের বোঁচা গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল: 'আমি ভাবতুম, মক্কেলগুলো সব বে-আক্কেলে—এর দেখছি একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তা কোথাকার মক্কেল বললে? কী নাম?'

'নাম তো ভুলে গেছি।'—পিসিমা বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, 'বোধহয় সোনামুখীর কোন লোক।' তিনি জানতেন সোনামুখীতে পিসের কিছু মক্কেল আছে।

'সোনামুখী?'—ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন পিসে।

পিসি বললেন, 'হয়েছে—হয়েছে, এখন তোমায় আর অত আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। কত লোকের মামলা জিতিয়ে দিয়েছ, কে খুশি হয়ে দিয়ে গেছে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? এখন এসো—মুড়িঘন্টের দাল আর মাছের কালিয়া দিয়ে দুটো ভাত খাও।'

বাড়ী গন্ধে ভরাট—তাতে মাথা খারাপ হয়ে যায়—পিসেমশাইয়ের পেটও চুঁই চুঁই করছিল। তবু একটু মাথাটা চুলকে বললেন, 'বামুনের ছেলে, এক সূর্যিতে দু'বার ভাত খাবো?'

'ভাত না খেলে। মাছই খাও একটু।'

'তা হলে ভাতও দাও দুটো। শুধু মাছে কি আর—' পিসে ভেবে-চেবে বললেন, 'আর মক্কেলই তো খাওয়াচ্ছে—ওতে দোষ হবে না বোধ হয়।'

পিসিমা বললেন, 'না—কোন দোষ হবে না।'

অগত্যা পিসে বসে গেলেন। কিন্তু ডাল থেকে মুড়ো তুলে মুখে দিয়েই—হঠাৎ একটা আর্তনাদ করলেন তিনি।

'এ যে যজ্ঞির রান্না!'

পিসিমা বললেন, 'পরের পয়সায় তো!'

'কিন্তু কয়লা পুড়ল যে!'

পিসিমা বললেন, 'কয়লা তো পোড়াইনি। চাকর দিয়ে শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে আনিয়েছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—হাঁড়ি-ডেকচিগুলো?'—বুকফাটা চিৎকার করলেন পিসেমশাই।

www.boiRboi.blogspot.com

'সেগুলো আগুনে পুড়ল না এতক্ষণ? ক্ষতি হল না তাতে? তারপর মাজতে হবে না? আরো ক্ষয়ে যাবে না সে জন্যে?'—বলতে বলতে পিসেমশাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন: 'গেল—আমার এত টাকার হাঁড়ি-ডেকচি ক্ষয়ে গেল—' আর কাঁদতে কাঁদতে ঠাস করে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান হলো বারো ঘন্টা পরে। চোখ লাল—খালি ভুল বকছেন। থেকে থেকে ক'কিয়ে কেঁদে উঠছেন: 'গেল—গেল—আমার হাঁড়ি-ডেকচি গেল!'

ডাক্তার এসে বললেন, 'দারুণ শক পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। রাঁচী পাঠিয়ে দেখুন—ওরা যদি কিছু করতে পারে।

তাই একাদশী পিসে কাঁকে চলে গেলেন। হয়তো ছ' মাস পরে ফিরবেন। এক বছর পরেও ফিরতে পারেন। আর নইলে পাকাপাকি ভাবে থেকেও যেতে পারেন ওখানে। রাঁচীর জল হাওয়ায় ভালোই থাকবেন আর মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি-ডেকচির জন্যে কান্নাকাটি করবেন।

আমি বললুম, আচ্ছা টেনিদা, এখন একাদশী পিসি কী করবেন? বেশ নিশ্চিন্তে রোজ রোজ মাছ-মাংস-পোলাও-পায়েস খাবেন তো?

টেনিদা বললে, ছি প্যালা—তুই ভীষণ হার্টলেস!

আমি চুপ করে রইলুম। তেলে-ভাজার ঠোঙা শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটা ল্যাজ-ন্যাড়া নেড়ী কুত্তার গায়ে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে টেনিদা আমার কানে কানে বললে, এখন মানে যদ্দিন পিসে কাঁকেতে থাকে—এই সময় বাঁকুড়ায় বেড়াতে যাওয়া যায়, না রে? যাবি তুই আমার সঙ্গে?

পরমানন্দে মাথা নেড়ে আমি বললুম, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

দুর্যোধনের প্রতিহিংসা

দুর্যোধন মন্ডল খালিশপুরের হাটে গরু বিক্রী করতে যাচ্ছিলো।

যাচ্ছিলো ভালোই—বেশ খুশিমনে। গরুটা দুবেলায় তিন সের দুধ দেয়—বিক্রী করে মোটা টাকা আসবে। সেই টাকা দিয়ে চাষের কাজের জন্যে একটা দামড়া বাছুর কিনবে, কিছু বাড়তি পয়সাও হাতে থাকবে তার। হাট ভালোই হবে, একটা পাঁটাও কেনা যেতে পারে। বহুদিন আশ মিটিয়ে মাংস খাওয়া হয়নি।

গ্রাম থেকে মাইল চারেক হেঁটে শিলাই নদী। এখন শুকনার সময়—নদীতে বুক পর্যন্ত ডোবে। দুর্যোধন গরুর পিঠে চেপেই নদী পার হয়ে গেল। খালিশপুরের

হাট আর ক্রোশখানেক মাত্র।

কিন্তু নদী পার হয়েই বাধলো গণ্ডগোল। শিলাইয়ের খেয়াঘাটের মাঝি গোবরা এসে খপ্ করে কাঁধটা চেপে ধরলো তার।

—বলি, ও মোড়লের পো, গুটি-গুটি পায়ে পালাচ্ছো যে বড়ো?

দুর্যোধন চটে গিয়ে বললে, পালাবো ক্যানে—অ্যাঁ? কার চুরি করিছি যে পালাবো?

গোবরা একটা টকটকে লাল শালুর ফালি যোগাড় করে তাই দিয়ে পেল্লায় পাগড়ী বেঁধেছে মাথায়। আর সেই পাগড়ী বেঁধেই তার মেজাজ একেবারে আদালতের পেয়াদার মতো সপ্তমে চড়ে উঠেছে।

—চুরি করোনি তো কী?—গোবরা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে, খেয়ার পয়সা না দিয়েই সটকাচ্ছ?

—খেয়ার পয়সা!—দুর্যোধন আকাশ থেকে পড়লো: গরুর পিঠে চড়ে পার হইচি, তোমার নায়ে পা-ও তো ঠেকাইনি। পয়সা দেবো ক্যানে?

—নদী পেরুলেই পয়সা দিতে হবে—তা তুমি গরুতে চেপেই যাও, কি ডানা মেলে উড়েই যাও। নইলে গরু আটকে রাখবো—এই সাফ কথা বলে দেলাম।

গোবরা ষণ্ডা লোক, দুর্যোধন প্যাঁকাটির মতো রোগা। কাজেই পয়সা না দিয়ে পার পাওয়া গেল না। গুণে-গুণে চারটে পয়সা নিয়ে, সেগুলোকে ভালো করে দেখে গোবরা দুর্যোধনকে ছেড়ে দিলে। আর ঠাট্টা করে বললে, ভেবেছিলে চালাকি করে পেলিয়ে যাবে—হুঁ হুঁ! তুমি তো তুমি—ঘাটের পয়সা না দিয়ে একটা মাছি পর্যন্ত পেরুতে পারবেক নি, এইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছি!

চারটে পয়সা গেল, সেটা বড়ো কথা নয়—অপমানটা বিঁধলো তার চাইতেও বেশি। রাগে দুর্যোধনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলতে লাগলো। এমন কি মাথাটা চিড়বিড়ও করতে লাগলো, মনে হলো কেউ সেখানে লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে। বড্ড বাড় বেড়েছে গোবরাটা। মানুষকে আর সে গণ্যিই করে না! কিন্তু লোকটাকে কিছু বলবারও জো নেই। ইয়া তাগড়াই জোয়ান—বেশি চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে গেলে এক চড়ে দাঁত-কপাটি লাগিয়ে দেবে!

হুঁকোর মতো মুখ করে দুর্যোধন খালিশপুরের হাটে গেল।

প্রথমেই এক ঠোঙা গরম গরম জিলিপি কিনে খেলে, কিন্তু রাগের চোটে জিলিপি-গুলো চিরতার মতো তেতো লাগলো। কচুরি খেতে গিয়ে মনে হলো কচুপোড়া খাচ্ছে—তাও বুনো কচু—গলার ভেতরে কুটুর কাটুর করে কামড়াচ্ছে।

ময়রাকে বললে, এসব কি খাবার করেছো হে? মুখে দেওয়া যায় না যে একটুও?

ময়রা রেগে বললে, হাটসুদ্ধ খেয়ে 'সাবাস সাবাস' বলছে, আর তোমারই পছন্দ হলোনি? বলি, মুখখানা কি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে এয়োচো? দোকানে বসে মিছে বদনাম কোরোনি।

গরুটা তখন চোখ বুজে শালপাতার ঠোঙা চিবুচ্ছিলো—তার নড়বার ইচ্ছে ছিলো না। মেঠাইগুলো দুর্যোধনের যেমনই লাগুক, গরুটার কিন্তু অমৃত মনে হচ্ছিলো।—আর খেতে হবেনি এই ছোটলোকটার ঠোঙা। বলে গরুটাকে এক চড় লাগিয়ে দুর্যোধন সেটাকে টানতে টানতে গো-হাটায় নিয়ে গেল।

মেজাজ চড়েই ছিলো, দু'চারজন খদ্দেরের সঙ্গে গোড়ার দিকে খিটিমিটিই হয়ে গেল খানিকটা। শেষে একজন যখন নগদ পঞ্চাশ টাকায় গরুটা কিনে নিলে, তখন দুর্যোধন একটু শান্ত হলো। হাট করলো, মস্ত একটা বোয়াল মাছ কিনলো। পাঁটাও

www.boiRboi.blogspot.com

কিনবার ইচ্ছে ছিলো, তারপরেই মনে হলো, গোবরা হয়তো পাঁটার পারানি বাবদ দু'আনা পয়সাই আদায় করে নেবে। বিশ্বাস নেই ওকে।

একটা বটগাছতলায় বসে গায়ের গামছাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলো দুর্যোধন। বেলাবেলিই হাট হয়ে গেছে, এখনো চড়া রোদ্দুর চারদিকে। রোদটা একটু পড়লেই সে রওনা হবে।

এমন সময় গো-হাটার দিকে তার নজর পড়লো। এক জায়গায় বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে, খুব হৈ-চৈ হচ্ছে সেখানে। একটা ঝোল্লা গোঁফওলা লোক হাত-পা নেড়ে কি সব যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে। দুটো দুষ্টু ছেলে পেছন থেকে তাকে বক দেখাচ্ছিলো—লোকটা কষে একটা তাড়া দিতেই তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মনে হলো, ব্যাপারটা জানা দরকার। বোয়াল মাছ আর হাটের বোঁচকা চেনা আলুওলার দোকানে জিম্মা করে দিয়ে সে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে

ব্যাপার আর কিছু নয়—ভিড়ের মাঝখানে সাদায়-কালোয় মেশানো এক পেল্লায় ষাঁড় দাঁড়িয়ে। মস্ত কুঁজ, মস্ত মস্ত শিং, গলার চামড়া ঝালরের মতো ঝুলে পড়েছে। তার চেহারা দেখেই আত্মারাম চমকে ওঠে। গলায় দড়ি বাঁধা, ঝোল্লা গোঁফওলা লোকটা ধরে রয়েছে সেটা। আর ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে ষাঁড়টা একটা বিরাট পচা বাঁধাকপি খেয়ে চলেছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার ষাঁড়টা নয়। সেই গুঁফো লোকটাই রেলগাড়ীর ক্যানভাসারের মতো সমানে একটানা গলায় বলে যাচ্ছিলো, চারদিকের মানুষগুলো তা-ই শুনছিলো কান পেতে।

—হাসি-মস্করার কথা নয় মশাই—এটি সোজা ষাঁড় নন। এনার আস্তানা ছেলো কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে। ইনি হলেন সাক্ষাৎ মহাদেবের ষাঁড়ের বংশধর। শিং দুখানার চেহারা একবার দ্যাখেন?

তা বিশ্বনাথের গলি ছেড়ে খালিশপুরের হাটে পচা কপি চিবুতে এলেন ক্যানে?—ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জানতে চাইলো।

—লীলে—দেবতার লীলে!—গুঁফো লোকটা একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো, ষাঁড়কে না বিশ্বনাথকে—কে জানে! তারপর আবার শুরু হলো বক্তৃতা: সে হলো গে অনেক কালের কথা। তখন যুদ্ধু চলছে। তখন ইনি ছেলেন নেহাৎ নাবালক—বিশ্বনাথের গলিতে ঘুরতেন। এর-তার দোকানে মুখ দিয়ে কারুর গজা, কারুর চমচম লোপাট করতেন। তা মিঠাই খেতি খেতি অরুচি ধরে গিয়েছেলো বলে একদিন এক বেনারসী শাড়ীর দোকানে মুখ বাড়িয়ে দু'খানা শাড়ী খেয়ে ফেলে-ছিলেন।

—দু'খানা বেনারসী শাড়ী খেলেন ইনি? সেই কচি বয়েসে?—একজন প্রায় খাবি খেলো: তা হলে এখন তো এক ডজন সতরঞ্চি খেয়ে ফেলতি পারেন!

—পারেন বই কি!—ঝোল্লাগুঁফো লোকটা মিটির-মিটির হেসে বললে, ইনি শিবের ষাঁড়ের বংশধর—এনার অসাধ্যি কি আছে! নিয়ে এসো না সতরঞ্চি, হাতে হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি!

—বয়ে গেছে আমার! এখন আমি ষাঁড়ের জন্যি সতরঞ্চি কিনতি যাই আর কি!

পেছন থেকে সেই দুষ্টু ছেলেদুটো আবার বক দেখাচ্ছিলো। লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, অ্যাও! ত্যাখোন থেকে যে আমায় বক দেখাচ্ছিস, ভেবেছিস কী! এক্ষুনি ষাঁড়ের মুখে ধরে দেবো, আধখানা চিবিয়ে দেবে—বুঝবি মজাটা।—বলেই

সে ওদের ধরবার জন্যে হাত বাড়ালো।

—বাবা গো, গিছি—গিছি—বলে ছেলে দুটো পাই-পাই করে ছুটে পালালো।

ভিড়ের মানুগুলো অধৈর্য হয়ে উঠলো : কই, কাশী থেকে ইনি ক্যামন করে এলেন, তা তো বললে না।

—আহা, তাই তো বলছিনু—লোকটা একবার গোঁফে তা দিয়ে নিলে : তা তোমরা বলতি দিচ্ছো কই? সেই যে বেনারসীওলা—সে ছেলো মহাফিচেল আর বেজায় ঘুঘু। রাতের বেলা ইনি এক মুদির দোকানের নীচে শুয়ে জাবর কাটছেন, কোত্থাও জন-মনিষ্যি নেই—ত্যাখোন বেনারসীওলা আর তার তিনটে ষণ্ডা ছেলে এসে এনাকে পিটতে পিটতে বড়ো রাস্তায় নিয়ে এলো। সেখানে গোরা মিলিটারীরা গাড়ী নিয়ে খাপ পেতে বসেছেলো—তারা তক্ষুনি এনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে ফেললে। ওদের মতলব, এনাকে দিয়ে কালিয়া বানিয়ে খাবে!

—রাম-রাম—থু-থু—সবাই কানে আঙুল দিলে।

ষাঁড়টা পচা বাঁধাকপিটা শেষ করে এবার গলা খুলে আওয়াজ ছাড়লো : গুরুর্ ঝাঁই—গুরুর্ ঝাঁই—

—এই দ্যাখো—গঁুফো লোকটা মাথা নেড়ে বললে, সেই কথা শুনে ইনি এখনো কত কষ্ট পাচ্ছেন—তাই জানিয়ে দেলেন।

একজন বললে, বাপরে কী গলাখান! যেন মেঘ ডাকছে!

—তা, ইনি কালিয়া হতে গিয়ে বেঁচে এলেন কেমন করে?—রোকাসোকা চেহারার একটি রোগা লোক জানতে চাইলো।

—এনাকে রান্না করে খাবে এমন কেউ আছে নাকি দুনিয়ায়? তা সে গোরা মিলিটারীই হোক আর যা-ই হোক। রেলগাড়ীতে চাপিয়ে এনাকে তো আসাম না কোথায় পাচার করছিলো। কী একটা ইস্‌টিশানে গাড়ী থেমেছে আর ইনি দড়ি ছিঁড়ে এক লাফে নেমে পড়েছেন। একজন মিলিটারী 'এ গরু ভাগো মৎ' বলে ধরতে এয়েছেলো, তাকে ঢুঁসিয়ে চিৎ করে ফেললেন। তারপর এক ছুটে মাঠের মধ্যি হাওয়া হয়ে গেলেন!

—তারপর?

—তারপর আর কী? ছিষ্টি চষে বেড়াতে লাগলেন। আজ এর খাত সাবড়ে দ্যান, কাল ওর খামার আধাসাট করেন, পরশু হয়তো ধোপারা কোথাও কাপড় কাচতে দিয়েছে—ইনি এসে হাজির হলেন—'খেলে খেলে' বলতি না বলতি ডজনখানিক শাড়ী-জামা এনার পেটের গভ্ভরে চালান হয়ে গেল।

—তার চাইতে ইনি মিলিটারীর পেটের গভ্ভরে গেলিই তো ভালো হতো—একটা মন্তব্য ভেসে এলো।

—কে বললে, কে বললে একথা?—গঁুফো লোকটা চটে উঠলো : মহাপাপী তো! মরে নরকে যাবে—তারপর গো-ভূতেরা এসে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তোমার ভুঁড়ি বের করে দেবে, দেখে নিয়ো।

কথাটা যে বলেছিলো, তার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

—তা, তুমি এনাকে পেলে কী করে?—আর একজনের জিজ্ঞাসা।

লোকটা আবার হাত তুলে মাথায় ঠেকালে : গুরুর দয়া।

—গরুর দয়া?

—ধুত্তোর! গঁুফো লোকটা আবার চটে গেল : গুরু আর গরুর তফাৎ বোঝো না—কোথাকার বুদ্ধু হে?

www.boiRboi.blogspot.com

—যেতি দাও, যেতি দাও—সেই রোকাসোকা মানুষটা আবার বললে, তুমি কী করে এনাকে পেলে, তাই বলো।

—তাই তো বলছি। একদিন রাত্তিরে স্বপন দ্যাখলাম, তোর দোরগড়ায় শিবের ষাঁড়ের বংশধর রয়েছেন—বরণ করে নে—একজন সাধু যেন আমায় বলচেন। আমি বললাম, বাবা, তিনি আমার দোরে এলেন কী করে? ত্যাখন সাধু আমায় সব কথা খুলে বললেন। আমি বললুম, বাবা, এনাকে খাওয়াবো কী? সাধু বললেন, যা দিবি, তাই খাবেন—তারপর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবেন। তুই শুধু এনাকে গোয়ালে থাকতে দিস। দেখিস, তোর ভালো হবে। ঘুম ভেঙে দেখি, ইনি দোর জুড়ে শুয়ে রয়েচেন—যানো গন্ধমাদন! বললুম, বাবা—দরজা ছেড়ে দ্যাও—নইলে তো বেরুতি পারবো না। তার চে' গোয়ালে চলে এসো। তক্ষুনি ঝাঁ-গুরুর্-গুরুর্ বলে জয়ঢাকের মতো আওয়াজ ছেড়ে দাঁড়ালেন, আর সুড়সুড়িয়ে গোয়ালে এলেন।

—তারপর?

—তারপর যা হলো, কী বলবো! একটা হাঁস দু বচ্ছর ডিম দিচ্ছিলো না, এক-রাতে সেটা ছ'টা ডিম পেড়ে ফেললে—

—দুর!—একজন প্রতিবাদ করলো : বাজে কথা বলিলেই শুনবো? একরাত্রে হাঁসে ছ'টা ডিম পাড়তি পারে কখনো?

—পারে। গুরুর দয়া হলিই—

—গুরুর দয়া নয়, গরুর দয়া বলো মোড়ল।

—আচ্ছা আচ্ছা গরুর দয়া না হয় হলো। কিন্তু হাঁসে ছ'টা ডিম পাড়লো, একটা মরা আমগাছ ভরে বউল এলো, আমার খুড়ো কোমরের বাতে এক বচ্ছর বিছ্‌নায় পড়েছেলো—তিনি তিড়িং করে উঠে মাঠে দৌড়ে গেল যে! বললে পেত্যয় যাবে না—তক্ষুণি জমিতে চাষ দিয়ে এলো! একটা ভোঁদড় রোজ পুকুরের মাছ খেয়ে যাচ্ছিলো, একদিন একটা চেতল মাছ তার ঠ্যাঙে অ্যায়সা কামড়ে দিলে যে সেটা খোঁড়া হয়ে চিল্লোতে চিল্লোতে দেশ ছেড়ে পালালো!

—একেই বলে গরুর দয়া!—এতক্ষণে কথা বললে দুর্যোধন।

—তবেই বুঝে ন্যাও। এ ষাঁড় যার ঘরে যাবে—তার লক্ষ্মী একেবারে বাঁধা। কিনে ফেলো—কিনে ফেলো।—গঁুফো লোকটা বেশ জোরে জোরে হাঁক ছাড়লো।

—বিলিয়ে দ্যাও না ক্যানে? পড়ে-পাওয়া ষাঁড় বেচতে এয়েচো? ঘরের লক্ষ্মীই বা বিদেয় করছো কেনে?—দুর্যোধন জানতে চাইলো।

—স্বপ্নাদেশ পেলাম যে! একদিন আবার সেই সাধু এসে বললেন, রাখোহরি হাজরা—কাজটা তো ভালো হচ্চোনি, বাছা! ইনি এয়েছেন সক্কলের ভালো করবার জন্যি—তুই একাই এনাকে দখল করে রাখবি? এবার ছেড়ে দে। তাই হাটে বেচতে এনু।

—বেচবে ক্যানে? এমনিই দিয়ে দ্যাও—দুর্যোধন বললে।

—বাঃ, শিবপুজো দিতে হবে না? পঞ্চাশ টাকা খরচ করতি হবে—সাধু বলে দিয়েচেন।

—পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ষাঁড়! বলি পাগল না পেট-খারাপ?

—একটু লোক্‌সান করেও দিতি পারি—দেবতার জিনিস। চল্লিশ টাকা হলিও নিতি পারো!

—বোকা ভুলোবার জায়গা পাওনি আর?—এইবারে একজনের প্রতিবাদ শোনা গেল : গাঁজাখুরী গপ্পো শুনিয়ে টাকা নেবে? পয়সা দিয়ে কেউ ষাঁড় কেনে?

রাখোহরি হাজরা চটে গেল : তুমি তো ভারী পাপী লোক হে। মরে নরকে যাবে আর গো-ভূতে—

—ধ্যাত্তোর গো-ভূত।—সে লোকটা সবাইকে ডেকে বললে, চলো হে চলো। ওসব বিশ্বাস করতি নেই।

রাখোহরি দাঁত খিঁচিয়ে বললে, এতক্ষণ দিব্যি কানখাড়া করে শুনছিলে; আর পয়সার বেলাতেই অম্‌নি বিশ্বাস করতি নেই! যাও—যাও! অনেক পুণ্যি থাকলে শিবের ষাঁড় কিন্‌তি পায়—তোমার বরাতে থাকলি তো!

দলবল নিয়ে অবিশ্বাসীটা চলে গেল, কিছু লোক দাঁড়িয়ে রইলো তখনো। আর রাখোহরি সমানে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো : নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—শিবের ষাঁড়। ঘরে থাকলিই লক্ষ্মী ঠাকরুণ বাঁধা। খাবার-দাবারের ভাবনা নেই—কলা-মুলো, ছেঁড়া কাপড় যা দেবে তাই খাবেন। শুধু গোয়ালে বেঁধে রাখলেই গরুতে কেঁড়ে ভর্তি দুধ দেবে, ক্ষেত ভরে ফসল হবে, খুড়োর বাত সেরে যাবে, একটা হাঁসে ছ'টা করে ডিম পাড়বে—

দুর্যোধন ফিরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কানে এলো : শুধু একটি জিনিস সাবধান। সেটি দেখলেই ওনার মেজাজ বিগড়ে যায়। সেটি হলো—

আর সেটি যে কী, তাই শুনেই দুর্যোধন ঘুরে এলো ষাঁড়ওলার কাছে। একসঙ্গে তার অনেকগুলো কথা মনে পড়ে গেল।

—পাঁচ সিকে দিতে পারি, ষাঁড় দেবে?

—পাঁচসিকে! তা কী করে হয়?—রাখোহরি বললে, অন্তত পাঁচ টাকা হলেও—

—না, পাঁচ সিকের এক পয়সাও বেশি নয়।

—আচ্ছা ন্যাও তবে।—ব্যাজার হয়ে রাখোহরি বললে, বিনি পয়সাতেই লক্ষ্মী ছেড়ে দিলাম। তোমার বরাত ভালো, মোড়ল—নির্ঘাৎ শেয়াল বাঁয়ে রেখে হেঁটে এসেছিলে!

পাঁচসিকে দিয়ে ষাঁড় কিনে, দড়ি ধরে দুর্যোধন রওনা হল বাড়ীর দিকে। দড়ি টানতে হলো না, ষাঁড় আপনিই সুড়-সুড় করে চলতে লাগলো তার সঙ্গে। হাটের লোক তার বোকামো দেখে নানা রকম ঠাট্টা করতে লাগলো, কোত্থেকে সেই তাঁদোড় ছেলে দুটো এসে পেছন থেকে বক দেখাতে লাগলো। কিন্তু দুর্যোধন ভ্রূক্ষেপও করলো না—গম্ভীরভাবে এগিয়ে চললো।

পথে শিবের ষাঁড় বিশেষ গোলমাল করলো না। শুধু একফাঁকে দুর্যোধনের কাঁধ থেকে নতুন নীল গামছাটা নিয়ে খেয়ে ফেললো, তার হাটের বোঁচকা থেকে একটা লাউয়ের বোঁটা বেরিয়েছিলো—সেটা টেনে অনেকক্ষণ ধরে চিবুলো, একজন হাটুরে এক বোঝা শাক নিয়ে যাচ্ছিলো—খাঁ করে তার অর্ধেকটাই মুখে তুলে নিলে! সে গালাগাল করতে লাগলো, দুর্যোধন ফিরেও চাইলো না।

তারপর দুর্যোধন খেয়াঘাটে পৌঁছুলো। নৌকোয় উঠলো না—ষাঁড়ের ঘাড়ে চেপে নদীতে নামলো। ষাঁড় এক-আধবার আপত্তি করলো, ঝেড়ে ফেলতে চাইলো, কিন্তু দুর্যোধন শক্ত করে কুঁজটা পাকড়ে আছে—বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। শুধু দু-একবার চটাং-চটাং করে ল্যাজের ঘা লাগালো, চাবুকের ঘায়ের মতোই লাগলো সেটা। দুর্যোধন মুখ-নাক সিঁটকে বসে রইলো।

আর, তাই দেখে—ঘাট-মাঝির চালার ভেতরে বসে, মুচকে মুচকে হাসলো গোবরা গড়াই : বটে—বটে। এবারেও ঘাটের পয়সা না দিয়ে পালাবার মতলব। দাঁড়াও-দাঁড়াও—

এবারে উঠে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই, সেই টকটকে লাল পাগড়ী মাথায়

চড়িয়ে—আদালতের পেয়াদার মতো মেজাজ নিয়ে গোবরা তেড়ে এলো : বলি, পয়সা না দিয়ে—

আর বলতে হলো না। 'গর্‌র্‌—গুর্‌র্‌—ঝা—ঝাং'—বলে এক গগনভেদী হাঁক ছাড়লো বিশ্বনাথের ষাঁড়। তারপর সামনের পা দিয়ে দু'বার বালি খুঁড়েই—মাথা নামিয়ে সেই মস্ত মস্ত শিং বাগিয়ে গোবরাকে তাড়া করলো।

—বাবা গো গিছি—মেলে—মেলে (মারলে—মারলে)—বলতে বলতে গোবরা প্রাণপণে ছুটলো, ষাঁড়ও ছুটলো পেছনে-পেছনে। সে কি দৌড়! যেন একখানা গাড়ী নিয়েই পাঞ্জাব মেল ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চললো। চোখের পলকে মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড় পেরিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল তারা। পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে কেবল তফাৎ এই যে, এর এঞ্জিনটা পেছন দিকে!

দুর্যোধন মনে মনে বললে, ছোটো গোবর্ধন—ছোটো! শিবের ষাঁড়—দৌড় করাতে করাতে তোমায় কৈলাসে নিয়ে যাবে। ঘাটের পয়সা আর নিতে হচ্ছেনি!

হাঁ, খেয়াঘাটের চার পয়সা বাঁচানোর জন্যেই পাঁচ সিকেতে ষাঁড় কিনেছে দুর্যোধন, দেড় টাকার গামছা আর ছ'আনার লাউটাও গেছে। কারণ, রাখোহরি বলেছিলো, 'এনার সব ভালো—কেবল টকটকে নাল (লাল) কাপড় দেখলিই ক্ষেপে যান।' আর তাই শুনেই গোবরার লাল পাগড়ীটার কথা দুর্যোধনের মনে পড়ে গিয়েছিলো।

গোবরা এবং ষাঁড় এতক্ষণে কত দূরে কে জানে। হয়তো কৈলাসের কাছাকাছিই গিয়ে পৌঁচেছে! খরচ একটু বেশিই হলো, কিন্তু প্রতিশোধের দামটাই কি কম!

একটা বিড়ি ধরিয়ে, গুন-গুনিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ী চললো দুর্যোধন।

তালিয়াৎ

বর্ধমান থেকে ফিরে আসছিলুম। আমি আর হাবুল সেন।

একে কনকনে শীতের রাত, তায় শেষ ট্রেন। ছোট কামরাটায় যাত্রী নেই বললেই চলে। শুধু লাঠি হাতে মোটাসোটা এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্কে চেপে কম্বল মুড়ি দিয়েছেন।

শক্তিগড় স্টেশনে আর এক ভদ্রলোক উঠলেন। রোগা লম্বা চেহারা—গায়ে বেমানান ধুমসো ওভারকোট। কান-মাথা একটা খাকী রঙের মাফলারে জড়ানো। মুখে সরু গোঁফের রেখা—চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমি আর হাবুল তখন বর্ধমানের গল্প করছিলুম। মানে দু'জনে বেড়াতে

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়েছিলুম হাবুলের মাসীমার বাড়ীতে। খাওয়াদাওয়া হয়েছিলো ভালো, মেসো আর মাসীমাও খাসা লোক, কিন্তু মেসোমশাইয়ের এক বন্ধু এসে সব মাটি করে দিলেন। তিনি নাকি খুব বড়ো গাইয়ে। কোত্থেকে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসে 'তেলে না তেলে না তেলে না না দে'—গাইতে লাগলেন। মেসোমশাই ভীষণ খুশি—মাসীমাও ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন, কিন্তু আমরা দুজনে গরম তেলে পড়ে কই-মাছের মতো ছটফট করতে লাগলুম।

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, তোরে সত্য কই প্যালা—গান শুইন্যা আমার মাথাটা বন্‌বনাইয়া ঘুরতে আছিলো।

আমি বললুম, যা বলেছিস, গান তো নয়—যেন মেশিন-গান।

—হঃ, কান ফুটা কইরা দিতাছে একেবারে। আরে বাপু, এত ভালো ভালো রবীন্দ্র-সংগীত থাকতে ক্লাসিকাল গান গাওনের দরকারডা কী! কিছু বোঝন যায় না—ক্যাবল চিৎকার!

ওভারকোট-পরা ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে মিটি মিটি হাসছিলেন। এবার বেশ শব্দ করে গলা খাঁকারি দিলেন। আমরা চমকে তাঁর দিকে তাকালাম।

বললেন, ক্লাসিকেল গান বুঝি তোমাদের ভালো লাগে না?

আমি বললুম, আজ্ঞে ভালো লাগবে কী করে? কিছু তো বোঝা যায় না।

ওভারকোট বিড়িটায় একটা মস্ত টান দিয়ে বললেন, আসল কথা কী জানো, তাল বোঝা চাই। তাল বুঝলেই গান বোঝা যায়।

হাবুল সেন বললে, তাল বুঝুম না ক্যান? তালের বড়া তো খাইতে খুবই ভালো লাগে।

—আহা-হা, সে তাল নয়। গানের তাল।

—অ।

বেশ কায়দা করে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, তালই হচ্ছে গানের প্রাণ। তাল বুঝলেই ক্লাসিকেল গান তালের পাটালীর মতো মধুর লাগবে।

—তালক্ষীরের মতো উপাদেয় মনে হবে—আমি জুড়ে দিলুম।

—ঠিক।—ভদ্রলোক খুশি হলেন: তোমার বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে দেখছি। তালই হলো গানের রস—মানে তালবড়া, তালপাটালী আর তালক্ষীরের কম্বিনেশন।

হাবুল ভেবে-চিন্তে জিগ্যেস করলে, কিন্তু সুর?

আমি বললুম, ওটা গানের শুঁড়। মানে, লোকের কান পাকড়ে আনে। শিব্রাম চক্রবর্তী লিখেছেন।—তারপর বেশ গর্ব করে বললুম, জানেন, শিব্রাম দা'র সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

ওভারকোট হাসলেন : তোমার শিব্রাম দা তো বাচ্চাদের জন্যে হাসির গল্প লেখেন, শুনেছি। কিন্তু গানের তিনি কি জানেন? আমি একটা উপমা দিয়ে বোঝাই। ভোজপুরী লাঠি দেখেছো কখনো?

আমি বললুম, বিস্তর। হাজীপুরে মেজদা থাকে—সেখানে আমি অনেকবার গেছি। গাঁটে গাঁটে বাঁধানো তেল চুকচুকে সব লাঠি—এক ঘা পিঠে পড়লেই আর দেখতে হবে না।

ওভারকোট হাঁটুতে থাবড়া দিলেন : ইয়া! একদম কারেক্ট! গাছকে যদি লাঠি বলে ধরা যায়—তা হলে তাল হলো তার গাঁট। ওই গাঁট না থাকলে লাঠির কোনো মানে হয় না।

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, গানেরও না। তালের গাঁট দুমাদ্দুম পিঠে পড়তে

www.boiRboi.blogspot.com

থাকে।

ওভারকোট আবার হাসলেন : যে তাল বোঝে, তার কাছে ওই গাঁটই আখের গাঁট হয়। একবার চিবুতে শেখো, তারপরেই মন মজে যাবে। আচ্ছা—এখুনি তোমাদের একটু তালিয়ে দিই?

—এখুনি?—প্রস্তাবটা আমার ভালো লাগলো না।

—মন্দ কী?—ওভারকোট অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: কলকাতায় পৌঁছুতে এখনো তো অনেকটা সময় লাগবে। দারুণ শীত পড়েছে, তাল শিখলে শরীরটাও একটু গরম হবে। আচ্ছা—এই দ্যাখো—হাবুলের ছোট চামড়ার সুটকেসটা নিয়ে টকাটক বাজাতে লাগলেন, এই যে দেখছো—এই 'ধা-ধিনা-ধিনা'—এই হচ্ছে দাদ্‌রা!

—অ!

—আর এই 'ধিনি কেটে ধা'—এ হচ্ছে কার্ফা। বুঝেছো? একটু কান পেতে শোনো খুব মিঠে লাগবে।

আমি বললুম, আজ্ঞে খুব মিঠে লাগছে না তো।

—আহা, বাঁয়া-তবলা না থাকলে কখনো বোল্ ওঠে? চামড়ার সুটকেস কিনা—তাই কেবল ঢপঢপ করছে।

—আমি বললুম, তা ছাড়া কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

হাবুল বললে, আহা, এইডা বোঝসনা ক্যান? তাল তো গোলই হইবো। চৌকা তাল কোনোদিন্ দ্যাখ্‌ছস্ নাকি?

ভদ্রলোক নাক দিয়ে কেমন ঘোড়ার মতো আওয়াজ বের করে হিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে কিছুক্ষণ হাসলেন। বললেন, ছেলেমানুষ! তালের নামে তালগোল একটু হবেই। আর চৌকো তালের কথাই যদি বললে, তা থেকে আমার চৌতাল মনে পড়লো। খুব শক্ত জিনিস—ভদ্রলোক টকাটক করে আবার খানিকটা সুটকেস বাজালেন, একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, কী করে যে বোঝাই! আচ্ছা—ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছো?

—পাচ্ছি বই কি।

—কি রকম শোনাচ্ছে?

হাবুল বললে, যেন কইতে আছে : চাইল্‌তা তলায় বইসা যা—পাকা-পাকা খাজুর খা!

ভদ্রলোক বললেন, কী? চাল্‌তে তলায় বসে যা—পাকা পাকা খেজুর খা? বাঃ—মন্দ বলোনি তো। হ্যাঁ, চৌতাল অনেকটা এই রকমই। এই 'ধিনি-গিধা—ধিনি-গিধা—'

আবার টকাটক তাল পড়তে লাগলো সুটকেসে : এই চাল্‌তে তলায় ধা—! পাকা খেজুর খা! ধিনি গিধা—ধা! এবার ঠিক বুঝতে পারছো তো?

হাবুল বললে, আইজ্ঞা না। তবে আপনার আগের দুইটা তাল বেশ বুঝতে আছিলাম। কার পা? না দাদার পা। আইজ্ঞা মশায়, এত জিনিস থাকতে দাদার পা নিয়া টানাটানি ক্যান্?

ওভারকোট একটু বিরক্ত হলেন : আঃ—তুমি তো বড্ড বেরসিক দেখছি! ও দুটো কার পা—দাদার পা নয়। কার্ফা আর দাদ্‌রা।

—অ-অ।

—শোনো, চৌতাল বোঝার আগে ত্রিতালটা একবার জানা দরকার।—ওভারকোট আর একটা বিড়ি ধরালেন, কয়েকটা টান দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে পকেটে পুরে বলতে লাগলেন : একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরো, এই গানটা—বলে গুনগুন করে গাইতে

লাগলেন তিনি :

পঞ্চু পিসে ছাতের পরে
ভূতের সাথে কুস্তি লড়ে!
রাত ঝম্‌ঝম্‌ অন্ধকার—
হুতোম প্যাঁচা আপ্যায়ার।
পঞ্চু পিসে মারলো ল্যাং
মট্‌কে গেল ভূতের ঠ্যাং!
ভূতটা তখন বললে কাঁদি—
'গোবর আনো—পট্টি বাঁধি!'

এই যে করুণ পদটা—মানে, মটকে গেল ভূতের ঠ্যাং—এটাকে খাসা ত্রিতালে ফেলা যায়।—বলেই টকাটক সুটকেসে বাজাতে লাগলেন—না ধিনা ধিনা ধা—না ধিনা—মানে, এই তালটা—

ঠিক সেই সময় আচমকা গাড়ীর ভেতরেও তাল পড়লো। মনে হলো একটা নয়, এক কাঁদি এসে পড়লো!

বাঙ্কে যিনি ঘুমুচ্ছিলেন সেই মোটা ভদ্রলোক এক লাফে নেমে পড়েছেন। ইয়া তাগড়াই চেহারা, লাল টক্‌টকে বড়ো বড়ো চোখ রাগে দপ-দপ করে জ্বলছে!

ওভারকোটের তাল বাজানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, মোটা ভদ্রলোক বাজখাঁই গলায় ওভারকোটকে বললেন—বলি, কী হচ্ছে এসব? এর মানে কী? অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে সয়েছিলুম...সব কিছুর একটা সীমা আছে!

ওভারকোট কেমন শিঁটিয়ে গেলেন। চিঁ চিঁ করে বললেন—এদের একটু তাল শেখাচ্ছিলুম।

—তাল! ওর নাম তাল? আমি পুরুলিয়ার অরবিন্দ মাহাতো, মরিস্‌ কলেজে গান শিখেছি, কাশীর কণ্ঠে মহারাজার ছাত্র—আমার সামনে তাল নিয়ে এয়ার্কি? এদের ছেলেমানুষ পেয়ে ওস্তাদি?

ধিনি কেটে ধা—কার্ফা? পাকা খেজুর খা—চৌতাল?

—আজ্ঞে—

—শাট্‌ আপ!—মোটা ভদ্রলোক সিংহনাদ করলেন : তালের বিন্দু-বিসর্গ জানেন আপনি? সাত বছর গুরুজীর পায়ের কাছে বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাল শিখেছি—আর তাই নিয়ে নষ্টামো? মট্‌কে গেলো ভূতের ঠ্যাং—ত্রিতাল? আর তাল হলো লাঠির গাঁট? তবে লাঠির গাঁটই দেখুন...

বলেই মোটা লাঠিটা তুলে নিলেন বাঙ্ক থেকে।

—এইবার এই লাঠির এক এক ঘায়ে এক একটা তাল বোঝাচ্ছি, আপনাকে। দেখি, কোন্‌ তালে আপনি আছেন। প্রথমেই দাদ্‌রা—

লাঠি তুললেন, কিন্তু দাদরা বাজানোর আর সময় পেলেন না! ওভারকোট তার মধ্যেই সুড়ুৎ করে চলে গিয়েছেন দরজার কাছে। ট্রেন তখন একটা স্টেশনে থামতে যাচ্ছিলো, এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্ল্যাট্‌ফর্মে!

আমরা এতক্ষণ থ হয়ে যেন ম্যাজিক দেখছিলুম! এইবার হাবুল চেঁচিয়ে উঠলো।—বুঝছি, বুঝছি—এইটার নাম ঝাঁপতাল!

ন্যাংচাদার 'হাহাকার'

ক্যাবলা বললে—বড়দার বন্ধু গোবরবাবু ফিলিমে একটা পার্ট পেয়েছে।

টেনিদা চার পয়সার চীনেবাদাম শেষ করে এখন তার খোলাগুলোর ভেতর খোঁজাখুঁজি করছিলো। আশা ছিল, দু-একটা শাঁস এখনো লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিছু পেলে না, তখন খুব বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বললে, বারণ কর ক্যাবলা—এক্ষুনি বারণ করে দে!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করবো? গোবরবাবুকে?

—আলবাৎ। নইলে তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে যাবে!

—ঘুঁটে হবে কেন? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে।...আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে? আমার ন্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিলো, বুঝলি? এখন নেংচে নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুজে খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা গাইতে গাইতে পেরিয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি।...হাবুল সেন মাথা নাড়লো : তোমার ন্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইরা ল্যাংড়া কইরা দিছে।

—হুঃ, মাইর্যা ল্যাংড়া করছে!—টেনিদা ভেংচে বললে, খামোকা বক্‌বক্‌ করিস নি, হাবুল! যেন এক নম্বরের কুরুবক!

ক্যাবলা বললে—কুরুবক তো ভালোই। এক রকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজান্তাগিরি করিসনি। কুরুবক যদি ফুল হয়, তা হলে কানি-বকও একরকমের গোলাপফুল! তা হলে পাতি হাঁসও এক রকমের ফজলী আম! তাহলে কাকগুলোও একরকমের বনলতা হতে পারে!

ক্যাবলা বললে—বা-রে, তুমি ডিক্‌শনারী খুলে দ্যাখো না!

—শাট্‌ আপ! ডিক্‌শনারী। আমিই আমার ডিক্‌শনারী। আমি বলছি কুরুবক এক ধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরী বক। যদি চালিয়াতি করবি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেবো।—আমি জুড়ে দিলুম : কিন্তু বকের বকবকানি এখন বন্ধ করো না বাপু। কী ন্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে?

—অঃ, ফাঁকি দিয়ে গপ্প শোনার ফন্দি? টেনি শর্মাকে অমন 'আন্‌রাইপ চাইল্ড' মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছো, প্যালারাম চন্দর? ন্যাংচাদার রোমহর্ষক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে এক্ষুনি পকেট থেকে ঝাল-নুনের শিশিটা বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে চাটা হচ্ছিলো, আমি বুঝি দেখতে পাইনি?

কী ডেঞ্জারাস চোখ—দেখেছো? কত হুঁশিয়ার হয়ে খাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছে! সাধে কি ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজহরি—তুমি হচ্ছো পয়লা নম্বরের 'শিরিগাল'...মানে ফক্‌স্‌!

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে মানে দিতেই হলো শিশিটা।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রায় অর্ধেকটা ঝাল-নুন একবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে—ন্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে—চোরে চোরে।

—অ্যাঁ! কী বললি?

—না—না, আমি কিছু কই নাই। কইতাছিলাম, একটু জোরে জোরে কও!

—জোরে?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, আমাকে কি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো পেলি যে, খামোকা হাউমাউ করে চ্যাঁচাবো? মিথ্যে বাধা দিবি তো এক গাট্টায় চাঁদি—

আমি বললুম—চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেবো!

—যা বলেছিস!—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস্ করে গাট্টা মারতে যাচ্ছিলো, আমি চট্ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম।

আমাকে গাট্টা মারতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে—দরকারের সময় হাতের কাছে কিছু পাওয়া যায় না—বোগাস্! মরুক গে—ন্যাংচাদার কথাই বলি। খবরদার কথার মাঝখানে ডিসটার্ব করবি না কেউ।

হ্যাঁ, যা বলছি। আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই ন্যাংচাদার ছিলো ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ! বায়োস্কোপ দেখে দেখে রাতদিন ওর ভাব লেগেই থাকতো। বললে বিশ্বাস করবি নে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল। বললে, ওগো তরুণ কদলী! এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে! এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'ওফ্' বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওয়ালা বললে, কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলে রে। দিতে হয় কান ধরে এক থাপ্পড়। ন্যাংচাদা আমার কানে কানে বললে—অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস্?

এমন ভাবের মাথায় কেউ কি আই-এ পাস করতে পারে? ন্যাংচাদা সব সাব্জেক্টে ফেল করে গেল। আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা যা বললেন, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই। মোদ্দা, অপমানে ন্যাংচাদার সারারাত কান কটকট করতে লাগলো। প্রতিজ্ঞা করলো, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে—নইলে এ পোড়া কান আর রাখবে না।

খুব ইচ্ছেশক্তি থাকলে, মানে—মনে খুব তেজ এসে গেলে—বুঝলি, অঘটন একটা ঘটেই যায়। ন্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা 'দি গ্র্যান্ড্' আবার খাবো রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক পেয়ালা চা আর ডবল ডিমের মামলেট নিয়ে বসেছে। এমন সময় খুব সুট-টাই হাঁকড়ে এক ছোক্‌রা এসে বসলো ন্যাংচাদার টেবিলে। ন্যাংচাদা দেখলে, তার কাছে একটা নীল রঙের ফাইল...আর তার ওপরে খুব বড়ো বড়ো করে লেখা 'ইউরেকা ফিলিম কোং'। নবতম অবদান—'হাহাকার'।

ন্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর যেন তিনটে করে উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগলো, নাকের মধ্যে যেন আরশোলারা সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। তার সামনেই জলজ্যান্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান। একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। কে বলে, কলিযুগে ভগবান নেই!

ন্যাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চীজ! তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটী—সে হলো 'হাহাকার' ফিলিমের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। মানে, ছবির ডিরেক্টারকে সাহায্য করে আর কি!

হাবুল বললে—সহকারী পরিচালক।

www.boiRboi.blogspot.com

—চোপরাও!—টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলে চললো, চন্দ্রবদনকে ন্যাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মামলেট্, চারটে টোস্ট্ আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল ন্যাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে—এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেবো। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেবো জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে ন্যাংচাদা বললে, স্টুডিয়োটা কোথায়, স্যার?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাংলে দিলে। বললে—দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে ইউরেকা ফিলিম কোং। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা—টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠলো।

সেদিন রাত্তিরে তো ন্যাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে, কখনো স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনো জয়ধ্বনি করছে, কখনো অট্টহাসি হাসছে। অবিশ্যি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা!

সারা রাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে ন্যাংচাদা সকাল ন'টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসে চেপে বসলো। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়লো বাস থেকে।

খানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই নিশ্চয় ইউরেকা ফিলিম।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল ন্যাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—ভেতর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল, ইউ, এম।

এল-ইউ-এম! লাম! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

ক্যাবলা আপত্তি করলে, লাম! লাম কেন হবে? এফ-আই-এল্-এম্—ফিল্‌ম্!

টেনিদা রেগেমেগে চিৎকার করে উঠলো : সায়লেন্স্! আবার কুরুবকের মতো বক্ বক্ করছিস? এই রইলো গল্প—আমি চললুম।

প্রায় চলেই যাচ্ছিলো, আমরা টেনেটুনে টেনিদাকে বসালুম। হাবুল বললে, ছাইড়া দ্যাও ক্যাব্‌লার কথা—চ্যাংড়া!

—চ্যাংড়া! ফের ডিস্টার্ব করলে ট্যাংড়া মাছ বানিয়ে দেবো বলে রাখছি। হুঃ! লোহার গেট বন্ধ দেখে ন্যাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্রবদন নির্ঘাত গুলপট্টি দিয়ে দিব্যি পরস্মৈপদী খেয়েদেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে, অন্যদিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা তাকিয়ে দেখলো, পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট ফুটো। তার মধ্যে কার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এলো : হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকেছিলেন। এটাতে তো ইউরেকা ফিলিম?

—ইউরেকা ফিলিম?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি দাঁত বের করে কেমন খ্যাক-

খেঁকিয়ে হাসলো লোকটা। তারপর বললে, আলবৎ ইউরেকা ফিলিম। পার্ট করবে? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকবো কী করে?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতে পারবে না, কী বলো?

ন্যাংচাদা ভেবে দেখলে, কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। দ্যাখ্‌না—বোঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, ঝপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এসব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন? ন্যাংচাদা বুঝতে পারলে, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই প্রথম পরীক্ষা।

ন্যাংচাদা কী আর করে? দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগলো। দু' পা ওঠে—আর সড়াৎ করে পিছলে পড়ে যায়। শখের সিল্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়লো, গায়ের নুনছাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় আবার কুটুস করে একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিলে। ভেতরে বোধহয় আরো কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ো জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু ন্যাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দুশো পার্ট করতে এসেছে। আধঘন্টা ধস্তাধস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয় রে আয়—চলে আয় দাদা—আয় রে, আমার কুমড়োপটাশ—

আর বলেই ন্যাংচাদার পা ধরে হ্যাঁচকা টান। ন্যাংচাদা একেবারে ধপাস্ করে নিচে পড়লো। কুমড়োপটাশের মতোই।

কোমরে বেজায় চোট লেগেছিলো, বাপ-রে মা-রে বলতে বলতে ন্যাংচাদা উঠে দাঁড়ালো। দেখলে পাঁচিলে ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড়ো বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

একজন একটা হুঁকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুটি নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবী পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন—মুখে লম্বা লম্বা গোঁফ-দাড়ি—সমানে চেঁচিয়ে বলছে : 'কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিলো পথিকের পায়।' বলেই সে এমন ভাবে ঘ্যাঁক্ করে দৌড়ে এলো যে, ন্যাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কি!

সেই সাহেবী পোশাক পরা লোকটা ধাঁ করে রদ্দা মেরে 'কুকুর আসিয়া এমন কামড়'কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে—বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি।

সকলে চেঁচিয়ে বললে, হিরো—আলবৎ হিরো।

ন্যাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হিরো শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো। বুঝলো, সিনেমায় তো নানারকম পার্ট করতে হয়—তাই ওরা সব ওইরকম সেজেছে, যাকে বলে 'মেক আপ'। তারপর তাকেই হিরো করতে চায়! ন্যাংচাদা নাক আর কোমরের ব্যথা ভুলে একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসলো। বললে, তা আজ্ঞে, হিরোর পার্টও আমি করতে পারবো—পাড়ার থিয়েটারে দু'বার আমি হনুমান সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায়?

সেই জুতোর মালা-পরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শ্বশুরবাড়ি গেছে—জামাই-

www.boiRboi.blogspot.com

ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেকটার!

বালতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে এক চাঁটি দিলে : ইউ ব্লাডি নিগার! তুই ডিরেকটার কিরে? তুই তো একটা হুঁকোবরদার। আমি হচ্ছি ডিরেকটার—আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন চাঁটি খেয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো। আর যে-লোকটা কামড়াতে এসেছিলো, সে সমানে বলতে লাগলো :

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা নদী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—"

তারাবদন ধমকে দিয়ে বললে, চুপ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরোবাবু—তোমার নাম কি?

ন্যাংচাদা বললে, আমার ভালো নাম বিষ্ণুচরণ—ডাক নাম ন্যাংচা।

—ন্যাংচা! আহা—খাসা নাম! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, জানো—আমার ডাক নাম চমচম!

ন্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ চমচম চেঁচিয়ে উঠলো : কোয়ায়েট্! সব চুপ। রিহার্সেল হবে। মিস্টার ন্যাংচা—

ন্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু' পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, দু' পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস্ করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে ন্যাংচাদার গালে। বললে, রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ! যা বলছি, তাই করো। ফিলিমে পার্ট করতে এসেছো—দু' পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না! এয়ার্কি নাকি?

চাঁটি খেয়ে ন্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউমাউ করে দু'পা তুলে দাঁড়াতে গেল। আর যেই দু' পা তুলতে গেছে, ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো : শেম—শেম, পড়ে গেলি! ফাই—ফাই!

ন্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিলিমে নামতে গেলে নিশ্চয় দু' পা তুলে দাঁড়াতে হয়—কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেলো না।

তারাবদন ন্যাংচাদার জুলপি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারলো যে, তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হলো বেচারীকে। তারপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইবো?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

ন্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না...বুঝলি? মানে আমাদের প্যালার চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়—একবার রাস্তায় যেতে যেতে এমন তান ছেড়েছিলো যে, শুনে একটা কাবুলীওলা আচমকা আঁৎকে উঠে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হিরো হওয়ার আনন্দে সেই ন্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরলো :

'ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিলো এক মাসী—

ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী—'

এইটুকু কেবল গেয়েছে...হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠলো : স্টপ—

তারাবদন বললে, না...আর গান না। এবার নাচো—

—নাচবো?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

—নাচতে জানো না...হিরো হতে এসেছো? মামাবাড়ির আবদার পেয়েছো...না? বলেই কড়াৎ করে ন্যাংচাদার জুলপিতে আর এক টান।

গেলুম গেলুম...বলে ন্যাংচাদা নাচতে লাগলো। মানে ঠিক নাচ নয়...লাফাতে লাগলো ব্যথার চোটে।

সকলে বললে, এন্‌কোর...এন্‌কোর!

যেই এন্‌কোর বলা...অম্‌নি তারাবদন আর একটা পেল্লায় টান দিয়েছে ন্যাংচাদার জুলপিতে! 'পিসিমা গো গেছি'...বলে ন্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগলো যে, তার কাছে কোথায় লাগে তোদের উদয়শংকর!

তারাবদন বললে, রাইট। ও-কে! কাট্‌!

কাট্‌! কাকে কাটবে? ন্যাংচাদা ভয় পেয়ে থমকে গেছে। তারাবদন বললে, এবার তা হলে সন্তরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বললে, ঠিক...এবারে সন্তরণের দৃশ্য!

ন্যাংচাদা 'আরে আরে...করছো কি...' বলতে বলতে সবাই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেললো। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে!

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে...সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগলো : সন্তরণ...সন্তরণ!

আর সন্তরণ! ন্যাংচাদার তখন প্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা...জামাকাপড় কাদায় একাকার...নাকে মুখে দুর্গন্ধ—পচা পাঁক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কি জ্বলুনি! ন্যাংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তক্ষুণি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চাঁচাতে থাকে : সন্তরণ...সন্তরণ—

শেষে ন্যাংচাদা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে লাগলো...মানে 'হাহাকার' ফিলিমে পার্ট করতে এসেছিলো কিনা : বাঁচাও...বাঁচাও...আমাকে মেরে ফেললে...আমি আর ফিলিমে পার্ট করবো না...

প্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোত্থেকে তিন-চারজন খাকী শার্ট প্যান্ট্‌ পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এলো সেদিকে। আর তক্ষুণি তারাবদনের দল একেবারে হাওয়া।

ন্যাংচাদার তখন প্রায় নাভিশ্বাস। খাকীপরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শেষে বললে, ক্যা তাজ্জব! ই নৌতুন পাগলা ফির কাঁহাসে আসলো?

ব্যাপার বুঝলি? আরে...ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিয়ো নয়...লাম...মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম...অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু পাঁচিল আর 'লাম' দেখেই ন্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়েছিলো।

সেই থেকে ন্যাংচাদা নেংচে নেংচে হাঁটে...আর সিনেমা হল দেখলেই চোখ বুজে করুণ গলায় গাইতে থাকে : 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু...'

টেনিদা থামলো। আমার ঝালনুনের শিশি ততক্ষণে সাফ।

হাত চাটতে চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোর গোবরবাবুকে বারণ করে দে। আরে—আসলে ফিলিম স্টুডিয়োগুলোও এমনি পাগলা গারদ...গোবরবাবুকে স্রেফ্‌ ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে!

হারানো মেডেল

দিনাজপুরের সেই দীপালী উৎসবের কথা মনে পড়ে গেল।

সেইবারেই প্রথম শুরু কিনা জানি না—অন্তত ভুলে গেছি এতদিন পরে। কিন্তু এই কথাটা ভুলিনি সে বছর তার একটা বিষয় ছিল : কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা।

দিনাজপুর শহর সাহিত্য-সচেতন। লেখার চর্চাও অনেকে করতেন। আর আমি তো তখনো স্কুলের সীমাই পেরোইনি। কবিতা লেখবার দুশ্চেষ্টা অবশ্য করি, কলকাতার শিশু-পত্রিকার গ্রাহক বিভাগে দু-একটা ছাপাও হয়—কিন্তু দীপালী উৎসবের প্রতিযোগিতায় যোগ দেব, এমন দুঃসাহস আমার তখন কোথায়!

পাড়ার বন্ধু সত্য—অর্থাৎ সত্যেশ চক্রবর্তী বললে, ' দে না একটা কবিতা।'

বললুম, 'দুর, কী হবে!'

'আহা, তুই দে না একটা লিখে। দেখাই যাক!'

বললুম, 'ঠিক আছে। কবিতা আমি লিখব। কিন্তু সেটা দিতে হবে তোর নামে—আমার নামে নয়।'

একটু চাপা হাসি হাসল সত্য। বললে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

দীপালীর ওপর একটা কবিতা তো লেখা গেল। কী সেই কবিতা, আজ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কেবল মনে আছে, তাতে কিছু রাজনীতির আভাস ছিল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে খেদ প্রকাশ করা হয়েছিল, দেশমাতার জন্যে দুঃখ ছিল আর মহাকালীকে আহ্বান করে বলা হয়েছিল : আজ আমাদের দেশে শ্মশান-দীপালী, কঙ্কালেরা বুকের পাঁজরে প্রদীপ জ্বেলেছে, দেবী, এরই মধ্যে তুমি আবির্ভূত হও।

খুব সাব্‌লাইম শোনাচ্ছে, কিন্তু অল্প বয়সের আবেগে তা কি রকম দাঁড়িয়েছিল, এতদিন পরে সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। যাই হোক, কবিতা রচনা করে সত্যকে দেওয়া গেল এবং আরো ক'দিন বাদে সেটির অস্তিত্বই প্রায় ভুলে গেলুম আমি।

কিছুদিন পরে দীপালী উৎসব। নিছক দর্শকের ভূমিকাতেই গেছি সেখানে।

www.boiRboi.blogspot.com

মঞ্চে কিসব আলোচনা চলছিল, হঠাৎ তার মাঝখান থেকে—

কী ব্যাপার! একজন কেউ আমার নাম ডাকছেন যে!

সত্য কাছেই ছিল। চুপি চুপি বললে, 'তোর নামেই দিয়ে দিয়েছি কবিতাটা।'

কী অন্যায়! যেমন রাগ হল, তেমনি অস্বস্তি। ভাবলুম, শ্রোতাদের সামনে সব প্রতিযোগীই কবিতা পড়বে, তারপর হবে বিচার। হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। স্কুলের প্রাইজ না হয় করযোড়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে আনা যায়—কিন্তু এই জনতার সামনে! তাতে নিজের কবিতা! এমন বিপদেও পড়ে!

মঞ্চ থেকে আহ্বান আসছে—দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। বন্ধুরাই ঠেলে এগিয়ে দিলে।

এবং আমি—কম্পিত শরীরে, শুকনো গলায় কবিতাটি পাঠ করলুম।

আবার কী আশ্চর্য—জানা গেল, কবিতা রচনায় আমিই পুরস্কৃত, সেইজন্যেই আমাকে ওটা পড়তে বলা হয়েছে। আমি একটি রৌপ্যপদক পাব।

সেই ছোট রুপোর মেডেলটি। এখনো মনে আছে দাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। স্টেশনের কাছে বাহাদুর বাজারে তাঁর বিখ্যাত মিষ্টির দোকান ছিল। তার মিষ্টি অনেক খেয়েছি। বিশেষ করে সে দোকানের 'মোতিচুর' তো ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি মাধুর্যের কারবারী, কিন্তু কবিতার রসেরও সন্ধান রাখতেন—সে খবর কে জানত!

মাথার কাছে সেই রুপোর মেডেলটি রেখে আনন্দে উত্তেজনায় সারা রাত আমার ঘুম আসেনি। তারপর যুগ-যুগান্তর চলে গেল।

পদক পুরস্কার আরো কিছু কিছু আমি পেয়েছি, সাহিত্যের চর্চা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়। কিন্তু সেই ছোট্ট রুপোর মেডেলটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনি। দেশ বিভাগে, জীবনের নানা ঘূর্ণিতে সেটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে দিনাজপুরও—যার আলোতে প্রথম চোখ মেলে আমি জীবন, দেশ আর সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখেছিলুম। কিন্তু বাইরে যা হারায়, হৃদয় তাকে কি হারাতে পারে সব সময়? থেকে থেকে বুকের ভেতরে একটি পদ্মের মতো ফুটে ওঠে দিনাজপুর শহর—বড় মাঠের দেবদারু বনে সন্ধ্যার গন্ধ, কাঞ্চন নদীর হাওয়া, রাজবাড়ীর কালিয়াকান্তজীর মন্দির থেকে সন্ধ্যার আরতি—সব একসঙ্গে মিলে সেই পদ্মটির সুরভিত পর্ণপুটটি গড়ে দেয়।

তারই মাঝখানে ঝিকমিক করে জ্বলতে দেখি আমার হারিয়ে যাওয়া রুপোর মেডেলটিকে।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রভাত সঙ্গীত

টেনিদা অসম্ভব গম্ভীর। আমরা তিনজনও যতটা পারি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করছি। ক্যাবলার মুখে একটা চুয়িং গাম ছিল, সেটা সে ঠেলে দিয়েছে গালের একপাশে—যেন একটা মার্বেল গালে পুরে রেখেছে এই রকম মনে হচ্ছে। পটলডাঙার মোড়ে তেলে ভাজার দোকান থেকে আলুর চপ আর বেগুনী ভাজার গন্ধ আসছে, তাইতে মধ্যে মধ্যে উদাস হয়ে যাচ্ছে হাবুল সেন। কিন্তু আজকের আবহাওয়া অত্যন্ত সিরিয়াস—তেলে ভাজার এমন প্রাণকাড়া গন্ধেও টেনিদা কিছুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না।

খানিক পরে টেনিদা বলল, 'পাড়ার লোকগুলো কী—বল্ দিকি?'

আমি বললুম, 'অত্যন্ত বোগাস।'

খাঁড়ার মতো নাকটাকে আরো খানিক খাড়া করে টেনিদা বললে, 'পয়সা তো অনেকেরই আছে। মোটরওলা বাবুও তো আছেন ক'জন। তবু আমাদের এক্সারসাইজ ক্লাবকে চাঁদা দেবে না?'

'না—দিবো না।'—হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, 'কয়—এক্সারসাইজ কইর‍্যা কী হইবো? গুণ্ডা হইবো কেবল!'

'হ, গুণ্ডা হইবো!'—টেনিদা হাবুলকে ভেংচে বললে, 'শরীর ভালো করবার নাম হল গুণ্ডাবাজি! অথচ বিসর্জনের লরীতে যারা ভূতুড়ে নাচ নাচে, বাঁদরামো করে, তাদের চাঁদা দেবার বেলায় তো পয়সা সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে। প্যালার মতো রোগা টিকটিকি না হয়ে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'আবার আমাকে কেন?'

'ইউ শাটাপ!'—টেনিদা বাঘাটে হুংকার ছাড়ল: 'আমার কথার ভেতরে কুরুবকের মতো—খুব বিচ্ছিরি একটা বকের মতো বকবক করবি না—সে কথা বলে দিচ্ছি তোকে। প্যালার মতো রোগা টিকটিকি না হয়ে পাড়ার ছেলেগুলো দুটো ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজুক, ডন দিক—এই তো আমরা চেয়েছিলুম। শরীর ভালো হবে, মনে জোর আসবে, অন্যায়ের সামনে রুখে দাঁড়াবে, বড়ো কাজ করতে পারবে। তার নাম গুণ্ডাবাজি! অথচ দ্যাখ—দু-চারজন ছাড়া কেউ একটা পয়সা ঠেকালো না। আমরা নিজেরা চাঁদা-টাঁদা দিয়ে দু-একটা ডাম্বেল-টাম্বেল কিনেছি, কিন্তু চেস্ট্ এক্স্প্যান্ডার, বারবেল—'

ক্যাবলা আবার চুয়িং গামটা চিবোতে আরম্ভ করল। ভরাট মুখে বললে, 'কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না।'

হাবুল মাথা নাড়ল: 'দিবো না। ক্লাব তুইল্যা দাও টেনিদা।'

'তুলে দেব? কভি নেহি—' টেনিদার সারা মুখে মোগলাই পরোটার মতো একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা ফুটে বেরুল: চাঁদা তুলবই। ইউ প্যালা!'

আঁতকে উঠে বললুম, 'অ্যাঁ?'

'আমাদের নিয়ে তো খুব উল্টুম-ধুল্টুম গপ্পো বানাতে পারিস, কাগজে ছাপা-টাপাও হয়। একটা বুদ্ধি-টুদ্ধি বের করতে পারিস নে?'

মাথা চুলকে বললুম, 'আমি—আমি—'

'হাঁ-হাঁ, তুই-তুই।'—টেনিদা কটাং করে আমার চাঁদিতে এমন গাঁট্টা মারল যে ঘিলু-টিলু সব নড়ে উঠল এক সঙ্গে। আমি কেবল বললুম, 'ক্যাঁক্!'

ক্যাবলা বললে, 'ও-রকম গাঁট্টা মারলে তো বুদ্ধি বেরুবে না, বরং তালগোল পাকিয়ে যাবে সমস্ত। এখন ক্যাঁক্ বলছে, এর পরে ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক বলতে থাকবে আর ফস করে কামড়ে দেবে কাউকে।'

গাঁট্টার ব্যথা ভুলে আমি চটে গেলুম।

'ঘ্যাঁক্ করে কামড়াব কেন? আমি কি কুকুর?'

টেনিদা বললে, 'ইউ শাটাপ—অকর্মার ধাড়ি।'

হাবুল বললে, 'চুপ কইর‍্যা থাক প্যালা—আর একখান গাঁট্টা খাইলে ম্যাও-ম্যাও কইর‍্যা বিলাইয়ের মতন ডাকতে আরম্ভ করবি। অরে ছাইড়্যা দাও টেনিদা। আমার মাথায় একখান বুদ্ধি আসছে।'

টেনিদা ভীষণ উৎসাহ পেয়ে ঢাকাই ভাষা নকল করে ফেলল: 'কইর‍্যা ফ্যালাও।'

হাবুল বললে, 'আমরা গানের পার্টি বাইর করুম।'

'গানের পার্টি? মানে—সেই যে চাঁদা দাও গো পুরবাসী? আর শালু নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?'—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আহা-হা, কী এক-খানা বুদ্ধিই বের করলেন। লোকে সেয়ানা হয়ে গেছে, ওতে আর চিঁড়ে ভেজে? সারা দিন ঘুরে হয়তো পাওয়া যাবে বত্রিশটা নয়া পয়সা আর দুখানা ছেঁড়া কাপড়। দুদ্দুর!'

ক্যাবলা টকাৎ করে চুয়িং-গামটাকে আবার গালের একপাশে ঠেলে দিলে।

'টেনিদা—দি আইডীয়া!'

আমরা সবাই একসঙ্গে ক্যাবলার দিকে তাকালুম। আমাদের দলে সেই-ই সব চেয়ে ছোট আর লেখাপড়ায় সবার সেরা—হায়ার সেকেন্ডারীতে ন্যাশনাল স্কলার। খবরের কাগজে কুশলকুমার মিত্রের ছবি বেরিয়েছিল স্ট্যান্ড্ করবার পরে, তোমরা তো সে ছবি দেখেছ। সেই-ই ক্যাবলা।

ক্যাবলা ছোট হলেও আমাদের চার মূর্তির দলে সেই-ই সবচেয়ে জ্ঞানী, চশমা নেবার পরে তাকে আরো ভারিক্কী দেখায়। তাই ক্যাবলা কিছু বললে আমরা সবাই-ই মন দিয়ে তার কথা শুনি।

ক্যাবলা বললে, 'আমরা শেষ রাত্রে—মানে এই ভোরের আগে বেরুতে পারি সবাই।'

'শেষ রাত্তিরে!'—হাবুল হাঁ করে রইল: 'শেষ রাত্তিরে ক্যান? চুরি করুম নাকি আমরা?'

'চুপ কর না হাবলা—' ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে, 'আগে ফিনিশ করতে দে আমাকে। আমি দেখেছি, ভোরবেলায় ছোট ছোট দল কীর্তন গাইতে বেরোয়। লোকে রাগ করে না, সকালবেলায় ভগবানের নাম শুনে খুশী হয়। পয়সা-টয়সাও দেয় নিশ্চয়।'

টেনিদা বললে, 'হুঁ, রাত্তিরে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে ভোরবেলায় লোকের মন খুশীই থাকে। তারপর সেই বাজারে কুমড়ো-কাঁচকলা আর চিংড়ি মাছ কিনতে গেল, অমনি মেজাজ খারাপ। আর অফিস থেকে ফেরবার পরে তো—ইরে খ্বাস।'

আমি বললুম, 'মেজদা যেই হাসপাতাল থেকে আসে—অমনি সক্কলকে ধরে ইনজেক্শন দিতে চায়।'

হাবুল বললে, 'তর্ মেজদা যদি পাড়ার বড়ো লোকগুলারে ধইর‍্যা তাগো পুট্‌স্-পুট্‌স্ কইর‍্যা ইন্জেক্শন দিতে পারত—'

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: 'অর্ডার—অর্ডার, ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু ক্যাবলার আইডিয়াটা আমার বেশ মনে ধরেছে—মানে যাকে বলে সাইকোলজিক্যাল। সকালে লোকের মন খুশী থাকে—ইয়ে যাকে বলে বেশ পবিত্র থাকে, তখন এক-আধটা বেশ ভক্তিভরা গান-টান শুনলে কিছু না কিছু দেবেই। রাইট। লেগে পড়া যাক তা হলে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাবের জন্যে আমরা হরিসংকীর্তন গাইব?'

ক্যাবলা বললে, 'হরি-সংকীর্তন কেন? তুই তো একটু-আধটু লিখতে পারিস, একটা গান লিখে ফ্যাল্। ভীম, হনুমান—এইসব বীরদের নিয়ে বেশ জোরালো গান।'

'আমি—'

'হাঁ, তুই তুই।'—টেনিদা আবার গাঁট্টা তুলল: 'মাথার ঘিলুটো আর একবার নাড়িয়ে দিই, তা হলেই একেবারে আকাশবাণীর মতো গান বেরুতে থাকবে।'

আমি এক লাফে নেমে পড়লুম চাটুজ্জেদের রোয়াক থেকে।

'বেশ, লিখব গান। কিন্তু সুর দেবে কে?'

টেনিদা বললে, 'আরে সুরের ভাবনা কী—একটা কেত্তন-ফেত্তন লাগিয়ে দিলেই হল।'

'আর গাইবো কেডা?' হাবুলের প্রশ্ন শোনা গেল: 'আমাগো গলায় তো ভাউয়া ব্যাংয়ের মতন আওয়াজ বাইর অইব।'

'হ্যাং ইয়োর ভাউয়া ব্যাং।'—টেনিদা বললে, 'এ-সব গান আবার জানতে হয় নাকি? গাইলেই হল। কেবল আমাদের খাণ্ডার ক্লাবের গোলকীপার পাঁচুগোপালকে একটু যোগাড় করতে হবে, ও হারমোনিয়াম বাজাতে পারে—গাইতেও পারে—মানে আমাদের লীড করবে।'

হাবুল বললে, 'আমাগো বাড়িতে একটা কর্তাল আছে, লইয়া আসুম।'

ক্যাবলা বললে, 'আমাদের ঠাকুর দেশে গেছে, তার একটা ঢোল আছে। সেটা আনতে পারি।'

'গ্র্যান্ড!'—টেনিদা ভীষণ খুশী হল: 'ওটা আমিই বাজাব এখন। দেন এভরিথিং ইজ কম্‌প্লীট। শুধু গান বাকী। প্যালা—হাফ্ অ্যান আওয়ার টাইম। দৌড়ে চলে যা—গান লিখে নিয়ে আয়। এর মধ্যে আমরা একটু তেলে ভাজা খেয়ে নি।'

মাথা চুলকে আমি বললুম, 'আমিও দুটো তেলে ভাজা খেয়ে গান লিখতে যাই না কেন? মানে—দু-একটা আলুর চপ-টপ খেলে বেশ ভাব আসত।'

'আর আলুর চপ খেয়ে কাজ নেই। যা—বাড়ি যা—কুইক্। আধ ঘন্টার মধ্যে গান লিখে না আনলে ভাব কী করে বেরোয় আমি দেখব। কুইক্—কুইক্—'

টেনিদা রোয়াক থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিল। অগত্যা আমি ছুট লাগালুম। কুইক নয়—কুইকেস্ট যাকে বলে।

জাগো রে নগরবাসী, ভজো হনুমান
করিবেন তোমাদের তিনি বলবান।
ও গো—সকালে বিকালে যেবা করে ভীম নাম
সেই হয় মহাবীর—নানা গুণধাম।
জাগো রে নগরবাসী—ডন দাও, ভাঁজো রে ডাম্‌বেল,
খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—
হও রে সকলে বীর, হও ভীম, হও হনুমান,
জাগিবে ভারত এতে করি অনুমান।

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা গান শুনে বললে, 'আবার অনুমান করতে গেলি কেন? লেখ জাগিবে ভারত এতে পাইবে প্রমাণ।'

টেনিদা বললে, 'রাইট। কারেক্ট্ সাজেসশন।'

হাবুল বললে, 'কিন্তু মানুষরে হনুমান হইতে কইবা? চেইত্যা যাইবো না?'

টেনিদা বললে, 'চটবে কেন? পশ্চিমে হনুমানজীর কত কদর। জয় হনুমান বলেই তো কুস্তি করতে নামে। হনুমান সিং—হনুমানপ্রসাদ, এরকম কত নাম হয় ওদের। হনুমান কি চাট্টিখানা কথা রে। এক লাফে সাগর পেরুলেন, লঙ্কা পোড়ালেন, গন্ধমাদন টেনে আনলেন, রাবণের রথের চুড়োটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে দিলেন—এক দাঁতের জোরটাই ভেবে দ্যাখ একবার।'

'তবে কিনা—খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—' চুয়িং গাম খেতে খেতে ক্যাবলা বললে, 'এই লাইনটা ঠিক—'

আমি বললুম, 'বারে, গানে রস থাকবে না? কলা-আম-জামে কত রস বলদিকি? আর দুটো চারটে ভালো জিনিস খাওয়ার আশা না থাকলে লোকে খামোকা ডাম্বেল-বারবেল ভাঁজতেই বা যাবে কেন? লোভও তো দেখাতে হয় একটু।'

'ইয়া!'—টেনিদা ভীষণ খুশী হল : 'এতক্ষণে প্যালার মাথা খুলেছে। এই গান গেয়েই আমরা কাল ভোর রাত্তিরে পাড়ায় কীর্তন গাইতে বেরুব। ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

আমরা তিনজন চেঁচিয়ে উঠলুম : 'ইয়াক্—ইয়াক্!'

এবং পরদিন ভোরে—

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে কাক ডাকবার আগে, ঝাড়ুদার বেরুনোর আগে প্রথম ট্রাম দেখা না দিতেই—

"জাগো রে নগরবাসী, ভজো হনুমান—"

আগে আগে গলায় হারমোনিয়াম নিয়ে পাঁচুগোপাল। তার পেছনে ঢোল নিয়ে টেনিদা, টেনিদার পাশে কর্তাল হাতে ক্যাবলা। থার্ড লাইনে আমি আর হাবুল সেন। টেনিদা বলে দিয়েছে, তোদের দুজনের গলা একেবারে দাঁড়কাকের মতো বিচ্ছিরি, কোনো সুর নেই, তোরা থাক ব্যাক লাইনে।

আহা—টেনিদা যেন গানের গন্ধর্ব। একদিন কী মনে করে যেন সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠে সুর ধরেছিল—'আজি দখিন দুয়ার খোলা এসো হে, এসো হে, এসো হে।' কিন্তু আসবে কে? জন তিনেক লোক অন্ধকারে ঘাসের ওপর শুয়েছিল, দু লাইন শুনেই তারা তড়াক তড়াক করে উঠে বসল, তারপর তৃতীয় লাইন ধরতেই দুড় দুড় করে টেনে দৌড় এসপ্ল্যানেডের দিকে—যেন ভূতে তাড়া করেছে!

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'তোমার গলায় তো মা সরস্বতীর রাজহাঁস ডাকে—' কিন্তু হাবুল আমায় থামিয়ে দিলে। বললে, 'চুপ মাইরা থাক। ভালোই হইল, তরু আমার গাইতে হইবো না। অরা তিনটায় গাঁ গাঁ কইরা চ্যাচাইবো, তুই আর আমি পিছন থিক্যা অ্যাঁ-অ্যাঁ করুম।'

সুতরাং রাস্তায় বেরিয়েই পাঁচুর হারমোনিয়ামের প্যাঁ-প্যাঁ আওয়াজ, টেনিদার দুমদাম ঢোল আর ক্যাবলার ঝমাঝম কর্তাল। তারপরেই বেরুল সেই বাঘা কীর্তন :

"ওগো—সকালে বিকালে সেবা করে ভীম নাম—"

পাঁচুর পিনপিনে গলা, টেনিদার গগনভেদী চিৎকার, ক্যাবলার কাঁ-কাঁ আওয়াজ, হাবুলের সর্দিবসা স্বর আর সেই সঙ্গে আমার কোকিল-খাওয়া রব। কোরাস তো দূরে থাক—পাঁচটা গলা পাঁচটা গোলার মতো দিগ্বিদিকে ছুটল :

www.boiRboi.blogspot.com

"জাগো রে নগরবাসী, ডন দাও—ভাঁজো রে ডাম্বেল—"

ঘোঁয়াক ঘোঁয়াক করে আওয়াজ হল, দুটো কুকুর সারা রাত চেঁচিয়ে কেবল একটু ঘুমিয়েছে—তারা বাই বাই করে ছুটল। গড়ের মাঠের লোকগুলো তো তবু এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত দৌড়েছিল, এরা ডায়মন্ড হারবারের আগে গিয়ে থামবে বলে মনে হল না।

এবং তৎক্ষণাৎ—

দড়াম করে খুলে গেল ঘোষেদের বাড়ির দরজা। বেরুলেন সেই মোটা গিন্নী—যাঁর চিৎকারে পাড়ায় কাক-চিল পড়তে পায় না।

আমাদের কোরাস থেমে গেল তাঁর একটি সিংহগর্জনে।

'কী হচ্ছে অ্যাঁ! এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা টেনি—কী আরম্ভ করেছিস এই মাঝ রাত্তিরে?'

অতবড়ো লীডার টেনিদাও পিছিয়ে গেল তিন পা!

'মানে মাসীমা—মানে ইয়ে এই—ইয়ে—এক্সারসাইজ ক্লাবের জন্য চাঁদা—'

'চাঁদা! অমন মড়া-পোড়ানো গান গেয়ে—পাড়াসুদ্ধ লোকের পিলে কাঁপিয়ে মাঝ রাত্তিরে চাঁদা? দূর হ এখেন থেকে ভূতের দল, নইলে পুলিস ডাকব এক্ষুনি!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ হল পরক্ষণেই।

কীর্তন-পার্টি শোকসভার মতো স্তব্ধ একেবারে!

হাবুল করুণ স্বরে বলল, 'হইবো না টেনিদা। এই গানে কারো হৃদয় গলবো না মনে হইত্যাছে।'

'হবে না মানে?'—টেনিদা পান্তুয়ার মতো মুখ করে বললে, 'হতেই হবে। লোকের মন নরম করে তবে ছাড়ব।'

'কিন্তু ঘোষ মাসীমা তো আরো শক্ত হয়ে গেলেন'—আমাকে জানাতে হল।

'উনি তো কেবল চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে পারেন, জিম্ন্যাস্টিকের কী বুঝবেন! অল্রাইট—নেক্স্ট্ হাউস। গজকেষ্টবাবুর বাড়ি।'

আবার পদযাত্রা। আর সম্মিলিত রাগিণী :

"খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—
হও রে সকলে বীর, হও ভীম, হও হনুমান—"

পাঁচু, টেনিদা, ক্যাবলা তেড়ে কেবল 'হও হনুমান' পর্যন্ত গেয়েছে, আমি আর হাবলা 'আম' পর্যন্ত বলে সুর মিলিয়েছি, অমনি গজকেষ্ট হালদারের দোতলার ঝুল-বারান্দা থেকে—

না, চাঁদা নয়! প্রথমে একটা ফুলের টব, তার পরেই একটা কুঁজো। মেঘনাদকে দেখা গেল না, কিন্তু টবটা আর একটু হলেই আমার মাথায় পড়ত, আর কুঁজোটা একেবারে টেনিদার মৈনাকের মতো নাকের পাশ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'টেনিদা—গাইডেড্ মিশাইল।'

বলতে বলতেই আকাশ থেকে নেমে এল প্রকাণ্ড এক হুলো বেড়াল—পড়ল পাঁচুর হারমোনিয়ামের ওপর। খ্যাঁচ-ম্যাচ করে এক বিকট আওয়াজ—হারমোনিয়ামসুদ্ধ পাঁচু একেবারে চিৎ—আর ক্যাঁচ-ক্যাঁচাঙ্ বলে বেড়ালটা পাশের গলিতে উধাও!

ততক্ষণে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি। প্রায় হ্যারিসন রোড পর্যন্ত দৌড়ে থামতে হল আমাদের। পাঁচু কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'টেনিদা, এনাফ। এবার আমি বাড়ি যাব।'

হাবুল বললে, 'হ, নাইলে মারা পোড়বা সক্কলে। অখন কুজা ফালাইছে, এইবারে

সিন্দুক ফ্যালাইব। অখন বিলাই ছুইর‍্যা মারছে, এরপর ছাত থিক্যা গোরু ফ্যালাইবো!'

টেনিদা বললে, 'শাট্ আপ—ছাতে কখনো গোরু থাকে না।'

'না থাকুক গোরু—ফিক্যা মারতে দোষ কী। আমি অখন যাই গিয়া। হিস্ট্রি পড়তে হইবো।'

'এঃ—হিস্ট্রি পড়বেন!'—টেনিদা বিকট ভেংচি কাটল: 'ইদিকে তো আটটার আগে কোনোদিন ঘুম ভাঙে না। খবর্দার হাবলা—পালানো চলবে না। আর একটা চান্স নেব। এত ভালো গান লিখেছে প্যালা, এত দরদ দিয়ে গাইছি আমরা—জয় হনুমান আর বীর ভীমসেন মুখ তুলে চাইবেন না? এবং মহৎ কাজ করতে যাচ্ছি আমরা—কিছু চাঁদা জুটিয়ে দেবেন না তাঁরা? ট্রাই—ট্রাই এগেন। মন্ত্রের সাধন কিংবা—ধর, পাঁচু—'

পাঁচুগোপাল কাউমাউ করতে লাগল: 'এক্সকিউজ মী টেনিদা। পেল্লায় হুলো বেড়াল, আর একটু হলেই নাক-ফাক আঁচড়ে নিতো আমার। আমি বাড়ি যাব।'

'বাড়ি যাবেন!'—টেনিদা আবার একটা যাচ্ছেতাই ভেংচি কাটল: 'মামাবাড়ির আবদার পেয়েছিস, না? টেক্ কেয়ার পেঁচো—ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি গান না ধরিস, এক থাপ্পড়ে তোর কান—'

ক্যাবলা বললে, 'কানপুরে চলে যাবে।'

আমি হাবুলের কানে কানে বললুম, 'লোকে আমাদের এর পরে ঠেঙিয়ে মারবে, হাবলা। কী করা যায় বল তো?'

'তুই গান লেইখ্যা ওস্তাদী করতে গেলি ক্যান্?'

'সংকীর্তন গাইবার বুদ্ধি তো তুই-ই দিয়েছিলি!'

হাবুল কী বলতে যাচ্ছিল, আবার প্যাঁ-প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বেজে উঠল পাঁচুর। এবং:

"জাগো রে নগরবাসী—ভজো হনুমান—"

ঢোলক করতালের আওয়াজে আবার চারদিকে ভূমিকম্প শুরু হল। আর পাঁচটি গলার স্বরে সেই অনবদ্য সংগীতচর্চা:

"করিবেন তোমাদের তিনি বলবান—"

কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও। কুঁজো নয়, বেড়াল নয়, গাল নয়, কিছু নয়। সামনে কন্ট্রাক্টার বিধুবাবুর নতুন তেতলা বাড়ি নিথর!

আমাদের গান চলতে লাগল:

"ওগো—সকালে বিকালে যেবা করে ভীম নাম—"

'ডাম্বেল' পর্যন্ত যেই এসেছে, দড়াম করে দরজা খুলে গেল আবার। গায়ে একটা কোট চড়িয়ে, একটা সুটকেস হাতে প্রায় নাচতে নাচতে বেরুলেন বাড়ির মালিক বিধুবাবু।

আমি আর হাবলা টেনে দৌড় লাগাবার তালে আছি, আঁক্ করে পাঁচুর গান থেমে গেছে, টেনিদার হাত থমকে গেছে ঢোলের ওপর। বিধুবাবু আমাদের মাথায় সুটকেস ছুঁড়ে মারবেন কিনা বোঝবার আগেই—

ভদ্রলোক টেনিদাকে এসে জাপটে ধরলেন সুটকেসসুদ্ধ। নাচতে লাগলেন তারপর।

'বাঁচালে টেনিরাম, আমায় বাঁচালে। অ্যালার্ম ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, তোমাদের ডাকাত-পড়া গান কানে না এলে ঘুম ভাঙত না; পাঁচটা সাতের গাড়ি ধরতে পারতুম না—দেড় লাখ টাকার কন্ট্রাক্টই হাতছাড়া হয়ে যেত। কী চাই তোমাদের বলো। শেষ-রাতে তিনশো শেয়ালের কান্না কেন জুড়ে দিয়েছো বলো—আমি তোমাদের খুশী

www.boiRboi.blogspot.com

করে দেব।'

'শেয়ালের কান্না না স্যার—শেয়ালের কান্না না!'—বিধুবাবুর সঙ্গে নাচতে নাচতে তালে তালে টেনিদা বলে যেতে লাগল: 'এক্সারসাইজ ক্লাব—ডাম্বেল-বারবেল কিনব—অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা দরকার—'

বেলা ন'টা। রবিবারের ছুটির দিন। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে আছি আমরা। পাঁচুগোপালও গেস্ট হিসেবে হাজির আছে আজকে।

মেজাজ আমাদের ভীষণ ভালো। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছেন বিধুবাবু। সামনের মাসে আরো পঞ্চাশ টাকা দেবেন কথা দিয়েছেন।

নিজের পয়সা খরচ করে টেনিদা আমাদের আইসক্রীম খাওয়াচ্ছিল। আইসক্রীম শেষ করে, কাগজের গেলাসটাকে চাটতে চাটতে বলল, 'তবে যে বলেছিলি হনুমান আর ভীমের নামে কাজ হয় না? হুঁ হুঁ—কলিকাল হলে কী হয়, দেবতার একটা মহিমে আছে না?'

পাঁচু বললে, 'আর হুলো বেড়ালটা যদি আমার ঘাড়ে পড়ত—'

আমি বললুম, 'আর ফুলের টব যদি আমার মাথায় পড়ত—'

হাবুল বললে, 'কুঁজাখান যদি দমাস কইর‍্যা তোমার নাকে লাগত—'

টেনিদা বললে, 'হ্যাং ইয়োর হুলো বেড়াল, ফুলের টব, কুঁজো! ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

আমরা চেঁচিয়ে বললুম, 'ইয়াক্ ইয়াক্!'

গুরুপ্রাপ্তি

বেলেঘাটা সি. আই. টির ওদিকটায় তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বড়ো রাস্তা আর খুব সুন্দর সব পার্ক। এখনো লোকের ভিড় নেই ওদিকে, তাই সন্ধ্যের পর কোন কোন পার্কে ভারী নিরিবিলিতে বসা যায়। যারা ওদিকটা দেখেনি, তারা ভাবতেও পারবে না, এখনো কলকাতার পার্কে কী চমৎকার নির্জনতা আছে কোথাও কোথাও।

তায় শীতের সন্ধ্যা। প্রকান্ড পার্কের এক ধারে একটা বেঞ্চিতে একা বসে আছি। এমন সময়—

এমন সময় যেন ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল লোকটা।

বেঁটে কালো-কোলো চেহারা, গায়ে হাফ্ শার্ট, পরনে সরু প্যান্ট। কোত্থেকে এসে

আমার পাশে বসে পড়ল ঝুপ করে। ডাকল : দাদা!

ভীষণ চমকে গেলুম আমি। গুন্ডা-টুন্ডা নয় তো? কাছাকাছি লোকজন তো কেউই নেই, ফস্ করে একখানা ছোরা বার করলেই তো গেছি।

বললুম, কোনো মতলব আছে নাকি? কিন্তু আমার পকেটে আছে নগদ বেয়াল্লিশ পয়সা, আর হাতে এই যে ঘড়িটা রয়েছে, এটা ঠাকুর্দার আমলের। দিনে পাঁচ বার দম দিতে হয়, রোজ কুড়ি মিনিট করে স্লো হয়, আর মাসে একবার করে অয়েল করাতে হয়।

লোকটা জিভ কাটল।

—ছি ছি দাদা, কী বলছেন? আমি ও লাইনের লোক নই। আমি যা রোজগার করি, ট্রামে বাসে, টুক করে না জানিয়ে পকেট থেকে তুলে নিই। আপনার পকেটই যদি মারব, তা হলে আর পাশে এসে বসে ভাব জমাতে চাইব কেন?

বললুম, তা ঠিক। কিন্তু আমার পকেটে হাত ঢোকালে যা পাবে সে তো বলেই দিয়েছি। নাট্ বেয়াল্লিশ পয়সা, কয়েকটা সুপুরির কুচি আর একখানা ময়লা রুমাল। তোমার মজুরি পোষাবে না।

—দাদা, ভীষণ মনোকষ্ট হয়েছে। ও লাইন ছেড়ে দেব।

—কেন, লোকে ধরে খুব ঠেঙিয়েছে নাকি?

—আহা, ধরা পড়লে পিটুনি তো খেতেই হয়। ওতে কিছু লাগে না দাদা, গায়ের চামড়া পুরু হয়ে গেছে। আর দু'এক মাস জেল? সে তো নস্যি। বিনি পয়সায় একটু চেঞ্জে যাওয়া আর কী! মন্দ লাগে না, কী বলেন?

বললুম, ঠিক বলতে পারছি না। ও-রকম চেঞ্জে আমি কখনো যাইনি, যেতেও চাই না। কিন্তু তোমার এত ব্যথা হল কেন হঠাৎ!

—দাদা, জীবনে অনেক দুঃখু আছে, যা একেবারে হৃদয় ভেঙে দেয়। প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে। না, আর এ সব নয়। আমার মামার একটা রেস্টুরেন্ট আছে আসানসোলে, সেখানে গিয়েই বরং চপ-কাটলেট আর পরোটা ভাজব।

—ভাজতে জানো নাকি ও-সব?

—জানতে আর কতক্ষণ? চক্ষের নিমেষে কলম-ব্যাগ লোপাট করতে পারি, আর কাটলেট ভাজতে পারব না?

—আলবত পারবে। চক্ষের পলকে খেয়েও ফেলতে পারবে খান কয়েক, তোমার মামা টেরও পাবে না।

—ঠাট্টা করবেন না দাদা, মনে বড়ো ব্যথা। আজ কী হয়েছে জানেন?

পকেট থেকে একটা সুপুরির কুচি বের করে মুখে পুরে বললুম, বেশ—বলো।

—বিকেল থেকে অসম্ভব কষ্টে আছি। ভাবছি কাকে প্রাণের কথা বলি। এই পার্কে এসে আপনাকে দেখলুম, বেশ সদাশয় ভদ্রলোক মনে হল। তাই এলুম আপনার কাছেই।

খুশি হয়ে বললুম, অতি উত্তম। ভনিতা রেখে এবারে বলে যাও।

—দাদা—বলেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়লুম, ঠাঙানি খেলুম, থানায় নিয়ে গেল—সে-সব সয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি পকেটমারকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে লুচি-মাংস আর কোকাকোলা খাইয়ে দেয়—তা হলে কেমন লাগে?

আমি বললুম, ভালোই লাগে। খারাপ লাগবে কেন?

—উঁহু, সবটা শুনুন। আজ শেয়ালদার মোড়ে তাক করে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ

www.boiRboi.blogspot.com

মোটাসোটা আধবুড়ো এক ভদ্রলোক এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। কানে কানে চুপি চুপি বললেন, তোমার সঙ্গে দুটো গোপন কথা আছে।

আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, কে মশাই, আপনাকে তো আমি চিনি না।

তিনি বললেন, আমি তোমায় চিনি। তুমি পকেট মেরে বেড়াও। শেয়ালদা থেকে পার্ক সার্কাস আর শ্যামবাজারের চৌরাস্তা পর্যন্ত তোমার এরিয়া।

আমি আরো ঘাবড়ালুম : আপনি পুলিস নাকি স্যার?

তিনি বললেন, পুলিস! পুলিস-টুলিস আবার কী, ও-সব আমি পছন্দ করি না। আমি একজন মানুষ, তুমিও একজন মানুষ। তাই মানুষ হিসেবে তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই। চলো ওই সামনের হোটেলে।

বলে, আমার হাত ধরে প্রায় টেনেই সামনের একটা হোটেলে নিয়ে গেলেন। তারপর বেশ করে আমাকে লুচি-মাংস আর ঠাণ্ডা একটা কোকাকোলা খাইয়ে দিলেন।

আমি বললুম, এতে তোমার মনে ব্যথা পাওয়ার কী আছে? পরের পয়সায় খেলে তো মন আরো ভালো হয়ে যায় হে।

—আহা, শুনুন না সবটা। তারপর ভদ্রলোক বললেন, এবার তোমাকে কাজের কথা বলি। আমি এই ছমাস ধরে তোমায় ওয়াচ করছি। কোথায় থাকো, কোথায় যাও—ক'বার পকেট মারলে, ক'বার থানায় গেলে—সব দেখেছি। তুমি টেরও পাওনি, আমি নিয়মিত ফলো করেছি তোমাকে।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললুম, কেন স্যার? আপনার কি কাজ-কর্ম নেই?

তিনি বললেন, না। আমি রিটায়ার করেছি, আমার ছেলেরা চাকরি-টাকরি করে, সংসার চলে যায়। তাই ভেবেছি, এখন কিছু পরোপকার করব। দু'এক জনকে আমি উদ্ধার করব, অন্ধকার থেকে আলোয় আনব। একদিন তুমি যখন ধরা পড়ে বৌবাজারে পিটুনি খেতে খেতে সড়াক্ করে একটা গলি দিয়ে পালালে—সেদিনই চিনে রেখেছি তোমায়। রোজ ওয়াচ করেছি। তারপর আজ ধরেছি এসে। তোমাকে আমি ত্রাণ করব, অন্ধকার থেকে আলোয় আনব। একজনকেও যদি সৎপথে আনতে পারি, তবে এই নশ্বর জীবন ধন্য। শোনো, আজ থেকে আমি তোমার গুরু।

'গুরু!' আমি চমকে বললুম, আমার গুরু তো স্যার কলাবাগানের গাঁট্টা মিঞা।

উঁহু, ও-সব পকেট মারা গুরুতে চলবে না। আসল গুরু। গীতায় শ্রীভগবান কী বলেছেন, জানো? সদ্গুরু দরকার। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, উঁহু, ও-সব সংস্কৃত-টংস্কৃত তুমি বুঝবে না। মানে—গুরুর কাছে উপদেশ নেবে, সেবা করবে, জিজ্ঞেস করবে। তুমি গোরুর সেবা করতে পারো? বিচুলি কাটতে পারো? গোবর সাফ করতে পারো? তা হলে চলো আমার বাড়িতে! আমার তিনটে গোরু আছে, সেবা করবে।

বললুম, না স্যার, গোরুর সেবা আমার আসে না। আমাকে ছাড়ুন, আমি যাই।

কপাৎ করে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, যাবে কি হে, এখুনি যেতে দিচ্ছে কে তোমায়? আর একটা কোকাকোলা খাবে নাকি?

দারুণ জোর ভদ্রলোকের গায়ে, বোধহয় মুগুর-টুগুর ভাঁজতেন, হাত ছাড়াতে পারলুম না। বললুম, না স্যার, আর কোকাকোলা নয়। খুব হয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে, খেয়ো না। কিন্তু আর আমাকে স্যার বলবে না, গুরুদেব বলবে। এই লুচি-মাংস খাইয়ে আজ থেকে তোমায় দীক্ষা দিলুম। তুমি আমার শিষ্য। তোমার বস্তির ঘর পিছে পিছে গিয়ে আমি চিনে রেখেছি, তুমি যদি আমার গোরুর সেবা না করতে চাও, কোরো না। আমি নিজেই কাল থেকে রোজ

ভোর সাড়ে পাঁচটায় তোমার কাছে যাব, তোমাকে উপদেশ দেব দু'ঘণ্টা ধরে। তুমি আমার পা টিপবে—হাওয়া করবে, উপদেশ শুনবে, আর মানুষ হয়ে যাবে।

শুনে আমার দম আটকাবার জো! বললুম, কালকের কথা কাল। আজ ছেড়ে দিন স্যার, বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে? এখুনি যে লুচি-মাংস খেলে? আরো খাবে? আচ্ছা—এই বস—

তাড়াতাড়ি বললুম, না স্যার, ভুল হয়েছিল। খিদে পায় নি, পেট কামড়াচ্ছে।

—পেট কামড়াচ্ছে? ও কিছু না। সদুপদেশ শোনো, কোথায় মিলিয়ে যাবে ওসব। দীক্ষার দিনে কিছু উপদেশ নিতে হয়। তা হলে প্রথমেই বোঝা দরকার : তুমি কে? তুমি মানুষ। মানুষ কে? নারায়ণ। তা হলে সব মানুষই নারায়ণ। তুমি এক নারায়ণ হয়ে আর এক নারায়ণের পকেট মারবে? ভগবান কি নিজের পকেট নিজে কাটেন? শুনেছ কখনো? নিশ্চয় শোনো নি। তা হলে জীবাত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্ব তোমায় গোড়াতে বুঝতে হয়। জীবাত্মা কী? না—আমাদের শরীরে—

—বলব কি দাদা—বিকেল চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা অবধি আমার কানের কাছে যেন কামান দাগতে লাগলেন—আমার মাথা ঘুরতে লাগল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল, কেঁদে ফেললুম, বার বার বলতে চাইলুম 'থামুন থামুন—' কে থামে! শেষকালে আমি ভির্মি গেলুম!

—ভির্মি গেলে?

—আর কেউ হলে বেঘোরে মারা যেতো দাদা, আমি পকেটমার বলে সামলে গেছি। উনিই মাথায় জল-টল দিয়ে চাঙ্গা করলেন আমায়। বললেন, ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই। কিন্তু কাল ভোরেই আমি তোমার বাসায় যাচ্ছি। একটা কুশাসন রেডি রেখো, তাইতে বসে উপদেশ দেব। সাতদিনের মধ্যেই দেখবে তোমার আত্মার কী উন্নতি হচ্ছে!

কিন্তু সাতদিন! অত দেরী হবে না স্যার, কাল ভোরে যদি এসে পৌঁছে যান—আসবেনই—তা হলে সকাল সাতটার মধ্যেই আমার আত্মার উন্নতি কম্প্লিট—প্রাণ দেহ ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যাবে। একবার ভেবেছিলুম বাসা বদলাই, কিন্তু গুরুদেবের যে রোখ দেখলুম—কলকাতার যেখানে যাব, সেখানেই খুঁজে বের করবেন, আর বলতে থাকবেন : 'জীবাত্মার পর পরমাত্মা—কিনা ব্রহ্ম!' না স্যার, আর নয়—আজ রাত্রেই আমি চলে যাব আসানসোলে, কাল থেকে মামার দোকানে কাটলেটই ভাজব।

শুনে আমি বললুম, তা ভেবে দেখতে গেলে উনি তো ভালোই চান। এই সব পকেট-মারা চুরি-চামারি—এতে করে তোমার আত্মা তো—

'আত্মা' পর্যন্ত বলার ওয়াস্তা! চোখ দুটো গোল করে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তখুনি।

—আঁ দাদা, আপনিও! আর আপনাকে আমি সদাশয় ভেবেছিলুম!

বলেই টেনে দৌড়! প্রায় ত্রিশ মাইল স্পীডে। এক লাফে পার্কের রেলিং পেরিয়ে হাওয়া।

তা মন্দ না—আমি ভাবলুম। এই রেটে যদি ছুটতে পারে, তা হলে ট্রেনের দরকার হবে না আর, ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে আসানসোলে।

www.boiRboi.blogspot.com

চুল কাটার ভয়ে

সেলুনে চুল কাটতে গিয়েছিলুম। অল্পবয়েসী পরামাণিক ছেলেটি একবার আমার দিকে তাকিয়ে, মুচকে হেসে আর একজন খরিদ্দারকে বললে, 'আপনি একটু বসুন, দাদা! আমি এঁ'রটা পাঁচ মিনিটেই সেরে দিচ্ছি।'

তার মানেটা বুঝতে পারছ? আমার তো মাথাভর্তি মস্ত টাক; অল্প দু'-চার-গাছা চুল যা আছে তা ছাঁটাই করতে কীই-বা আর সময় লাগবে? কাজেই অন্য খরিদ্দার এ-সময়টুকু নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারে।

সেলুনওলা আজকে আমার টাকের দিকে তাকিয়ে যা-ই বলুক, ছেলেবেলা আমার মাথার চেহারাই ছিল অন্য রকম। রাশি রাশি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, ছাঁটবার পনেরো দিন যেতে না যেতে ধামার মতো ফুলে উঠত। সে চুল এত ঘন যে আমাদের ভগবান-দা বলত : 'ছোট দাদাবাবুর চুল কাটতে আমার কাঁচি ভেঙে যায়।'

ছেলেবেলায় এই ভগবানদা ছিল আমাদের বিভীষিকা।

সে যে কতদিন থেকে আমাদের বাড়িতে কামাচ্ছে আমরা কেউ জানি না। বয়সে বাবার চাইতেও ঢের বড়ো, রোগা লম্বা মানুষটা, মাথার চুল সব প্রায় শাদা হয়ে এসেছে, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা। বাবা তাকে দাদা বলতেন, আমরাও বলতুম। আর ভগবানদার নাতি ভোলা ছিল আমাদের বন্ধু, স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত আমাদের সঙ্গে।

ভোলা আমাদের বন্ধু হলে কী হয়, তার ঠাকুর্দাকে আমি আদৌ পছন্দ করতুম না। সবাই বলত, ভগবানদা খুব ভালো লোক, কিন্তু আমার কখনো সে কথা মনে হত না। ছেলেবেলার চুল ছাঁটবার কথা মনে হলেই আমার গায়ে জ্বর আসত। আর বাড়িতে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ দু'বার—অর্থাৎ একটা করে রবিবার বাদ দিয়ে চুল আমাদের ছাঁটতেই হবে—বাবা কিংবা বড়দা দাঁড়িয়ে থেকে তার তত্ত্বাবধান করবেন।

রবিবারের ছুটির সকালে সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা, তা বলে বোঝাবার নয়। বাড়ির সামনেই মাঠ ছিল, দেখতুম সেখানে ছেলেদের দঙ্গল জমেছে, খেলা চলছে, হৈ-হৈ চিৎকার উঠছে। তার ভেতরে ভগবানদার কাঁচির সামনে সেই যে ঘাড় পেতে দিয়ে বসে আছি, আছিই! খুচ্‌খাচ্‌-কুচ্‌-কাটাস্‌ চলছেই, মাথা এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘোরাতে ঘোরাতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, ভগবানদার আর কিছুতেই পছন্দ হয় না।

'আঃ—এত নড়া-চড়া করো কেন? চুপ করে বোসো—নইলে চুল খারাপ হয়ে যাবে। এই একটু—আর একটু—এই হয়ে গেল!'

'এই হয়ে গেল' মানে আরো ঝাড়া পনেরো মিনিট।

চুল কাটা শেষ হল তো ঠাকুরমা'র পাল্লায়। তখন ইঁদারার সামনে বসে স্নান করা, সাবান ঘষা—আরো প্রায় একটি ঘণ্টা। তার মানে, রবিবারের সকালটা একেবারেই বরবাদ।

ভগবানদার জ্বালায় এই ভাবে জেরবার হতে হতে শেষ পর্যন্ত আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এক রবিবার না হয় চুল কাটা বাদই রইল, না হয় চুল আধ

ইচ্ছে বেশি বেড়েই গেল—এমন কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয় তাতে? আমার যদি অসুবিধে না হয়, ঘাড় কুট্ কুট্ না করে, তোমাদের কী? কিন্তু কথাটা না বলা যায় বাবাকে, না বোঝানো যায় দাদাকে। আর ভগবানদা তো কাঁচি হাতে তৈরি হয়ে বসেই রয়েছে, চুলের ঝুঁটি একবার পাকড়ে ধরতে পারলেই হল।

'ছিঃ দাদাবাবু, চুল কাটব না বলতে হয়? মাথার চুল বড় থাকলে লোকে যে পাগল বলবে!'

'বলুক।'

'দুষ্টুমি করতে নেই দাদাবাবু, ঠান্ডা হয়ে বোসো। দশ মিনিট। আজ ঠিক দশ মিনিট বাদেই তোমায় ছেড়ে দেব।'

তারপরেই মাথা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। একবার এখানে খ্যাঁচ, আর একবার সেখানে খচ। মানে ঠিক সেই একটি ঘন্টা। একদিন প্রতিজ্ঞা করলুম, সামনের রবিবারে ভগবানদাকে আমি ফাঁকি দেবই, যেমন করে হোক।

বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা বৃথা, কারণ খিড়কির দিকে মা-ঠাকুরমার নজর। সদর দরজার সামনে পাহারাওলার মতো বড়দা হাজির। বৈঠকখানা দিয়েও বেরুনো যায়, কিন্তু সেখানে বাবা কাগজ পড়ছেন। অতএব তিনটে রাস্তাই বন্ধ।

কিন্তু ভগবান স্বয়ং পথ দেখিয়ে দিলেন।

আমাদের পশ্চিমের ঢাকা বারান্দায় কতগুলো পুরোনো ফার্নিচার আর প্যাকিং বাক্সের স্তূপ পাহাড়ের মতো জড়ো হয়ে ছিল কতকাল ধরে। কেউ সেখানে যেত না—ওর ভেতরে কী আছে আর কী যে নেই, তাও বোধ হয় কারুর জানা ছিল না। কিন্তু যে রবিবারে ভগবানদা আসবে, তার আগের দিন আমি আবিষ্কার করলুম ওর ভেতরে পালিয়ে থাকবার চমৎকার জায়গা আছে একটা।

আমার একটা মার্বেল গড়িয়ে গিয়েছিল ওদিকে। তার সন্ধানে দু'-তিনটে কাঠের বাক্স টেনে সরাতেই দেখি—একটা মস্ত তক্তোপোষ রয়েছে ওখানে। ভাঙাচুরো জিনিসপত্রগুলো তারই ওপরে ডাঁই করা। তক্তোপোষটার তলায় যে কেউ দিব্যি লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে, বাইরে কাঠের বাক্সগুলোর আড়াল থাকলে দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, কেউ সন্দেহও করতে পারবে না যে ওখানে মানুষ আছে। হাত দিয়ে দেখলুম, ধুলো-ময়লাও বিশেষ নেই।

ভগবানদা সাধারণতঃ আসত বেলা আটটা নাগাদ। আমাদের জলখাবারের পাট মিটে যেত সাড়ে সাতটার মধ্যেই। সেদিনও সকালের বরাদ্দ রুটি আর সুজি গিলে নিয়ে আমি ফাঁক খুঁজতে লাগলুম। তারপর যেই দেখলুম পশ্চিমের বারান্দার দিকে কেউ নেই, তৎক্ষণাৎ বাক্স সরিয়ে—

আঃ—কী আরাম। মনে হচ্ছে যেন কোন্ পাতালপুরীতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি। আবছা অন্ধকারে নানা রকম পুরোনো জিনিসের গন্ধ—যেন আমার চারদিকে যখের ধন লুকোনো রয়েছে, হাত বাড়ালেই আমি খুঁজে পাব। অল্প অল্প গরম লাগছিল—তা সত্ত্বেও ওই ভাবে লুকিয়ে থাকতে বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর কেউ কোনোদিন আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

তারপর ভগবানদার গলা শোনা গেল বাড়ির বাইরে। আমি কান খাড়া করলুম। তারও খানিক পরে যা শুরু হল সেইটেই আসল মজার।

আমার নাম ধরে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি। গেল কোথায়?

'এই তো এখানেই ছিল!'

'না—বাইরে তো বেরোয় নি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা হলে ছেলে কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?'

খোঁজ—খোঁজ। আমার নাম ধরে ডাকাডাকি। মেজদা বললে, 'নিশ্চয় কোন্ ফাঁকে বাচ্চুদের বাড়ি পালিয়েছে। আমি ধরে আনছি।'

'কান ছিঁড়ে ফেলে দেব।'—বড়দা লাফাতে লাগল।

আর এই সব হৈ চৈ হট্টোগোলে আমার দারুণ হাসি পেতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেল, তারপর কখন এক ফাঁকে—

অনেকগুলো খর্‌খরে পা যেন ছুরির ফলার মতো আমার নাক মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কী বিশ্রী গন্ধ সেই সঙ্গে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আরশোলা!—দলে দলে আরশোলা! আমার নাক মুখ কানের ওপর দিয়ে তারা মার্চ করে বেড়াচ্ছে।

আমি তক্তোপোষের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। এদিকে আমার সর্বাঙ্গে আরশোলা, ওদিকে ঠাকুরমা চিৎকার করে কাঁদছেন: 'নিশ্চয় ছেলেধরায় নিয়ে গেছে, নইলে নদীতে গিয়ে পড়েছে। তা না হলে—'

তখন আর ভগবানদার ভয় নয়, আরশোলার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এক লাফে আমি ছিট্‌কে পড়লুম বাইরে। কাঠের বাক্সের স্তূপে যেন সাইক্লোন ঘটে গেল।

'এই যে আমি—এই যে—'

দুহাতে গায়ের আরশোলা ঝাড়তে ঝাড়তে আমি লাফাতে লাগলুম: 'এই যে—এই যে—'

'ওরে সর্বনেশে ছেলে! কোথায় ছিলি?'—কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরমা ছুটে এলেন আমার দিকে। বাবা এলেন, মা এলেন, বড়দা-মেজদা-বোনেরা সবাই দৌড়ে এল।

'কোথায় ছিল, কোথায় ছিল?'

কিন্তু সেটা গল্প নয়। আসল ব্যাপার হল, ভগবানদাকে আসতে হল পরের দিন, মানে সোমবারেই।

আর এবার তার কাঁচির সামনে ইচ্ছে করেই আমি ঘাড় পেতে দিলুম—মানে, না দিয়ে উপায় ছিল না। আরশোলারা বাগে পেয়ে এমন ভাবে আমার চুল কেটে নিয়েছিল যে সে-যাত্রা সোজা কদম ছাঁট দিয়েই স্কুলে যেতে হল আমাকে।

ভুতুড়ে কামরা

ওদের বাড়ির নিমগাছটার তলায় বসে কান চুলকোতে চুলকোতে বলটুদা আমায় জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা প্যালা, ভূত সম্বন্ধে তোর আইডীয়া কী?

আমি বললুম, কোন আইডীয়া নেই।

শুনে বলটুদা ভীষণ ব্যাজার হল। এত ব্যাজার হল যে খচ্ করে কানে একটা খোঁচাই খেয়ে গেল। শেষে মুখটাকে এক ভাঁড় রাবড়ির মতো করে বললে, কেন? আইডীয়া নেই কেন?

আমি বললুম, কী করে থাকবে? কখনো দেখিনি তো।

—শুনে-টুনেও কিছু মনে হয় না?

—একদম না। লোকে নানা রকম ডেস্‌ক্রীপশন দেয়। কেউ বলে, খামোকা একটা কাটামুণ্ডু ঘ্যাঁচাং করে কামড়াতে এল, কেউ বলে সাদা কাপড় পরে রাত দুপুরে ছাতের ওপর হেঁটে যাচ্ছে, কেউ বলে আমগাছে এক পা আর জামগাছে আর এক পা দিয়ে—

বলটুদা বললে, বাজে বকিস্ নি। ধর, এই নিমগাছটায় একটা ভূত আছে—

এই দিন-দুপুরেই দারুণ চমকে আমি একবার নিমগাছটার দিকে চেয়ে দেখলুম। না, ভূত-টুত কিছু নেই, কেবল ঠিক আমার মাথার ওপরেই একটা কাক বসে রয়েছে। কাককে আদৌ বিশ্বাস নেই, একটু সরে বসলুম তক্ষুনি।

বলটুদাকে বললুম, তোমার নিমগাছের ভূতকে খামোকা আমি ধরতে যাব কেন? কী দরকার আমার? ভূত ধরা-টরা আমি আদৌ পছন্দ করি না—তোমাকে সাফ বলে দিচ্ছি।

—কিন্তু মনে কর, ভূত যদি তোকেই ধরে? মানে, তোকেই ধরতে পছন্দ করে যদি?

আমি দস্তুরমতো ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, বলটুদা, এবার আমি বাড়ি চলে যাব।

বলটুদা খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে টেনে বসালে। বললে, আহা, যাচ্ছিস কেন? বললুম বলেই কি সত্যি সত্যিই ভূতে ধরছে নাকি তোকে? মানে, আমি সেদিন ভূতের পাল্লায় পড়েছিলুম কিনা—সেই ব্যাপারটাই তোকে বলব।

আমি বললুম, তুমি আবার কবে থেকে আমাদের টেনিদার মতো গল্পবাগীশ হলে বলটুদা?

টেনিদার নাম শুনেই বলটুদা জ্বলে গেল। বললে, টেনি! তার কথা আর বলিস নি! তোদের দলের ওই সর্দারটা এক নম্বরের গুলবাজ—খালি বানিয়ে বানিয়ে যা তা গপ্প বলে। সেদিন আবার আমাকে দিব্যি ভুজুং-ভাজুং দিয়ে 'দি গ্রেট্' আবার খাবো রেস্তোরাঁয় আড়াই টাকার খেয়ে গেল।—নাকটাকে কি রকম যেন তেলে ভাজা সিঙাড়ার মতো করে বলটুদা বললে, ছোঃ ছোঃ! যাবার আগে আমার পিঠ চাপড়ে কী সব মেফিস্টোফিলিস-টিলিস বলেও গেল—কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। রামো—রামো—টেনি আবার একটা মানুষ!

বুঝতে পারলুম, টেনিদা বলটুদার প্রাণে দারুণ দাগা দিয়ে গেছে, আড়াই টাকার

শোক আর বলটুদা ভুলতে পারছে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, টেনিদার কথা ছেড়ে দাও, ও ওই রকম। তোমার ভূতের গল্পটাই বলো।

—গল্প? আমি বানিয়ে বলার মধ্যে নেই। যা বলব, একদম সত্য ঘটনা।

—আচ্ছা, বলতে থাকো।

তখন বলটুদা আর একবার বেশ করে কান চুলকে নিলে, তারপর বলতে থাকল।—

আমার বড়দির বড়ো মেয়ে—দিল্লীতে জন্মেছে বলে যার নাম রাজধানী, ছোট-বেলায় যাকে আমি ভুল করে 'দাদখানি' বলে ডাকতুম, আর বড়দি যাকে বলত 'ধানী লঙ্কা', তার বিয়ে হয়েছে এক কোলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। এবার পুজোর ছুটিতে আমি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

দিন দশেক বেশ আরামে থেকে, খুব খেয়ে দেয়ে, ওদের মটর গাড়িতে অনেক বেড়িয়ে-টেড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসছিলুম। সন্ধ্যের পরে গাড়ি বদলাতে হল ছোট একটা জংশন স্টেশনে। ট্রেনে বেজায় ভিড়, শেষে দেখি, পেছন দিকের একটা ছোট সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে সব যাত্রী হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে। দেখে খুব মজা লাগল, আমি ফাঁকা গাড়িটায় টুপ্ করে উঠে বসলুম। সতরঞ্চি-জড়ানো ছোট বিছানাটা পেতে, মাথার কাছে সুট্‌কেসটা রেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়া গেল।

ট্রেন আরো প্রায় কুড়ি মিনিট এখানে থাকবে, আমি বসে বসে দেখতে লাগলুম। অন্য সব গাড়িতে লোক উঠছে-নামছে, এদিকে কেউ আর আসছে না। বোধহয় পেছন দিকের গাড়ি বলেই এটার ওপর কারুর নজর নেই। আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। একটা রেলের কামরায় একলা যেতে ভারী মজা লাগে—নিজেকে বেশ লাট-বেলাটের মতো মনে হয়।

এর মধ্যে জন দুই মাড়োয়ারী যাত্রী অনেক লটবহর নিয়ে আমার গাড়ির দিকেই তাক করে আসছে বলে বোধ হল। ভাবলুম—এই রে, এসে ঢুকল বুঝি! হঠাৎ একজন লোক তাদের কী যেন বললে, অমনি তারা সঙ্গে সঙ্গে উল্‌টো দিকে ছুটল। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপরেই মনে হল, ওদের বোধ হয় থার্ড ক্লাসের টিকিট ছিল, ওই লোকটা বলে দিয়েছে এটা সেকেন্ড ক্লাস, সেই জন্যেই সরে পড়ল।

যাই হোক, বেশি ভেবে চিন্তে লাভ নেই। গাড়ি ছাড়তে আরো কিছু দেরী আছে, কিন্তু আমি আর বসতে পারছিলুম না। একে তো আসবার আগে রাজধানী বিস্তর খাইয়েছে, বলেছে, 'ছোট মামা, রেলে খালি পেটে যেতে নেই, শরীর খারাপ করে।' আমিও তাই শুনে লুচি-মাংস-মিষ্টিতে গলা পর্যন্ত ঠেসে নিয়েছি, তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেল, পেটে এখনো দেড় মণ ভার। তায় রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল। গাড়িতে যে ওঠে উঠুক, আমি তো আপাতত লম্বা হই!

যা ভাবা তাই করা। আমি শুয়ে পড়লুম। গাড়ি ছাড়তে বোধহয় মিনিট দশেক দেরী ছিল তখনো, কিন্তু আমার ঘুমিয়ে পড়তে তিন মিনিটও লাগল না। আর সেই ঘুমের ভেতরেই টের পেলুম ট্রেনের হুইসেল বাজছে, কামরাটা নড়তে আরম্ভ করেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় আধখানা চোখ খুলে দেখলুম অন্য যাত্রী আর কেউ ওঠে নি। নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাক তবে।

নিশ্চিন্তেই আমি ঘুমোলুম।

www.boiRboi.blogspot.com

রাত তখন কত হয়েছে জানি না, হঠাৎ আমার চটকা ভাঙল। ভীষণ মশা কামড়াচ্ছে আর কি রকম একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে লাগছে। চমকে চেয়ে দেখি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামরায় নিতল অন্ধকার—গোটা চারেক আলো জ্বলছিল, পাখা ঘুরছিল, কিন্তু এখন আলো নেই, পাখাও চলছে না।

ব্যাপারটা কী?

বাইরে তাকালুম—কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কালো পাঁচিলের মতো থমথমে অন্ধকার। সে অন্ধকারে একটাও তারা নেই, জোনাকি নেই, কিছু নেই। জানলার অন্য দিকে তাকালুম, ঠিক এক দৃশ্য। যেন রাতারাতি গাড়িটাকে কেউ একটা আলকাতরার সমুদ্রের ভেতর তলিয়ে দিয়েছে। তারপরে মনে হল, কেবল আলকাতরা নয়, ধোঁয়ার মতো কী যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে তার ভেতর—নিশ্চয় কুয়াশা।

ব্যাপারটা কী?

রাত যে কখনো এত অন্ধকার হয়, সে আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আকাশে যদি ঘন কালো মেঘ দেখা দেয়, তার ভেতরেও অন্ততঃ আবছা একটা আলোর আভাস থাকে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। তাও যদি না হয়, লাইনের ধারে ঝোপে জঙ্গলে অন্ততঃ দুটো একটা জোনাকির ফুলকি জ্বলে। এমন কাণ্ড তো কখনো দেখি নি!

ট্রেন কি কোনো স্টেশনে থেমে আছে? তা হলে আলো কই? স্টেশনের বাইরে লাইন-ক্লিয়ার না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? তা হলে সিগ্‌ন্যালের বাতিও তো দেখা যাবে। কোথায় সে সব?

এদিকে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাক খাচ্ছে আমাকে ঘিরে ঘিরে। আর কী নিদারুণভাবে যে মশা কামড়াচ্ছে—সে আর তোকে কী বলব প্যালা! তার ওপর দুর্দান্ত গরম! আমি বসে বসে ঘামতে লাগলুম।

বেঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিলুম, মশাদের যত নজর দেখছি পায়ের ওপরেই। শেষে জেরবার হয়ে যেই একটা চাঁটি হাঁকড়েছি—তোকে কী বলব প্যালা—সেটা আমার পায়ে লাগল না!

থরথরে লোমওলা নরম কী একটা জিনিসের ওপর ধপাং করে গিয়ে চড়টা পড়ল। ঘ্যাঁং করে কী একটা বিটকেল আওয়াজ হল, কালো মতন কে যেন শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আমার চোখের সামনে দুটো সবুজ আগুন দপ্‌দপ্ করে উঠল, তারপরেই কী যেন ধপাং করে বাইরে পড়ে গেল!

আমি বুঝতে পারলুম, কামরার দরজাটা খোলা!

উঠে বন্ধ করব কি, হাত-পা আমার আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে এল! কে এই কালো জীব—কী সে? ট্রেনের ভেতরে সে আমার পায়ের কাছে কোত্থেকে এল, কেনই বা চড় খেয়ে ঘ্যাঁং করে লাফিয়ে উঠল, আর লাফিয়েই বা গেল কোথায়? অমন অস্বাভাবিক দুটো সবুজ চোখই বা কেন—আর সে চোখে কোন্ হিংস্র প্রতিহিংসা লুকিয়ে ছিল?

তবে কি এ সব ভৌতিক ব্যাপার?

ব্যস, মনে করতেই আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। এইবার বুঝতে পারলুম, গাড়ির এই কামরাটা নিশ্চয় ভূতুড়ে। তাই জংশন স্টেশনে লোকগুলো সব হুড়মুড়িয়ে এই গাড়ি থেকে নেমে পালিয়েছে, তাই মাড়োয়ারী দুজন এ গাড়িতে উঠতে এসেও অমন উর্ধ্বশ্বাসে উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছে!

আর আমি এমন নিরেট গর্দভ যে এসব দেখেও কিছু বুঝতে পারি নি! এই মারাত্মক ভূতুড়ে কম্পার্টমেন্টে উঠে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগিয়েছি!

www.boiRboi.blogspot.com

কী করব এখন? নেমে পড়ব গাড়ি থেকে? তারপর যেদিকে চোখ যায়, টেনে দৌড় লাগাব?

কিন্তু এই অন্ধকারে চোখ আর কোন্ দিকে যাবে? দিগ্‌বিদিক দূরে থাক, নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না যে! আর পালাবো? চোর-ডাকাতের হাত থেকে পালানো যায়, পুলিসের হাত থেকেও হয়তো যায়, কিন্তু ভূতের পাল্লা থেকে? খপ্ করে ত্রিশ গজ লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি টেনে ধরবে!

হঠাৎ টপ্-টপ্-টপাং!

মাথার ওপর কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ল। তারপরেই বাইরে বিটকেল ছ্যারাং ছ্যারাং আওয়াজ। ঠিক মনে হল, কে যেন একটা লম্বা পাইপ দিয়ে জল ছুঁড়ছে!

শুধু মনে হওয়া নয়—ছ্যারাং করে কোত্থেকে একরাশ বিচ্ছিরি জল আমার নাকে মুখে এসে আছড়ে পড়ল।

—বাপ্‌রে, গেছি গেছি—বলে আমি জানলা বন্ধ করে ফেললুম। সমানে সেই আওয়াজটা চলতে লাগল—মনে হল, সেই অথই অন্ধকারে পেত্নীর বাচ্চা আলকাতরা গোলা নিয়ে হোলি খেলছে।

আমি বসে বসে 'রঘুপতি রাঘব'-টাঘব গাইতে চেষ্টা করলুম। গলা দিয়ে গান বেরুল না, খালি ব‍ঁ-ব‍ঁু করে এমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ বেরুতে লাগল যে আঁতকে উঠে চুপ করে গেলুম।

ভয়ে কাঠ হয়ে কতক্ষণ বসে আছি জানি না, জলের সেই ছ্যার্-ছ্যারানি কখন থেমে গেছে তা-ও টের পাইনি। আচমকা—সেই কালি-ঢালা অন্ধকার আর সাদা কুয়াশার ভেতরে একটা লাল আলো। বিশ্বাস করবিনি প্যালা, শুধুই একটা লাল আলো! ঠিক গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে—জানলার কাচের মধ্য দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলুম। আমার মনে হল, একচোখো যেন একটা দৈত্য হাঁ করে চলে আসছে আমার দিকে!

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলুম, এইবার আমি 'বাপ্‌রে মা-রে' করে একটা আকাশ-ফাটানো চিৎকার ছাড়লুম। আর লাল আলোটা যেন শূন্যের ভেতরে থমকে দাঁড়ালো—তারপরেই ধাঁ করে কোন্ দিকে যেন মিলিয়ে গেল!

আমার আর চোখ মেলে চেয়ে থাকবার সাহস ছিল না। বেশ বুঝতে পারছিলুম, আজ এই ভূতুড়ে রেলগাড়ির কামরাতেই অপঘাতে আমার প্রাণটা যাবে। একবার গলায় হাত দিয়ে পৈতেটা খুঁজে দেখলুম—কিন্তু তাকে তো সেই সাত বছর আগে জামার সঙ্গে ধোপাবাড়িতে চালান করে দিয়েছি, এখন আর কোথায় পাওয়া যাবে!

বেশ বুঝতে পারলুম, আজ আমার বারোটা বেজে গেল। আমাকে নিয়ে এই ভূতুড়ে কামরাটা যে কোন্ নরকে গিয়ে হাজির হয়েছে জানি না, কিন্তু এরপর একটার পর একটা বিভীষিকা আসতে থাকবে, আমার রক্ত একদম জমাট বেঁধে যাবে, তারপরেই সোজা হার্টফেল! বাড়িতে মা-বাবার কাছে আর পৌঁছুতে পারব না—এখন থেকেই সোজা ভূতের দলে ভর্তি হয়ে যাব!

চোখ বুজে মনে মনে 'রাম রাম' জপ করছি, এমন সময়—

বাজখাই গলায় কে বললে, ইউ রোগ্!

আঁত্‌কে লাফিয়ে উঠলুম। অন্ধকার জায়গায় কোত্থেকে ঝলমলে আলো! আর সেই আলোয় ইয়া ঢ্যাঙা এক সাহেব দাঁড়িয়ে। আবার বাজখাই স্বরে বললে, ইউ রোগ্! তুম্ কোন্ হ্যায়?

ওরে বাপরে—সাহেব ভূত! আমার রাম নাম গিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছুল। আবার

একখানা মোক্ষম চিৎকার ছেড়ে আমি গাড়ির মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়লুম! বিশ্ব-সংসার মুছে গেল!

এই পর্যন্ত বলে বলটুদা থামল। আমি আকুল হয়ে বললুম, তারপর?

—তারপর আর কী? ভীষণ যা-তা ব্যাপার।

—মানে?

—মানে আবার কী? কামরাটা খারাপ, জংশন স্টেশনেই সেই জন্যে ট্রেন থেকে কেটে নিয়ে শেডের মধ্যে ঢুকিয়েছিল আমাকে সুদ্ধু। ঘুমের ঘোরে কিছু টের পাইনি আমি। জুৎ পেয়ে একটা কাল কুকুর আমার বিছানায় এসে উঠেছিল, গাড়ি ধোয়ার জল ছর-ছর করে আমার মুখে এসে পড়েছিল, লাল লণ্ঠন হাতে একটা কুলি এদিকে আসছিল, আমার চিৎকারে ভয় পেয়ে ডেকে এনেছিল ওদের ইন্‌স্‌পেক্টারকে। আর তাকে দেখেই আমার দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল।

আমি বললুম, অ্যাঁ!

বলটুদা বললে, হাঁ-হাঁ। আমি তোদের টেনিদার মতো বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি না, এ হল রিয়্যাল, ভূতের ব্যাপার। আচ্ছা, এবারে বাড়ি যেতে পারিস।

এই বলে বলটুদা উঠে পড়ল। হনহন করে নিজেই হেঁটে চলে গেল আলেক-জান্ডারের ভঙ্গিতে।

একটি খুনের ঘটনা

গোয়েন্দা বা অপরাধ কাহিনীর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ঘটনার আশপাশে যারা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই সন্দেহের আওতার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু চারদিকের সাক্ষী প্রমাণে নিশ্চিতভাবে যাকে অপরাধী বলে মনে হয়, তাকে যদি নিরপরাধ ধরে নিয়ে, তার অনুকূলে তদন্ত শুরু করা হয়, তা হলে কী রকমটা দাঁড়ায়?

সোভিয়েত দেশে তদন্তের প্রণালী আজকাল এই। ওখানকার একজন ইন্স-পেক্টরের জবানবন্দিতে একটা ঘটনা শোনাই। গল্পটা—না এটা গল্প নয়, সম্পূর্ণ সত্য কাহিনী—একটু সংক্ষেপ করে তোমাদের বলছি।

মেরু অঞ্চলে গবেষণার জন্যে গিয়েছিলেন দুজন অধ্যাপক। এঁদের একজন অল্প বয়েসী, আর একজন বুড়ো মানুষ। দুজনেই নামজাদা বিজ্ঞানী, দুরন্ত

www.boiRboi.blogspot.com

পণ্ডিত, কিন্তু সম্পর্কটা একেবারে সাপে নেউলে।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে যা হয়। এঁর মত উনি মানেন না। এঁর থিয়োরীর উনি প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মতভেদ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে ইনি ওঁর নাম শুনলে একেবারে জ্বলে যেতেন। অথচ, অবস্থাচক্রে দুজনকে একই সঙ্গে পাঠানো হল গবেষণা করতে।

সেই ধু-ধু তুষারের দেশে দুই বৈজ্ঞানিক এক সঙ্গে তাঁবু ফেলে থাকেন, গবেষণা করেন। আর একজন সহকারী আছেন এঁদের সাহায্য করেন। তিনি দেখেন, রাত-দিন দুই পণ্ডিতে সমানে তর্কাতর্কি খেয়োখেয়ি চলছে।

বুড়ো বৈজ্ঞানিক—ধরা যাক প্রোফেসর এক্‌স্‌, একটা চিঠিতে লিখছেন: "আমার সঙ্গে এই বানরটাকে কেন যে পাঠানো হল। ওকে আমি এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারি না—দেখলেই আমার পিত্তিসুদ্ধ জ্বালা করে।"

আর ছোকরা বৈজ্ঞানিক—প্রোফেসর ওয়াই তাঁর ডায়েরীতে লেখেন: "বুড়ো ক্রমশই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সব সময়ে ওর একগুঁয়েমি। মধ্যে মধ্যে আগুন ধরে যায় আমার মাথায়। একদিন নিশ্চয় আমি ওকে খুন করব।"

অবস্থা যখন এই রকম, তখন একদিন খবর এল, প্রোফেসার এক্‌স্‌ খুন হয়েছেন।

ব্যাপারটা কিরকম?

দুই বৈজ্ঞানিক এবং তাঁদের সহকারী একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন হাঁস শিকারে। একটা জলার এক ধারে দাঁড়িয়েছিলেন এক্‌স্‌—কিছুদূরে ওয়াই হাঁস খুঁজছিলেন। কী একটা জিনিস আনতে সহকারী চলে গিয়েছিলেন তাঁবুতে।

সহকারী যখন ফিরে আসেন, তখন একটা বন্দুকের আওয়াজ তাঁর কানে যায়। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, শিকারে বন্দুকের আওয়াজ হবেই।

কিন্তু ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

প্রোফেসর এক্‌স্‌ পড়ে আছেন মাটিতে। হাতের বন্দুকটাও পড়ে রয়েছে তাঁর পাশে। তাঁর বাঁ চোখে শিকারের ছুরি—অর্থাৎ হান্টিং নাইফটা একেবারে বাঁট পর্যন্ত ঢোকানো। চোখের ভেতর দিয়ে সে ছুরির ফলা একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে গেছে। মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ।

আর তাঁর পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর ওয়াই।

"কী করে হল?"

শুকনো মুখে প্রোফেসর ওয়াই বললেন, "কিছুই জানি না। আমি ওদিকে হাঁস তাক করছিলুম। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে এদিকে ফিরে দেখি, প্রোফেসর এক্‌স্‌ মাটিতে পড়ে আছেন। এসে দেখি, এই কাণ্ড!"

সেই নির্জন তুষারের দেশে এই দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর এ তো হত্যাকাণ্ড! দুজনের ভেতরে যে বিশ্রী সম্পর্ক ছিল, তাতে এমন কাজ আর কে করতে পারে প্রোফেসর ওয়াই ছাড়া?

অতএব একদিন প্রোফেসর ওয়াই এসে আমাদের অফিসে উপস্থিত হলেন।

বললুম, "প্রোফেসর, আপনি যা জানেন তা বলুন।"

নতুন কথা তিনি কিছুই বললেন না। "আমি বন্দুকের আওয়াজ শুনে ফিরে দেখি, উনি পড়ে আছেন। চোখের ভেতরে ছোরা বেঁধানো। আর আমি কিছুই জানি না।"

প্রোফেসার ওয়াই শীর্ণ মুখে হাসলেন। বললেন, "জানি, কেউ বিশ্বাস করবে

না। আমি তৈরি হয়েই এসেছি সেজন্যে। পড়ুন আমার ডায়েরী।"

ডায়েরীটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। পাতায় পাতায় সেই এক কথা। "অসহ্য—বুড়োটা অসহ্য।" "কী করে এই পাগলের হাত থেকে নিস্তার পাই?" "আজ খাবার টেবিলে—আঃ, লোকটাকে খুন করতে পারলে আমার শান্তি হয়।" পড়েই মনে হবে, কোনো সন্দেহ নেই, বিশুদ্ধ, পরিকল্পিত হত্যাকান্ড!

আচ্ছা মানুষ এই প্রোফেসর। নিজের মৃত্যুবান যেন তুলে দিচ্ছেন আমার হাতে।

আমি চুপ করে রইলুম। প্রোফেসর বললেন, "আমি বুঝতে পারছি আমার কী হবে। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আপনি অনুগ্রহ করে কেবল এই চিঠিটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দেবেন।"

আমি বললুম, "চিঠির দরকার নেই। আপনি বাড়ি যান।"

"তার মানে? ছেড়ে দিচ্ছেন আমাকে?"—প্রোফেসর যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

বললুম, "বিনা প্রমাণে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি না। আপাতত আপনার নামে আমাদের কোনো ওয়ারেন্ট নেই। আপনি যান।"

আসলে আমার খটকা ধরিয়েছিল পোষ্টমর্টেম রিপোর্টের একটি কথা।

"অস্বাভাবিক—অমানুষিক শক্তিতে ছুরিটা চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

অস্বাভাবিক—অমানুষিক শক্তি। প্রোফেসর ওয়াই অবশ্যই খুব সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ, কিন্তু—অমানুষিক শক্তি। কথাটা ক্রমাগত পাক খেতে লাগল ঘরের ভেতরে।

আমি ব্যালিষ্টিক এক্‌স্‌পার্ট—অর্থাৎ গোলাগুলি বিশারদদের ডাকলুম।

"আচ্ছা, মেরু অঞ্চলের সাংসেঁতে আবহাওয়ায় বন্দুকের টোটা ফেঁপে যায় তো?"

তাঁরা বললেন, "স্বাভাবিক।"

"সেই টোটা বন্দুকে ভরতে তখন তো অসুবিধে হয়?"

"তা হতেই পারে।"

"আচ্ছা বলুন—এ অবস্থায় শিকারী কী করবেন?"

"একটা কিছু দিয়ে টোটাটাকে ঠেলে ভেতরে দেবার চেষ্টা করবেন।"

"হান্টিং নাইফের হাতল ব্যবহার করতে পারে লোকে?"

"কেন পারবে না?"—একজন বললেন, "সেটা কোমরেই থাকে, আর তার কথাই মনে পড়বে সকলের আগে।"

"তা হলে"—আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ধরুন যদি হান্টিং নাইফটা এমন হয়—তার হাতলটা যেমন তেমন করে তৈরি, তার পেছনে এক টুকরো লোহার ডগা বেরিয়ে রয়েছে? আর টোটাটাকে যদি জোরে ঠেলে দেওয়া যায়, তা হলে সেটা ট্রিগারের পিনের মতো কাজ করতে পারে?"

তাঁরা বললেন, "নিশ্চয়।"

"মনে করুন"—আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, "সে ক্ষেত্রে একজন ছুরির বাঁট দিয়ে টোটাটাকে জোরে ঠেলে দিলে। লোহার ডগাটা ট্রিগার পিন হয়ে যেই কার্ট্রিজে ঘা মারল, অমনি গুলি বেরিয়ে গেল। তখন বন্দুকটা তো গুলি ছোটবার বেগে পেছনে এসে ধাক্কা মারবে?"

"হ্যাঁ, তাই নিয়ম। আগ্নেয়াস্ত্র মাত্রেই ব্যাকপুশ দেবে।"

"খুব জোরে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"স্বাভাবিক।"

"তা হলে ছুরির ফলাটা তো তখন উলটো দিকে রয়েছে। বন্দুকটা যেই হাতে ধাক্কা দিলে, অমনি ছুরির ফলাটা তীরবেগে গিয়ে চোখে বিঁধতে পারে?"

"নিশ্চয় পারে। যদি অবশ্য সেটা চোখ বরাবর থাকে।"

"অস্বাভাবিক—অমানুষিক জোরে বিঁধে যেতে পারে?"

"বন্দুকটা চোখের কাছে থাকলে তাই সম্ভব।"

"ধন্যবাদ, আর আমার কিছু জানবার নেই।"

তা হলে এই আমার কেস। হত্যা নয়, বিশুদ্ধ অ্যাকসিডেন্ট। ওয়াই বলেছেন, "গুলির আওয়াজ শোনবার আগে একবার যখন তিনি এদিকে তাকিয়েছিলেন, তিনি দেখেছিলেন অধ্যাপক এক্‌স্‌ যেন তাঁর বন্দুকটা লোড্‌ করবার চেষ্টা করছেন।" অতএব দুই আর দুয়ে চার!

পরম উল্লাসে খবরটা জানালুম আমার ওপরওলাকে।

তিনি একটু হাসলেন। বললেন, "তোমার থিয়োরী বেশ ভালো। কিন্তু একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গেল যে ওর ভেতরে।"

আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

"তোমার থিয়োরী যদি সত্যি হয়, তা হলে প্রোফেসর এক্‌স্‌ ডান হাতে ছুরি আর বাঁ হাতে বন্দুক ধরবেন। আর সে ক্ষেত্রে বন্দুকের ব্যাক পুশে ছোরাটা ডান চোখেই বিঁধে যাবে। কিন্তু ওটা বিঁধেছে বাঁ চোখে, সেটা খেয়াল রেখো।"

সব মাটি। গেল আমার সাধের থিয়োরী।

আমি বিভ্রান্তের মতো বেরোলুম। কোনো থই পেলুম না। তারপর হঠাৎ মনে হল, প্রোফেসর এক্‌স্‌ তো ন্যাটাও হতে পারেন! অর্থাৎ ডান হাতের বদলে বাঁ হাত ব্যবহারের অভ্যাস তো থাকতে পারে তাঁর?

আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ছুটলুম তাঁর বাড়িতে। গেলুম তাঁর সহকর্মীদের কাছে।

অনুমান নির্ভুল। প্রোফেসর এক্‌স্‌ ন্যাটাই ছিলেন! বাঁ হাতেই তিনি ব্যবহার করতেন।

কিন্তু জট কেটেও কাটে না।

অভিযানে প্রোফেসর এক্‌সের যে জিনিসপত্রের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে—অর্থাৎ যা যা তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটার বিবরণ পাচ্ছি, কিন্তু ছুরিটার তো কোনো সন্ধান নেই। কটি পেন্‌সিল নিয়েছেন তারও খবর আছে—ছুরিটার উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না!

তা হলে কোথা থেকে এটা এল?

এমন হতে পারে যে যাত্রার শেষ মুহূর্তে ওটা কিনে থাকবেন। কিন্তু কোথায়? শহরের কোনো দোকানে আমি ও ধরনের হান্টিং নাইফের কোনো সন্ধান পেলুম না।

শেষে কি আমার ঘাটে এসে নৌকো ডুববে? আমি কি তখন জোর করে বলতে পারব, ও'কে খুন করার জন্যে ওটাকে মার্ডার উইপন হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাননি প্রোফেসর ওয়াই?

সুতরাং আমি বেরিয়ে পড়লুম শেষ চেষ্টায়।

যে পথ দিয়ে ও'রা এগিয়ে গেছেন, তার প্রতিটি শহরে আমি ওই রকম একটি ছুরির দোকান খুঁজতে লাগলুম। হাজার হাজার হান্টিং নাইফ আমি দেখলুম, দেখিয়ে দেখিয়ে হয়রান হয়ে গেল দোকানদারেরা—কিন্তু ঠিক ওই জাতের ছুরি কোথাও পেলুম না।

এবার এসেছি সর্বশেষ শহরে। এখান থেকেই ও'রা মেরু অঞ্চলে রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু না—এখানেও ও ছুরির সন্ধান মিলল না।

হতাশ হয়ে যেদিন ফিরে আসব, সেদিন চলছিলুম, শহরের একটা পুরোনো অঞ্চল দিয়ে। শ্রীহীন ছোট ছোট দোকান দু-ধারে, কেনা-বেচাও খুব কম। তার মধ্যে হঠাৎ ওই তো! ওই ছোট্ট দোকানটিতে ঠিক ওই ধরনের ছুরি ঝুলছে দু-তিনটে। ওই জিনিস।

এক বুড়ো তার মালিক! সে-ই ওগুলো তৈরি করে।

হাতে নিয়ে দেখলুম, যেমন তেমন কাঠের বাঁটে তৈরী সব সাদামাটা ছুরি। আর প্রায় প্রত্যেকটার পেছনেই একটু করে লোহার মুখ বেরিয়ে রয়েছে।

বুড়ো বললে, "শিকারের সীজনে ওগুলো অনেক বিক্রী করি আমি।"

"আচ্ছা—অমুক মাসে, বুড়ো এক প্রোফেসর কি এসেছিলেন দোকানে? তিনি কি কিনেছিলেন একটা? এই রকম চেহারা, এই রকম গোঁফ—"

"দাঁড়ান—দাঁড়ান। প্রোফেসর একটু খিটখিটে, ভুরু কুঁচকে রয়েছেন, এই তো? দাঁড়ান—খাতাটা খুলি।"

খাতায় পাওয়া গেল নাম। প্রোফেসর এক্স্।

এই হল কেস। আদালতের রায় বললে, এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।

প্রোফেসর ওয়াইয়ের মৃত্যুর আয়োজন তৈরিই ছিল। কেউ তাঁর সাক্ষী ছিল না, তাঁর কথা বিশ্বাস করবার মতো কেউ ছিলেন না, বরং বাড়তির মধ্যে ছিল এক্সের চিঠিগুলো আর ওয়াইয়ের নিজের সেই মারাত্মক ডায়েরী।

কিন্তু নিরপরাধের মুক্তির সূত্রও থাকে।

সে সূত্রও ছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে : "অস্বাভাবিক, অমানুষিক শক্তিতে ছোরাটা চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ভূত মানে ভূত

'আয়, একটা ভীষণ ভূতের গল্প বলি।'

'আমি ভূত মানি না।'

'তবে যা—তোর শুনে কাজ নেই।'

'না—না বল্। শুনি, কত বাজে গপ্পো বানাতে পারিস তুই।'

'আমি গল্প বানাই না। সদা সত্য কথা বলে থাকি। অবিশ্বাস হলে উঠে যা না,

কে তোকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে বলেছে?'

'না—মানে সত্যি কথা বললে আর অবিশ্বাস করব কেন? তুই বল।'

'অ—ইদিকে ভূত মানি না, ওদিকে ভূতের গপ্প শুনলেই জাঁকিয়ে বসা? আছিস বেশ।'

'মানে শুনতে বেশ মজা লাগে কি না, তাই—'

'মজা লাগে? এমন সত্যি ঘটনা বলব না যে শুনে তোর গায়ে কাঁটা দেবে।'

'নাকি? তবে বলে যা ভাই।'

'শোন—আমাদের গাঁয়ে একটা বেজায় পাজী বুড়ো থাকত। লোকে বলত, উপোস মামা। মানে মুখ দেখলে উপোস করতে হয়—এ্যায়সা কিপ্‌টে। মস্ত একটা পোড়োমতন বাড়িতে একা থাকত—চারদিকে তার আম কাঁঠালের ঘন বাগান। এমন জায়গা না যে—দিনের বেলা গেলেও গা ছমছম করত সেখানে। বুড়োর কেউ ছিল না—বুড়ি মরে গিয়েছিল—মেয়েরা শ্বশুর বাড়ি চলে গিয়েছিল, তিন ছেলে চাকরি নিয়ে পালিয়েছিল এখানে ওখানে। ছেলেমেয়েরা কেউ বুড়োর কাছে আসত না—কার দায় পড়েছে কচু ঘন্ট আর লাল চালের ভাত খেতে?

সে যা হোক—উপোস মামা তো প্রায় উপোস করেই মারা গেল একদিন। ছেলেরা এল, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করে—টাকা পয়সা ভাগ করে নিয়ে—জমি-টমি বিক্রি করে দিয়ে—চলে গেল যার যেদিকে খুশি। পড়ে রইল জংলা বাগানের ভেতর সেই পোড়ো বাড়িটা।

আর লোকে বলতে লাগল, ওই বাড়িতে উপোস মামা ভূত হয়ে আছে। জষ্ঠিমাসের হাওয়ায় পাকা আম পড়লেও কেউ তা কুড়োতে যেত না ওখানে, শেয়ালে-টেয়ালে খেত।'

'বাঃ, খাসা ভূতের বাড়ি বানালি দেখছি।'

'বানালুম? উঠে যা—তোর গল্প শুনে কাজ নেই।'

'না—না, চটিস্ নি। মানে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে কি না। বলে যা ভাই—প্লীজ।'

'সেবার দেশে গিয়ে ঠিক করলুম—কাল অমাবস্যার রাত আছে—ঠিক বারোটার সময় ও বাড়িতে ভূত দেখতে যাব। সবাই বারণ করলে—উপোস মামা ধরে ঘাড় মটকে দেবে। বললুম—বেঁচে থেকে তো রোগা পট্‌কা ছিল—আমি জিম্‌নাস্টিক করি—জোরে পারবে কেন? দেখিই না—ভূত হয়ে উপোস মামার কি রকম তাগদ হয়েছে গায়ে।'

'গেলি?'

'কেন যাব না? ঠিক বারোটায় পৌঁছে গেলুম। একে অমাবস্যা, তায় মেঘ করেছে আবার। বাগানটায় ঢুকতে—সত্যি বলতে কি ভাই—গা ছমছম করতে লাগল। যেই খানিক এগিয়েছি, ঝড়্ ঝড়্—ঝড়াৎ!'

'অ্যাঁ—কী?'

'টর্চের আলোয় দেখি, হাওয়ায় একটা শুকনো ডাল খসে পড়েছে।'

'অ।'

'মন খারাপ হল বুঝি? শোন না—আসল রোমাঞ্চই তো বাকী রয়েছে।'

'বল ভাই। একটু কাছে ঘেঁষে বসছি, কিছু মনে করিস নি।'

'না—না, মনে করব কেন? তুই তো আর ভূতে বিশ্বাস করিস নে। তারপর শোন্—গুটি গুটি তো গিয়ে উঠেছি সেই পোড়ো বাড়িতে। বাপস্—কী অন্ধকার, আর

www.boiRboi.blogspot.com

চারদিকে চামচিকে আর কী সবের কী বিচ্ছিরি গন্ধ!'

'তারপরে?'

'যেই বারান্দা ধরে একটু এগিয়েছি না—ঝট্‌পট্‌—ঝট্‌পট্‌—'

'অ্যাঁ, কী ঝট্‌পট্‌?'

'কিছু না। বাদুড়।'

'অ!'

'দাঁড়া না, আরো আছে। বাদুড় তো পালালো—কিন্তু একটা দরজা-ভাঙা খালি ঘরে যেই ঢুকেছি না—'

'কী?'

'দুটো চোখ। জ্বলজ্বল করছে।'

'হ্যাঁ। হিংস্রভাবে জ্বলছে। যেন প্রেতলোকের বিভীষিকা। কাছে আসছে—এগিয়ে আসছে—আরো আসছে—আঃ, জাপটে ধরছিস কেন? টর্চের আলোয় দেখি—'

'ক্‌—কী?'

'একটা হুলো বেড়াল। হাঁ, স্রেফ হুলো বেড়াল। মুখে নেংটি ইঁদুর নিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।'

'ধেৎ!'

'দমিস্‌নি—দমিস্‌নি—আরো আছে।'

'তারপর?'

'ঘরের বারান্দায় শুনি কে যেন আসে। পা টিপে টিপে—সাবধানে। বুক চমকে উঠল। কে—কে আসে অমন করে? কার পদধ্বনি? এত রাতে—এই অন্ধকারে—এই পোড়োবাড়িতে—কে আসে এত সাবধানে? সে কি ভূত? সে কি হত্যাকারী? কে?'

'কে?'

'একটা শেয়াল আসছিল। যেই বলেছি ভাগ্‌—দৌড়ে হাওয়া।'

'যাঃ!'

'ঘাবড়াসনি। আরো আছে। তারপর—'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি, অন্ধকার।'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি, অন্ধকার।'

'তারপর।'

'ঘুরঘুট্টি—'

'আঃ, জ্বালালি! তোর ঘুরঘুট্টির নিকুচি করেছে। কী হল তাই বল্‌ না।'

'কী আর হবে? হয়রান হয়ে বাড়ি চলে এলুম।'

'আর ভূত?'

'ভূতই তো। ভূত মানে ভূত। মানে অতীত। মানে উপোস মামা অতীত হয়ে গেছেন—তিনি আর বর্তমান নেই। তাই তাঁর বাড়িতে আর তাঁকে দেখতে পেলুম না।'

'এই তোর ভূতের গপ্পো?'

'এই তো আসল ভূতের গল্প। ভূত মানে ভূত—মানে অতীত। মানে উপোস মামা আর বর্তমান নেই।'

ইস্টুপিড!'

'যা যা—ভাগ এখান থেকে।'

টুটুনের প্রতিজ্ঞা

এখন হয়েছে কি ক্লাসে মাস্টারমহাশয় যেই ঠাট্টা করে বলেছেন, 'বেগুন মানে কোনো গুণ নেই, খেলে চুলকনা হয়,—অমনি কথাটা বড়ো বড়ো কান পেতে শুনেছে টুটুন। আর যেই শুনেছে, অমনি কান থেকে কথাটা গিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকেছে। বেগুনের কোনো গুণ নেই—বেগুন খাওয়া কখনো উচিত নয়।

ড্রয়িংয়ের খাতায় অনেক কালি-টালি ঢেলে অনেক কষ্ট করে একটা বেগুন এঁকেছিল টুটুন। একটুখানি লাউয়ের মতো দেখতে হয়েছিল বটে তবু ওটাকে বেগুন বলেই মনে হওয়া উচিত—কারণ বেগুনে রঙের লাউ কি কোনো দিন কেউ দেখেছে? আজ স্কুল থেকে ফিরে ড্রয়িংয়ের খাতাটা খুলেই যেন টুটুনের সারা গায়ের মধ্যে বিড়বিড় করতে লাগল। তখুনি টুটুন ছবিটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। আর সেদিন খেতে বসেই একটা ভীষণ গণ্ডগোল বেধে গেল।

বাড়িতে একটা মস্ত ইলিশ মাছ এসেছে—আর টুটুন তো ইলিশ মাছ খেতে ভীষণ ভালোবাসে। অবিশ্যি গাদার মাছে খুব কাঁটা, তা সে খেতে পারে না। মা তাকে পেটির মাছই দেন।

রবিবারে মা-ই রান্না করেন, ঠাকুর শুধু সেদিন জোগান দেয়। আজও মা ইলিশ মাছের ঝোলটা নিজের হাতে যত্ন করে রেঁধেছেন আর একটা বড়ো পেটি দিয়েছেন টুটুনকে খেতে। কিন্তু সেই পেটির সঙ্গে কী সর্বনাশ—দু-টুকরো বেগুন!

টুটুন অমনি লাফিয়ে উঠে বললে, আমি বেগুন খাব না।

মা বললেন, কচি বেগুন—খা। ভালো লাগবে।

টুটুন মাথা নেড়ে বললে, না—খাব না। বেগুন খেলে চুলকোনা হয়।

মা হেসে বললে, তোকে ডাক্তারি করতে হবে না, তুই খা।

—না।

মা তখনো হাসছিলেন, বললেন, তোকে তো আর একসের বেগুন পুড়িয়ে খেতে বলছে না কেউ। খেয়ে নে টুটুন—গোলমাল করিস নি।

—না-না।

মা-র হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

—খাবি না?

—না।

মা এমনিতে ছোটখাটো আর হাসি-হাসি হলে কী হয়, কলেজে প্রফেসারী করেন কিনা—আসলে মেজাজটা খুব কড়া। তখুনি সেই মস্ত মাছের পেটিসুদ্ধ বাটিটাকে সরিয়ে নিলেন। বললেন, তবে খেয়ো না। কিন্তু বেগুন না খেলে মাছ পাবে না, এ-ও তোমাকে বলে দিচ্ছি।

টুটুনের দুঃখে কান্না আসছিল, কিন্তু তখন মনে পড়ল, তার এগারো বছর বয়েস হল, সে পুরুষ মানুষ, এখন তার জেদ হওয়া উচিত। বেশ, মাছ আমি খাবই

www.boiRboi.blogspot.com

না। চোখের জল চেপে ডাল-তরকারী-ভাজা দিয়ে খেয়েই উঠে গেল সে।

তার পর সারাদিন মন খারাপ—ভীষণ মন খারাপ! মা-ও এমন যে তাকে আর একবার সাধলেন না পর্যন্ত। ঠিক আছে।—বেগুন সে আর খাবেই না সারাজীবন।

সেদিন বিকেলে টুটুন তাই ফরসা জামা পরল না, ভালো করে চুল আঁচড়াল না, যে দুধ রুটি তার বরাদ্দ তার অর্ধেকটাই বাড়ির লোভী হুলো বেড়াল 'কার্ত্তিক'কে খাইয়ে দিলে। (কার্ত্তিক মাসে জন্মেছিল কিনা—তাই ওই নামটা) তার পরেই সুড়ুৎ করে চলে গেল তার বন্ধু অতনুদের বাড়িতে।

অতনুর মা ওকে দেখে ভীষণ খুশী হলেন। বললেন, আয় আয়, তোর কথা ভাবছিলুম। তুই যখন বাড়ি যাবি, তখন একটা জিনিস সঙ্গে দেব তোর। তোর মাকে দিস।

এখন, অতনুদের দেশ হল জয়নগরে। সেখানে খুব ভালো মোয়া তৈরি হয়—আর প্রায়ই এক-আধ হাঁড়ি দেশ থেকে আনা মোয়া টুটনদের বাড়ি যায়। টুটুন তখন অতনুর সঙ্গে ক্যারাম খেলছিল। শুনেই তার টিপ ফসকে স্ট্রাইকারটা গর্তে গিয়ে পড়ল। টুটুন বললে, কী দেবেন মাসিমা, মোয়া বুঝি?

অতনুর মা হেসে বললেন, না, মোয়া নয়। আজ দেশ থেকে খুব বড়ো বড়ো বেগুন এসেছে—তাই গোটা চারেক দিয়ে দেব সঙ্গে।

বেগুন!

শুনেই টুটুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এখানেও সেই সর্বনেশে বেগুন! অতনুর মা পাটিশাপটা পিঠে ভাজছিলেন কিন্তু টুটুনের মনে হল, পাটিশাপটার চাইতে খারাপ জিনিস আর কিছু নেই। তক্ষুনি টুটুন উঠে পড়ল।

অতনু খেলায় জিতছিল কিনা, তাই টুটুনকে টেনে ধরল।

—এই কোথায় যাচ্ছিস?

—একটা ভুল হয়ে গেছে ভাই, এক্ষুনি আসছি—

বলেই দৌড়! এমন দৌড় যে, রাস্তার একটা রিক্‌শাওয়ালা তাকে ভীষণ বকল। 'এই খোকাবাবু, অ্যাইসা দৌড়ো মৎ—রাস্তামে কেতনা গাড়ি হ্যায়—'

কিন্তু টুটুন কোনো কথা শুনল না। ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে শেষে হৃষীকেশ পার্ক পেরিয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে ছোটো পিসিমার বাড়িতে।

অবিশ্যি ছোটো পিসিমার বাড়িতে টুটুনের যেতে বারণ নেই। মোটে একটা বড়ো রাস্তা পেরুতে হয় কিনা। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেখানে থেকে ফিরে আসা চলে।

পিসেমশাই সেদিন কোথায় যেন মাছ ধরতে গেছেন—ফিরতে রাত হবে। তাই ছোটো পিসিমা একা একা তাঁর দেড় বছরের ছেলে—মানে টুটুনের পিসতুতো ভাই কিংকংকে নিয়ে বসে ছিলেন আর উল বুনছিলেন। অবিশ্যি কিংকং নাম বলে সে আসলে দেখতে খারাপ নয়—তার ভালো নাম দীপঙ্কর—বেশ মিষ্টি আর গোলগাল চেহারা।

কিংকং একটা কাঠের বাঘ নিয়ে তার মুণ্ডুটা চিবুচ্ছিল, আর তার মুখ থেকে লাল পড়ছিল। একটু আগেই কেঁদেছিল নিশ্চয়, তাই কাজল-টাজল গালে গালে-টালে লেগে গিয়েছিল। ছোটো পিসিমা একটা বেতের মোড়ায় চটি পায়ে দিয়ে বসে উল বুনছিলেন—কিংকং মধ্যে মধ্যে চটি ধরে টানাটানি করলে 'আঃ' বলে পা সরিয়ে নিচ্ছিলেন।

ছোটো পিসিমা বললেন, আয় টুটুন—আয়। বৌদি ভালো আছে—ছোটদা ভালো

আছে? বৌদি টুটুনের মা আর ছোট্‌দা তার বাবা।

টুটুন জানালো, সবাই ভালো আছে, এমন-কি কার্ত্তিক পর্যন্ত ভীষণ ভালো আছে। তার পর টুটুন অনেকক্ষণ পর্যন্ত খেলা দিল কিংকংকে—হালুম হালুম করে বাঘের ডাক ডেকে তাকে ভয় দেখাতে চাইল। কিন্তু কিংকং কি আর ওতে ভয় পায়? সাদা সাদা ছোটো ছোটো দাঁতে তার কী খিলখিল হাসি!

তার পরে যখন ছোটো পিসিমার ঝি মণিমালা এসে কিংকংকে জোর করে দুধ খাওয়াতে নিয়ে গেল, তখন ছোটো পিসিমা উল রেখে উঠলেন। বললেন, খিদে পেয়েছে টুটুন?

খিদে নিশ্চয় পেয়েছে। এমনিই তো দুপুরে ভালো করে সে খায়নি, বিকেলে রুটি দুধ তো সবটাই গেছে 'কার্তিকে'র পেটে। তবু টুটুন বললে, না, খিদে পায়নি।

ছোট পিসিমা বললেন, আচ্ছা—বোস। আমি আসছি।

তিনি রান্নাঘরে উঠে গেলেন, স্টোভ জ্বাললেন, কী যেন ভাজতে লাগলেন। টুটুনের খিদেটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, একবার ইচ্ছে হল তিনি কী ভাজছেন দেখে আসে। কিন্তু টুটুন জানে, পুরুষ মানুষের রান্নাঘরে যেতে নেই। টুটুন বসে বসে পিসেমশায়ের একটা ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে তার রঙিন ছবি দেখল। একটা সাদা-কালো বেড়াল যাচ্ছিল প্রাচীর দিয়ে--তাকে 'চুক-চুক-আ-আ' করে ডাকল, সে একবার 'ম্যা-আও' বলে সাড়া দিয়ে কোথায় যেন লাফিয়ে চলে গেল। আর টুটুনের খিদে বাড়তে লাগল—দারুণ বাড়তে লাগল, মনে হল, কতদিন যেন তার খাওয়া হয়নি।

তখন ছোটো পিসিমা একটা প্লেটে কী যেন গরম ভাজা নিয়ে ঢুকলেন। তার গন্ধেই টুটুনের মন দুলে উঠল। পিসিমা হেসে বললেন, ভালো বেগুন এসেছে, কটা বেগুনি ভাজলাম তোর জন্যে!

এখানেও বেগুনি! টুটুন গুম হয়ে রইল।

তার পরে কী হল? টুটুন এক দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে? আরে না-না! খিদের মুখে কি আর অমন প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে কেউ?

আর তা ছাড়া কে না জানে—গরম বেগুনি খেতে ভালো লাগে, ভীষণ ভালো লাগে।

www.boiRboi.blogspot.com

দিবা-দ্বিপ্রহরে

ভূতের গল্প শুনবি? আচ্ছা, বসে পড় এখানে। সব রকম গল্প মজুত রয়েছে আমার কাছে। যা চাস।

শোন তা হলে । সে-বার আমার বড় মামা—

কী বললি? মামার গল্প চলবে না? নিজের চোখে দেখা ভূতের গল্প শোনাতে হবে? আচ্ছা, তাই সই। নিজের চোখেই যে কত ভূত দেখেছি সে-সব বলতে গেলে আঠারো পর্বের ভুতুড়ে মহাভারত হয়ে যায়।

আচ্ছা, চুপচাপ বোস সবাই। বেশ জুত করে খানিকটা নস্যি নিয়ে নিই আগে। রেডি? অল রাইট। মানে ঘটনাটা ঘটেছিল বিহারে। মোকামা জংশন জানিস্ তো? তারই কাছাকাছি এক জয়গায়। হুঁ—হুঁ—রাতের বেলায় নয়—একদম দিনে-দুপুরে।

দিনে-দুপুরে শুনেই চমকে গেলি? আরো চম্‌কাবি এর পরে। কান পেতে শুনে যা।

যাদের বেশি ভূতের ভয় আছে তারা এই বেলা বেরিয়ে যেতে পারিস্। নইলে পরে মুশকিলে পড়বি।

আঁ—আরো ঘনিয়ে বসলি সবাই? বেশ, আমার কি! কেউ যদি হার্টফেল করিস্, আমার কোনো দোষ নেই। কী বলছিস্? তোদের হার্ট খুব শক্ত? আচ্ছা—দেখা যাক।

তা হলে আসল গল্পে আসা যাক। মোকামা জংশন থেকে বাসে করে মাইল পনেরো গিয়ে, সেখান থেকে মাইল চারেক গেঁয়ো রাস্তা দিয়ে হাঁটলে একটা মস্ত পোলট্রি ফার্ম পাওয়া যায়। পোলট্রি ফার্ম মানে জানিস্ তো? সেখানে হাঁস-মুরগী এইসব পোষে—তাদের ডিম-টিম বিক্রী করে। যাই হোক, আমি সেই পোলট্রি ফার্মে যাচ্ছিলুম। এক পিসেমশাই তার মালিক—অনেক দিন ধরেই সেখানে ব্যবসা করছেন।

বাস থেকে নেমে চার মাইল পথ পাড়ি দিচ্ছি—বেশ লাগছে। শীতের দুপুর—রোদটাও তেমন গায়ে বিঁধছে না। পথ একেবারে নির্জন। মাঠে মাঠে ছোলা কড়াই-শুঁটি ফলেছে, সর্ষে ফুলে রং ধরেছে। পথের দুধারে হাওয়ায় হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে।

বেশ গলা চড়িয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছি—হঠাৎ—

হঠাৎ দেখি মাঠের ভেতর দিয়ে চারজন লোক বিকট চীৎকার করতে করতে আসছে। তাদের কাঁধে এক খাটিয়া, তাতে মড়া। দেখেই আমি ভয় পেয়ে একেবারে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়লুম।

কী বললি? মড়া নিয়ে যাচ্ছে দেখেই ভয় পেলুম—তা-ও দুপুরবেলা? আরে না, অত কাপুরুষ আমি নই। যে লোকগুলো মড়া নিয়ে আসছিল, সারা গা তাদের রক্তমাখা। আর খাটিয়ায় যে মড়াটা রয়েছে, সেও রক্তে নাওয়া। মানে, খুন করে মড়া পাচার করে দিচ্ছে কোথাও।

ভেবে দ্যাখ্—কী সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা!

আমি তো ঝোপের আড়ালে বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলে কে-ই বা ঠাণ্ডা থাকতে পারে, বল? হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চাইছে পেটের মধ্যে।

ভাবছি, দেখতে পেলে বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকেও সাবড়ে দেবে। প্রাণের দায়ে আমি দুর্গানাম জপতে শুরু করেছি তখন।

কী বলছিস্? এর মধ্যে ভূত কোথায়? দাঁড়া—দাঁড়া—আসছে। এক্ষুনি আসছে।

লোকগুলো মড়া নিয়ে আসতে আসতে একটা গাছতলায় নামাল। তারপর বোধ হয় বিড়ি-টিড়ি ধরাতে যাচ্ছে, হঠাৎ—হঠাৎ সেই রক্তমাখা মড়াটা একটা বিকট চীৎকার ছাড়ল। সে কী চীৎকার!

ঝোপের ভেতর একটা ভুঁড়ো শেয়াল আমার কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল, বিকট চীৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে দিল ভোঁ দৌড়। আর আমি? দাঁত-কপাটি লাগতে লাগতে দেখলুম, মড়াটা খাটিয়া ছেড়ে তড়াক্ করে উঠে বসল, তারপরে ঝাঁ করে এক লাফে সামনের একটা পিপুলগাছে তরতর করে উঠে গেল।

খুনী লোকগুলোর বুকের পাটা আছে বলতে হবে। অমনি তারা হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল, মুর্দা ভাগা, মুর্দা ভাগা! মানে মড়া পালালো, মড়া পালালো!

কেমন লাগছে? মাথার চুল খাড়া হচ্ছে তো? হুঁ-হুঁ—হবেই। তারপরে যা হল—

কী হল? মড়াটা আবার গাছ থেকে নীচে নেমে পড়ল, এবার সোজা ছুটে এল আমি যেখানে বসে আছি—ঠিক সেই দিকেই।

আর আমি? বাপ-রে—মা-রে বলে প্রাণপণে ছুট লাগালুম। আর সেই মড়াটা করলে কী জানিস্? আমাকে তাড়া করল—সোজা তাড়া করল।

তারপর?

আমি তখন আছি কি নেই। ছুটতে ছুটতে ধপাস্ করে একটা পেল্লায় আছাড় খেলুম। আর তক্ষুনি রক্তমাখা মড়াটা আমার ঘাড় ধরে আমাকে দাঁড় করালো! কী ভীষণ তার স্পর্শ—কী ভয়ঙ্কর তার কালো কালো হাত! আর কয়েকটি ঝকঝকে হিংস্র দাঁত বের করে—আমাকে কামড়ালে? না-না। হেসে বললে, বাবু, হোলি হ্যায়। বকশিশ।

—আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—হোলিই ত। ওদের দেশে অনেক দিন ধরে চলে জানিস্ তো? তাই সারা গায়ে দোলের রং মেখে, একটা লোককে খাটিয়ায় চাপিয়ে—

কী—উঠে পড়লি যে? পছন্দ হল না? বলছিস্ ভূতের গল্প হয়নি? হয়নি তো বয়ে গেল। যা—এখন বেরো এঘর থেকে। গেট আউট!

www.boiRboi.blogspot.com

তিন আনার আমের জন্যে

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর হারুবাবু ঝোলা-লাগানো আঁকশি দিয়ে একটার পর একটা পাকা আম পাড়ছেন। খাসা আমগুলো! এতদূরে দাঁড়িয়েও আমের গন্ধে আমার প্রাণমন উদাস হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা সোনালি রঙের আমকে ঝুড়িতে সাজিয়ে রেখে হারুবাবু বললেন, কি হে প্যালারাম, অমন জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছ কী—অ্যাঁ?

আমি বললুম, কিছু না।

—কিছু না?—হারুবাবু এমন হেঁ হেঁ করে হাসলেন যে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল : মিথ্যে নজর দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন শুনি? এ আমগুলো বাজারে পাঠাব—টাকায় ছ'টা করে বিক্রী হবে।

—হোক্ না বিক্রী—আমার কী?—আমি ব্যাজার হয়ে জবাব দিলুম।

—তোমার কী? তা বটে। বেল পাকলে কাকের কিছু আসে যায় না বটে!—হারুবাবুর মুখে আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি।

আমার অপমান বোধ হল। হাঁড়ির মতো মুখ করে বললুম, ও আম আমি খাই না।

—পেলে তো খাবে? যাও—যাও—মিথ্যে এখেনে দাঁড়িয়ে থেকে আর কষ্ট পেয়ো না।—বলে আবার আঁকশি দিয়ে আর একটা পাকা আম নামাতে লাগলেন।

আমি গেলুম না। বাগান হারুবাবুর বটে, কিন্তু রাস্তাটা তো মিউনিসিপ্যালিটির। সুতরাং আমি যতক্ষণ ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকব, যত খুশি নজর দেব। হারুবাবু বললেই যাচ্ছি আর কি! যেতে বয়ে গেছে আমার!

বিচ্ছিরি কিপ্টে এই লোকটা! টাকার আণ্ডিল—অথচ প্রাণে ধরে একটা পয়সা খরচ করবে না। আমাদের এই শহরে ভিখিরীরা পর্যন্ত ওঁর দোরগোড়ায় যায় না—পাছে ঝুলি ফেঁসে যায়। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেলে বেরিয়ে আসে স্রেফ্ দুটো নয়া পয়সা। তা হলেই বোঝো।

হারুবাবু আমাকে আম খেতে দেবেন এ আশা আমার কোনদিনই ছিল না। কিন্তু অমন খাসা টুকটুকে আম—গন্ধে চারদিক ম-ম করছে, প্রাণভরে দেখতে দোষটা কী! আমিও তাই দেখছিলুম আর মনে মনে ভাবছিলুম একটা নীরেট কাঁচা আম যদি অনেক উঁচু থেকে টপাক করে ওঁর টাকের ওপর পড়ে—বেশ হয় তা হলে!

এক-একটা করে পাকা আম হারুবাবুর আঁকশির ঝোলায় নামছে, আমি হাঁ করে দেখছি—ঠিক তখন—

রামছাগলটা কখন গুটি গুটি পায়ে ঝোপের আড়াল থেকে এগোচ্ছিল আমরা কেউই দেখতে পাইনি। কিংবা ছাগলের গতিবিধি কে-ই বা দেখতে পায়। ছোট ছোট চারটে পা, একগাল দাড়ি আর দু ইঞ্চি একটা ল্যাজ নিয়ে চিরকাল ওরা আমার কাছে এক দারুণ রহস্য। ওরা পৃথিবীর সব জিনিস খেয়ে থাকে, কিন্তু বাঘ ধরে খেতে পারে না কেন এবং বাঘেই বা পাল্টা ওদের ধরে খায় কেন—এ সমস্যার সমাধান আমি কখনো করতে পারিনি।

হঠাৎ হারুবাবুর হায় হায় চিৎকারে আমার চমক ভাঙল।

www.boiRboi.blogspot.com

—ধরো ধরো প্যালারাম—নিলে—আম নিয়ে গেল—তিন আনার আম নিয়ে গেল একটা—

তাকিয়ে দেখি সেই চির রহস্যময় ছাগল। একটা আম গালে পুরে সে ছুটেছে, তার মিহি দাড়ি ফুরফুর করে উড়ছে হাওয়ায়, দু ইঞ্চি ল্যাজটা রেলের টিকিটের মতো উঁচু করে মেল ট্রেনের মতোই সে ধাবমান।

—ধরো প্যালারাম—তারস্বরে ডাকলেন হারুবাবু। ছুটতে ছুটতে আমায় বললেন, ধরতে পারলে কেটে খাব ব্যাটাকে—তোমাকেও ভাগ দেব।

এটা ভালো প্রস্তাব। আমারও উৎসাহ এসে গেল।

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে—বিশেষ করে রামছাগলকে কে ধরতে পারে উড়ন্ত পাগল ছাড়া? আর পাগল কখনো উড়তে পারে কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। কারণ কোনো উড়ন্ত পাগল আমি কোনোদিন দেখিনি।

অতএব আধ মাইলখানেক ছোটবার পরে ছাগল যখন দিগন্তে বিলীন হল, তখন পেছন ফিরে হারুবাবু আবার হাহাকার করে উঠলেন।

—গেল গেল প্যালারাম—সর্বস্ব গেল আমার!

কেন গেল, কোথায় গেল, কবে গেল?—ছাগল ধরবার আশায়, মাংসের লোভে আমি তখনো ছুটছি—হাঁপাতে হাঁপাতেই জানতে চাইলুম : কোন্ ট্রেনেই বা গেল?

—ধুত্তোরি!—হারুবাবু আমার ঘাড় চেপে ধরলেন : চুলোয় যাক তোমার ট্রেন! ফেরো—ফেরো! গোরু—গোরু এসে পড়েছে!

—কোত্থেকে পড়ল?

—তোমার মুণ্ডু থেকে।—হারুবাবু আমাকে টানতে টানতে আবার বাগানের দিকে ছুটলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন: পালা—পালা—হেট্ হেট্! গেল প্যালারাম—আমার সব গেল!

তখন আমি দেখতে পেলুম। আমরা যখন ছাগলের পেছনে ছুটেছি, সেই সময় গোরু এসে পড়েছে আমের গন্ধে। আর নিশ্চিন্তে ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে সোজা এগোচ্ছে হারুবাবুর আমের ঝুড়ির দিকে।

হারুবাবু আবার গগনভেদী চিৎকার করলেন : হেট্ হেট্—পালা—পালা—

অতদূরের হাঁকে গোরুর কিছুমাত্র বিকার দেখা গেল না। পরিষ্কার দেখতে পেলুম আমের ঝুড়ির ওপর তার মুখখানা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নেমে গেল।

হারুবাবু একটা খাবি খেলেন।

—এক গ্রাসেই তো তিনটে খেয়ে নেবে—অ্যাঁ! হেট্—হেট্—ভাগ—

বলেই মাটি থেকে কী কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন গোরুর দিকে। কিন্তু সেটা গোরুরই খানিকটা কাঁচা গোবর—ঘাস হারামি করতে রাজী হল না। উল্টে হারুবাবুরই হাতে-টাতে লেগে গেল।

—উঃ—কী গন্ধ! ধরো প্যালারাম—ধরো। ওই—ওই আবার খাচ্ছে! ওফ্—আরো তিনটে! পুরো এক টাকার আম খেয়ে নিলে যে!—হারুবাবু ডুকরে উঠলেন।

আমরা এসে পড়েছি দেখে গোরুও ছুট লাগালো।

—ধরো, গোরু ধরো—প্যালারাম—কুইক্!

গোরু ধরে কী হবে?—আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : ওরও মাংস খাবেন নাকি?

—ওয়াক থু—রাম রাম! হিঁদুর ছেলে না আমি?—গোরুকে তাড়া করতে করতে হারুবাবু বললেন, খোঁয়াড়ে দেব ওটাকে—খোঁয়াড়ে। অন্ততঃ আটগণ্ডা পয়সা উশুল

হবে। তা থেকে দু আনা তোমাকেও দেব। ছোটো—ছোটো—

দু আনা! তাই বা মন্দ কী। খামোকা দু আনা পয়সাই বা আমায় দিতে যাচ্ছে কে! আবার গোরুর পেছনে ছুট লাগালুম দুজনে।

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে যদি উড়ন্ত পাগল ছাড়া কেউ ধরতে না পারে, তবে দৌড়বাজ গোরুকে কে ধরতে পারে ধড়িবাজ গোঁয়ার-গোবিন্দ ছাড়া? ছাগল ছুটেছিল মেল ট্রেনের মতো, গোরু ছুটল জেট প্লেনের মতো। পেছনের ল্যাজটা তার জয়-ধ্বজার মতো উড়তে লাগল।

—ধর্—ধর্—ধর্—

ধরা গেল না। গোরুকে ধরে খোঁয়াড়ে দেবে—গোঁয়ার ছাড়া এমন গোঁ আর কার আছে?

অগত্যা গোঁ গোঁ করতে করতে ফিরে এলেন হারুবাবু। দু আনার আশা ছেড়ে আমাকেও ফিরতে হল। গোরুতে ক'টা আম খেয়েছে কে জানে। ঝুড়ির অনেকখানিই সাফ!

হারুবাবু সোজা চোখ বুজে আমগাছতলায় শুয়ে পড়লেন।

—গেল প্যালারাম, কম্‌সে কম দু টাকার আম আমার গেল।

কী আর করি! একটা ডাল কুড়িয়ে হারুবাবুর মাথায় হাওয়া দিতে লাগলুম!

আরো একটা জিনিস আমি দেখেছি। একটা কুকুর হারুবাবুর একপাটি নতুন চটি নিয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু কুকুর ধরে লাভ কি? তার মাংস খাওয়া যায় না—তাকে খোঁয়াড়েও দেওয়া যায় না বোধ হয়। আর পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জুতো নিয়ে পলাতক কুকুরকে কে-ই বা ধরতে পেরেছে? কোনো উড়ন্ত পাগলও নয়—কোনো ধড়িবাজ গোঁয়ার-গোবিন্দও নয়!

তা ছাড়া শকটা একটু সামলে নিন হারুবাবু। এই মুহূর্তে দুঃসংবাদটা দিয়ে ও'র অপঘাত ঘটিয়ে কী হবে?

ছেলে ধরার ইতিহাস

—ঝন্টু, ঝন্টু—

পিতার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল সারা বাড়িতে। কিন্তু পুত্র নিরুত্তর। উত্তর দেবার উপায়ও ছিল না। দু'গালে দুটো আাই বড় বড় ছানাবড়া ঠেসে রাখলে কে-ই বা উত্তর দিতে পারে বলো? শুধু চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে ওঠে, তার বেশি নয়।

তা ছাড়া কাজটা যে খুব মহৎ হচ্ছে না, এ খবরটিও বিলক্ষণ জানা আছে ঝন্টু-চন্দরের। এই বয়সেই অমন পাখোয়াজ ছেলে পৃথিবীতে আর দুটি জন্মেছে কিনা সন্দেহ। পাখোয়াজ কথাটা শুনেই ভুল কোরো না। বাজনা নয়, পাখনাওয়ালা ছেলে। আট বছরের ছেলের মাথায় আটানব্বুই বছরের মগজ। বাপ জগন্নাথ চাকলাদারকে এক হাটে কিনে স্রেফ তিনহাটে বিক্রী করে আনতে পারে; তাও কানাকড়িতে।

জগন্নাথ চাকলাদার বদরাগী লোক। চটে গিয়ে দমাদ্দম গাড়ু-বদনাই ভেঙে ফেলেন গোটা কতক। একবার রাগের মাথায় দেওয়ালে লাথি মেরে পা ভেঙে বিছানাতেই লম্বা হয়ে রইলেন দেড় মাস। এ হেন মনুষ্যও সামলাতে পারছেন না ঝন্টুচন্দরকে। পাখোয়াজের মতোই পাখোয়াজ ছেলেকে দু'হাতে ঠেঙিয়েছেন তিনি। কিন্তু লাভের মধ্যে তাঁরই হাতের মাস্‌ল বেড়েছে—ঝন্টু যথাপূর্বং তথাপরম্।

চেহারার তুলনায় মাথাটা একটু বেশি বড় ঝন্টুর। তারকেশ্বরে ছেলের মাথা কামিয়ে লাউয়ের বোঁটার মতো একটা টিকি রেখে জগন্নাথ ভেবেছিলেন, এ ছেলে তাঁর বিদ্যাসাগর না হয়ে যায় না। বিদ্যাসাগরই হয়েছে বটে, কিন্তু 'বড়বিদ্যার'।

ও হরি! বড়বিদ্যা কাকে বলে তা বুঝি জানো না? সেই যে শাস্ত্রে আছে:

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা—"

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি। এই বয়সেই ঝন্টু ও-কাজে যা হাত পাকিয়েছে তাতে বড় বড় সিঁদেল চোরেরও লজ্জা পাবার কথা। বাবার পকেট হাতড়ে পয়সা নিয়ে তেলে-ভাজা খাওয়া তার রোজকার ব্যাপার। ঠাকুরমার ভাঁড়ারে তো হাহাকার! সন্দেশ, কলা, নাড়ু, ক্ষীর—ঝন্টুর দৃষ্টি পড়লে বেমালুম হাওয়া। পিঁপড়ে এসেও চাটবার জিনিস খুঁজে পাবে না।

ভুল কি আর হয় না? আরে হয় বই কি—স্বয়ং ভগবানই যখন মাঝে মাঝে প্যাঁচে পড়ে যান, তখন ঝন্টুর আর কী দোষ? একবার এক হাঁড়ি দই ভেবে এক খাবলা চুণ খেয়ে যা কান্ড! সাতদিন গাল-গলা ঢোল হয়ে রইল। আর একবার আচারের বয়ামে নেংটি ইঁদুর পড়েছিল—অন্ধকারে সেইটেকে আচার ভেবে কামড় দিয়ে—

আরে থুঃ থুঃ!

তা ওতে ঘাবড়াবার বান্দা নয় ঝন্টু। আসলে কোনো কিছুতেই সে ঘাবড়ায় না।

জগন্নাথ চাকলাদার তাকে যতই থাবড়ান না কেন—কিছুতেই দমাতে পারেননি। বরং সে-ই তাঁকে দমিয়ে ফেলেছে।

তেল ঢেলে দিয়েছে তাঁর লেখবার দোয়াতে। চেয়ারের পায়ার নীচে সাইকেলের বল রেখে দিয়েছিল একবার, বসতে গিয়ে চেয়ার-ফেয়ার সুদ্ধ উলটে পালটে একেবারে গজকচ্ছপ হয়ে গেলেন চাকলাদার। আর একবার নেমন্তন্নে যাবেন, ঝন্টুকে

www.boiRboi.blogspot.com

নিয়ে যেতে চাননি সঙ্গে করে! খানিকক্ষণ গোঁ ধরে বসে রইল ঝন্টু, তারপর বেমালুম চুপচাপ। যেন নেমন্তন্নে তার এক বিন্দু রুচি নেই—তার কাছে জুতোর শুকতলা আর ফুলকো লুচি দুই-ই সমান।

বদরাগী হলেও জগন্নাথ চাকলাদার মাথামোটা লোক। নিজের ছেলের অতলগর্ভ রহস্যের কথা তাঁর জানা ছিল না। জানলেন যথাসময়ে।

গরদের পাঞ্জাবী পাট করে সাজিয়ে রেখেছিলেন আলনায়। তরিবৎ করে যেই গায়ে দিতে যাবেন, অমনি তাজ্জব ব্যাপার। হাতাদুটো হাতেই রইল—বাকী জামাটা খসে পড়ল তিন-চার টুকরো হয়ে। জগন্নাথ হাঁ করে রইলেন। নতুন জামাটার এই বিতিকিচ্ছি কান্ড দেখে কথাই খুঁজে পেলেন না তিনি।

ব্যাপারটা জলের মতো তরল। একখানা দাড়ি কামাবার ব্লেড—ব্যস্! তারপর কচাকচ শব্দে সেলাইগুলো কেটে ফেলতে আর কতক্ষণ।

রাগের চোটে জগন্নাথ একটা কাঁচের গ্লাশ ভেঙে ফেললেন, ভাঙা কাঁচে আঙুল কেটে গেল। তারপর সেই কাটা আঙুলে জলপট্টি বেঁধে তিনি ঝন্টুর বাপের মানে নিজের শ্রাদ্ধ করতে শুরু করলেন প্রাণপণ চীৎকারে। আর ঠিক সেই সময় তেতলার চিলেকোঠায় বসে নির্বিকার মুখে একখানা আস্ত তাল-পাটালি সাবাড় করলে ঝন্টু।

সংক্ষেপে এই হল পিতা-পুত্র সংবাদ।

জগন্নাথ আবার হুঙ্কার করলেন : এই ঝন্টু, ঝন্টে—

হুঙ্কার করার কারণ ছিল যুক্তিসঙ্গত। অফিসের কাগজ বার করবার জন্যে যেই টেবিলের টানাটা খুলেছেন, অমনি তার ভেতর থেকে একটা কট্‌কটে ব্যাং লাফিয়ে পড়েছে তাঁর গায়ে। তিনি হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠতেই দোতলার জানলা থেকে একলাফে ব্যাংটা নেমে গেছে সদর রাস্তায়।

উকিলের ড্রয়ারে মামলা গজায়, টাকাও গজায়, কিন্তু ব্যাং যে গজায় এমন কথা কোনো অভিধানে লেখেনি। পরপর তিনটে চায়ের পেয়ালা আর একটা মস্ত জামবাটি ভেঙে ফেলে জগন্নাথবাবু সারা বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন : ঝন্টু—ঝন্টু—

ভাঁড়ারের অন্ধকার কোণায় ঝন্টু তখন ধ্যানস্থ। একেবারে পরমহংসত্ব লাভ করে বসে আছে। দু'গালে ছানাবড়া, চোখদুটোও বেরিয়ে আসছে ছানাবড়ার মতো।

অর্থাৎ জগন্নাথবাবু শুধু ব্যাংই দেখেছেন। তাঁর অজ্ঞাতে কত বড় আর একটা সর্বনাশ যে ঘটতে চলেছে তা তিনি টেরও পাননি।

সকালে কেষ্টনগর থেকে তাঁর একজন মক্কেল এসেছিল। জগন্নাথবাবুর মতে মক্কেল মানে বে-আক্কেল জীব, পয়সা দেবার নামেই চোখ উল্‌টে যায় তাদের। কিন্তু এ মক্কেলটি লোক ভালো। টাকা তো তাঁকে দিয়েছেই, সেই সঙ্গে এক হাঁড়ি ছানাবড়া।

জগন্নাথবাবু খাওয়া-দাওয়া করতে একটু ভালোই বাসেন। তা ছাড়া ভালো জিনিস খেতে তাঁর আরো ভালো লাগে। ভেবেছেন, বিকেলে বেশ দরদ দিয়ে ওগুলো সাবাড় করবেন। তাই নিজের হাতেই লুকিয়ে রেখেছেন ভাঁড়ারে, বাড়ির কাকপক্ষীতেও টের পায়নি।

কিন্তু কাকপক্ষীতে টের না পেলেও ঝন্টু পাবে না এর কী মানে আছে!

অতএব—

অতএব কট্‌কটে ব্যাংয়ের দ্বারা বিপর্যস্ত জগন্নাথবাবু যখন ঝন্টুর হাড়-মাংস গুঁড়ো করে চপ বানিয়ে খাওয়ার জন্যে লাফাচ্ছেন, তখন উল্‌টে ঝন্টুই তাঁকে খেয়ে ফেলেছেন, মানে তাঁর ছানাবড়াকে।

www.boiRboi.blogspot.com

—ঝন্টে—ঝন্টি—ঝন্টা—ওরে হারামজাদা—

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে যাচ্ছেন সমানে। এমন সময় উড়ে চাকর দাশরথি ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে।

—বাবু, ম দেখিথিলা—

—কী দেখেছিস?

—ছোটবাবু ভান্ডারে ঢুকি ছানাবড়া খাইথিলা—

—অ্যাঁঃ!—জগন্নাথ ধাবিত হলেন ভাঁড়ারের দিকে।

কিন্তু ঝন্টুর কান অনেক খাড়া। এসব বড়বিদ্যার ব্যাপারে হাত পাকাতে হলে অনেক হুঁসিয়ার থাকতে হয়। জগন্নাথ ভাঁড়ার পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই ঝন্টু লাফিয়ে পড়ল উঠোনে, তারপর সদর রাস্তা দিয়ে—

—আজ ওরই একদিন, কি আমারই একদিন।—গর্জন করলেন জগন্নাথ চাকলাদার। তাঁর টিকিতে একটা জবাফুল বাঁধা ছিল, প্রতিজ্ঞা শুনে সেটাও যেন নেচে উঠল তড়াক করে।

কিন্তু ততক্ষণে টালীগঞ্জের রাস্তায় ঝন্টু হাওয়া।

—যাবে কোথায়? কান ধরে টেনে আনব না! নিপাত করে ছাড়ব আজ—জগন্নাথ প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর টিকিটাকে আর একবার নাচিয়ে যাত্রা করলেন পুত্রবধের মহৎ উদ্দেশ্যে।

হায়, তখন কি তিনি জানতেন—

না, জানতেন না। জানতেন না সিধু নন্দী আর বিধু দত্ত গাঁজা খেয়ে ভাম হয়ে বসে আছে। আরো জানতেন না, তারা একটা দুর্দান্ত কিছু করে ফেলবে বলে দস্তুরমতো বদ্ধপরিকর।

হারানমুদীর দোকানের সামনে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসেছিল দু'জনে। মুখ থেকে খানিকটা দুর্গন্ধ ধোঁয়া ছেড়ে দিলে সিধু নন্দী। তারপর :

—শুনেচিস্ বিধু, কলকাতায় ছেলেধরা এসেছে।

সিধু নন্দীর মুখে 'শ' বেরোয় না সব 'S'।

—কী করা যায় বল্ দিকি?

গাঁজা খেলেই বিধু দত্তের মুখ দিয়ে হিন্দী বেরুতে থাকে। গোঁফে তা দিয়ে বললে, জান্‌সে মার দেগা, আউর কেয়া?

সিধু বললে, সেদিন শ্যামবাজারে দুটো ছেলেধরা ধরেছে। আমরা একটাও পেলাম না। কী দুঃখের কথা বল্ দিকি! কেমন চমৎকার হাতের সুখ করে নেওয়া যেত!

—এ তো বাত ঠিকই হ্যায়।—বিধু গোঁফে চাড়া দিলে : লেকিন, হামলোক্‌কা নসীব খারাপ। এক ব্যাটাকে পাতা তো পিটকে পিটকে একদম ছাতু বানা দেতা—

—সত্যি, একটা ছেলেধরা ঠ্যাঙাতে না পারলে আর প্রাণে সুখ নেই—সিধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিধু বললে, যা বলেছিস। ছেলেধরাই যদি পিটতে না পারলুম, তবে বেঁচে থেকে আর কেয়া সুখ হ্যায়! চল্, হিমালয়মে যাই হামলোক। সাধু বন্ যাই—বিধুর গলার স্বরে নিদারুণ বৈরাগ্যের আভাস।

সিধু আরো করুণ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় :

বিধু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তড়াক্ করে। গোঁফে চাড়া দিয়ে বললে, এই দেখ্‌তা হ্যায়?

—কি রে?

—একঠো টিকিওলা আদমী এক বাচ্চাকে টানতে টানতে লে যাতা হ্যায়।

—তাই তো!—সিধুও লাফিয়ে উঠলঃ ওই যে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছে, যেতে চাইছে না। হুম!

—তা হলে—

কোনো সন্দেহ নেই, নির্ঘাৎ ছেলেধরা। টালীগঞ্জের রাস্তা নির্জন দেখে—ছেলেটাকে—

—মারো উসকো—বিধু লাফিয়ে পড়লঃ জান্‌সে মার্ দো—

—জয় হিন্দ্!—রণহুঙ্কার ছাড়ল সিধু নন্দী। তারপর দুজনে তাড়া করল ছেলেধরাকে।

টিকিওলা আদমী প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি, পেছন থেকে পিঠের ওপর একটি রাম কিল পড়তেই কাঁক্ করে উঠল সে।

—এই মারছ কেন?

—মারব না? তুমি তো ছেলেধরা—আর একটা চাঁটি পড়ল টাকের ওপর।

—বাঃ রে, এ আমার নিজের ছেলে—

—সকলেই ওরকম বলে—বিশেষ করে পরের ছেলে গায়েব করতে হলে—গালে একটি থাপ্পড় পড়ল।

জগন্নাথ এবারে রুখে উঠলেন : রাস্তার মধ্যে এসব কি মশাই! নিরীহ লোককে ধরে মার দেওয়া! আমি পুলিস ডাকব!

—পুলিস ডাকবে! তার আগে পুলটিশ করে ছাড়ব তোমায়—এবার টিকিতে হ্যাঁচকা টান পড়ল একটা! রামটান যাকে বলে!

—উঃ গেছি—গেছি—জগন্নাথ আর্তনাদ করে উঠলেনঃ এই ঝন্টে, তুই বল্ না? আমি কি ছেলেধরা? আমি কি তোর বাবা নই?

ঝন্টুর তখনো কান দুটো টন্‌টন্ করছে জগন্নাথের কড়া হাতের মোচড়ে। একবার চোখ পিট্‌পিট্ করে উঠল তার। তারপর বললে, তা তো জানি না। তুমি আমাকে এমন মেরেছ যে আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছ। আমার কি এখন মনে আছে তুমি আমার বাবা কিনা!

জগন্নাথ কেঁদে বললেন, ওরে ঝন্টে, তোর মনে কি এই ছিল? আমি কি তোর বাবা নই? আমিই কি তোর বাপ জগন্নাথ চাকলাদার নই?

ঝন্টু বললে, কি জানি মনে পড়ছে না।

সিধু গর্জে বললে, তবে রে ব্যাটা মিথ্যুক—

বিধু হেঁকে বললে, টিক্কি উখার লেও উসকো—

তারপরে যা ঘটল তা প্রলয়।

—মার মার—ছেলেধরা—

সিধুর চাঁটি চলছে, বিধুর কিল। ঝন্টুর মুখে হাসি দেখা দিল। হ্যাঁ, মন্দ হয়নি এতক্ষণে! তাকে রাস্তায় ধরে যে পরিমাণে ঠ্যাঙানি দিয়েছিল জগন্নাথবাবু তা উশুল হয়ে গেছে সুদে আসলে।

জগন্নাথবাবু তখন গোঙাচ্ছেন : ঝন্টু ঝন্টু ঝন্টু!—বাপ আমার—

ঝন্টু বললে, গায়ে হাত তুলবে আর?

জগন্নাথ গোঙাতে লাগলেন: নাকে খত।

—ছানাবড়া?

—সব তোর। দু হাঁড়ি মিঠাই এনে দেবো আরো—

—মনে থাকবে?

—আর ভুল হয়? এখন আমায় বাঁচা বাপধন—

ততক্ষণে চারদিকে লোকে লোকারণ্য : কী! কী হয়েছে?

ঝন্টু চেঁচিয়ে উঠল, ওগো, তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কী...দুটো ছেলেধরা যে আমার বাবাকে মেরে ফেলল।

সিধু বিধু আঁতকে উঠল।

ঝন্টু বললে, সত্যি বলছি মশাইরা! এই লোকদুটো আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, বাবা বাধা দেওয়াতে এরা—

আর বলতে হল না।—'মারো ব্যাটাদের'—তিন চারশো লোক ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সিধু বিধুর ওপরে।

বিধু চেঁচাতে লাগল : শুনুন মোশাইরা—শুনিয়ে আপ্‌লোগ্—

কিন্তু কে শোনে তার কথা। হাটুরে কিল তখন চলছে পাইকারী হারে। টালীগঞ্জের রাস্তায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড!

ওদিকে একফাঁকে পাশের গলি দিয়ে কেটে পড়েছে পিতাপুত্র।

অনেকটা এগিয়ে যখন সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ হল, তখন ঝন্টু ডাকলে : বাবা!

—কী বাপধন? সুধামাখা গলায় জগন্নাথ বললেন : কী চাই?

—ছানাবড়া?

—আরো দু'হাঁড়ি এনে দেবো। তোমার জন্যই তো সব—জগন্নাথের গলার স্বরে ছানাবড়ার রস ঝরে পড়ল যেন।

পুরুষ

ছোটকাকা বার বার করে বোঝাচ্ছিলেন খোকনকে।

—চুপ করে বসে থাকবে। উঠবে না, ছটফট করবে না। শ্যামবাজারের মোড়টা পার হলেই কণ্ডাক্টরকে বলবে, আমি হাতিবাগানের মোড়ে নামব। বাস একেবারে থেমে গেলে—সামনের দিকে মুখ করে তারপর নামবে। চারদিক দেখে শুনে রাস্তা পার হবে। তারপর ডানদিক ধরে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে এগিয়ে গেলেই ছোটমাসিমার বাড়ি। ফুটপাথ থেকে কখনো নামবে না, আর—

অধৈর্য হয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিল খোকন :

—জানি—জানি। কতবার তো গেছি তোমাদের সঙ্গে।

—হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে গেছ। কিন্তু আজ যাচ্ছ একা। এই প্রথম একা পাঠাচ্ছি তোমাকে। লক্ষ্মী ছেলে হলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি যেরকম চঞ্চল—

—না কাকা, তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব চিনি।

—ছাই চেনো। যা যা বললাম, সব ঠিকভাবে করবে। আর গিয়েই ছোটমাসিকে বলবে আমাদের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে একটা টেলিফোন করে দিতে। তাহলেই আমরা খবর পেয়ে যাব।

—আচ্ছা—আচ্ছা। আবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে দিল খোকন, আর ভাবছিল, কতক্ষণে কাকার কাছ থেকে নিস্তার পাবে। বেশিক্ষণ দেরি করতে হল না। বাস এসে পড়ল।

—উঠে পড়ো চটপট। ফাঁকাই তো আছে দেখছি। হ্যান্ডেলটা ভাল করে চেপে ধরো। সোজা ভেতরে গিয়ে—বসেছ? আচ্ছা ঠিক আছে। কাকা জানলার কাছে চলে এসেছেন: যা বলেছি সব মনে থাকে যেন। হাতিবাগানের মোড়ে নেমে গ্রে স্ট্রীট। আর পৌঁছেই একটা টেলিফোন—

বাস ছাড়ল। পেছন থেকে শেষবার শোনা গেল: টেলিফোন কিন্তু—

আঃ—এইবার নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এইবার খোকন একা। কাকা নেই, বাবা নেই—মা, দিদি কেউ নেই। খোকন এখন নিজেই নিজের অভিভাবক। পকেট থেকে পয়সা বার করবে, গুনে গুনে দেবে কন্ডাক্টরকে, গম্ভীর গলায় বললে: হাতিবাগানের মোড়। টিকিটটা নিয়ে মাথা নেড়ে বলবে: আচ্ছা ঠিক আছে—

খোকন ছেলেমানুষ নয়। তেরো বছর তার বয়েস—এবার ক্লাস এইটে উঠেছে। স্কুলের নতুন বেয়ারাটা তাকে 'আপনি' বলে। ক্লাসের টীমে সে ক্রিকেট খেলে। বল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে, এইবার একটি ফাস্ট বল দিচ্ছেন ট্রুম্যান, এইবার গুগ্লিতে চমৎকারভাবে স্পিন করলেন—

কিন্তু বাড়িতে?

ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ! শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, এখনো খোকন মা-র কাছে ছাড়া শুতে পারে না। বড় দেওয়াল-ঘড়িটায় চাবি দেওয়া দূরে থাক—হাত দিয়ে ছুঁতেও পারে না এখনো, সিঁড়ির নিচে কয়লার ঘরটায় সন্ধ্যের পর কিসের যেন কালো কালো ছায়া দেখে, একটু বেশি রাতে একা ছাতে যেতে বললে তার পা ব্যথা করতে থাকে।

কিন্তু এ-সব তো রাতের কথা। তাছাড়া আর বছর-খানেকের মধ্যেই সে দেওয়াল-ঘড়িটায় চাবি দেওয়ার মতো লম্বা হতে পারবে। তাই বলে এই সকালে দক্ষিণেশ্বর থেকে হাতিবাগানে তাকে পাঠাতে সকলের এত ভয় কেন? দিনে খোকন কোন কিছুর পরোয়া করে না। সব চেনে, সব দেখতে পায়, কয়লার ঘরের ভেতরে পর্যন্ত গিয়ে বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে নাড়াচাড়া করে আসে। যতক্ষণ রোদের আলো জেগে আছে, ততক্ষণ খোকন আর ছেলেমানুষ নয়।

তবু আরো একটু বড় হওয়া দরকার। আর একটুখানি বড় না হলে—

ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা টফি বের করলে খোকন। চমৎকার লাগছে। মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে বাস। দু-একটা নতুন বাড়ি উঠেছে এদিকে ওদিকে, তাছাড়া ছোট ছোট ঝোপ, আর অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত। কাল রাতে খুব খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে, শাদা জল চিকচিক করছে খেতের ভেতরে—হাওয়ায় সবুজ ধানের ঢেউ খেলছে। রাস্তার ধারের গাছ থেকে দুটো পাখি উড়ে গেল একসঙ্গে—বুলবুলি।

www.boiRboi.blogspot.com

এই বাসটা যদি পথ ভুল করে? যদি কলকাতার দিকে না গিয়ে অন্য দিকে, অন্য যে-কোন দিকে চলতে থাকে খেয়াল খুশিতে? অনেকক্ষণ ধরে? মাঠের পর মাঠ পাড়ি দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে চলতেই থাকে? তারপর বেলা গড়িয়ে গেলে হঠাৎ বাসটা থামিয়ে ড্রাইভার বলে, এই যাঃ, ভারি ভুল হয়ে গেছে—হাতিবাগান না গিয়ে আমরা যে সোজা মধুপুরে চলে এসেছি!

হুঁ, রাস্তা ভুল করে মধুপুরে যাওয়াই ভাল। অন্য জায়গা খোকন চেনে না। মধুপুরে পিসিমার বাড়ি। কত মাঠ, কত ফুল, কত খেলবার জায়গা! তারপর সেখানে আছে পিসতুতো ভাই টোকন। বয়সে তারই সমান—তার সঙ্গে খুব ভাব। দু-জনে মিলে মনের আনন্দে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

আর এদিকে?

পকেট থেকে আর-একটা টফি বের করে খোকন তার মোড়কটা ছাড়াতে লাগল। এদিকে বাড়িতে তো দারুণ গন্ডগোল! ছোটমাসিমার বাড়ি থেকে কোন খবর না পেয়ে কাকা নিজেই ডাক্তারবাবুর দোকানে গিয়ে হ্যালো হ্যালো বলে ফোন করবেন। মাসিমা বলবেন, না তো—খোকন তো আসেনি! মা তো তক্ষুনি কান্না জুড়বেন, বাবা কাকা একবার যাবেন থানায়, একবার হাসপাতালে—তারপর খবরের কাগজে যেমন সবাই দেয়, তেমনি বিজ্ঞাপন দেবেন: নিরুদ্দেশ। ডাকনাম খোকন, ভাল নাম শুভাশিস রায়চৌধুরী। বয়স তেরো বছর, ফর্সা, উচ্চতা—

আচ্ছা, সে কতটা উঁচু? খোকন মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সে যাক। সে-কথা কাকাই বুঝবে। তারপর নিচে লিখে দেবে: খোকন রাগ কোরো না। এবার নিশ্চয় তোমাকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেওয়া হবে। শিগগির ফিরে এস—তোমার মা শয্যাগতা। মেজদি ছোড়দি রাতদিন কাঁদছে। ঠিকানা জানালে—

আর খবরের কাগজে সেই বিজ্ঞাপন দেখে পিসিমা বলবে: করেছিস কী—ও খোকন? না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস মধুপুরে?

খোকন তখন টোকনের সঙ্গে ক্যারম খেলছে। হেসে বলবে: বা-রে, আমি কি ইচ্ছে করে চলে এসেছি নাকি? বাসটাই তো ভুল করে কলকাতায় না গিয়ে এখানে চলে এল। আমি কি করব!

পিসিমা বলবেন, সর্বনাশ! তাহলে তো এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম—

খোকনের স্বপ্নটা হোঁচট খেল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়ালো বাসটা।

না—পথ ভুল করেনি। সেই চেনা রাস্তা ধরে—সেই একভাবে ঠিক চলে এসেছে। ধানের খেত—বন—নদী—কোথাও কিছুই নেই। গাড়ি বরানগরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাতেই যেতে হবে খোকনকে। সেই হাতিবাগানের মোড়ে—সেই ছোটমাসিমার বাড়িতে। খোকনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এতক্ষণ বাসে ভিড় ছিল না—এইবারে অনেক লোক উঠল। গাড়ির ভেতর চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। কে যেন বলছে: গঙ্গাজল! গঙ্গাজলের ঘটিটা কোথায় গেল? আর একজন চেঁচাচ্ছে: দেখিস এবার মোহনবাগানই লীগ নেবে। আমি বলছি, তুই লিখে রাখ—

বাস আবার চলছে। মধুপুর নেই, সেই মাঠটা কোথাও নেই—সেই খেলবার জায়গাও নেই। দু-ধারে বাড়ির সার ঘন হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় একরাশ কাদা জমেছে, কতগুলো মোষ গড়াগড়ি করছে সেখানে। একটু পরেই বাস কলকাতায় পৌঁছুবে—তারপর গ্রে স্ট্রীট, তারপর ছোটমাসিমার বাড়ি।

খোকন যদি আর একটু বড় হত, তাহলে হাতিবাগান নয়—আরো দূরে একা নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারত। যেতে পারত বালিগঞ্জে—পটলমামাদের বাড়িতে। পটল-

মামা অবাক হয়ে বলতেন : কি-রে—একাই চলে এলি এত দূরে?

খোকন মাথা নেড়ে বলত : কেন—পারি না নাকি? এখনো আমি বড় হইনি বুঝি?

পটলমামা বলতেন : তাই তো দেখছি! এখন একেবারে জেন্টলম্যান! আর খোকন বলা চলবে না—বলতে হবে শুভাশিসবাবু।

—একটা পয়সা দেবেন বাবু?

বাস থেমেছে। হাত বাড়িয়েছে ভিখারীর ছেলে।

—গরিবকে একটা নয়া পয়সা দিয়ে যান রাজাবাবু—

বাবু—রাজাবাবু! নিজেকে ভারি সম্মানিত মনে হয় খোকনের। এতদিন ও-কথাটা বাবা শুনেছে, কাকা শুনেছে। আজ ও খোকনকেই সম্বোধন করছে ঐ বলে। খোকনকেই—আর কাউকেই নয়।

ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে একটা পাঁচ নয়া পয়সা ঠেকল। পাঁচ নয়া পয়সা? তা হোক।

বাস চলে—আবার ঝিম আসে খোকনের। এখনো অনেক বড় হতে হবে, অনেক বড় হওয়া বাকি আছে তার। কয়লার ঘরে সন্ধ্যের পর কাদের ছায়া দোলে—অনেক রাতে একলা ছাতের ওপর কারা যেন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে যায়, বাইরের বাদাম গাছটায় প্যাঁচা ডাকলে খোকন এখনো মায়ের বুকের কাছে সরে আসে। ক্রিকেট খেলার সময় ফ্ল্যাঙ্ক ওয়েল হলে কী হয়—এখনো খোকনের বড় হতে অনেক দেরি আছে।

আচ্ছা বাসটা কেন পথ ভুল ধরে মধুপুরে চলে যায় না?

—লেডীজ সীট—লেডীজ সীট—

চিড়িয়া মোড়। খোকনের ঝিমুনি ভাঙে।

কণ্ডাক্টার আলতোভাবে ছোঁয়া দিলে খোকনের পিঠে। পাশে পিসিমার মতো বয়সের একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ভুরু কুঁচকে। কাঁধে লম্বা একটা ঝোলানো ব্যাগ, চোখে ভ্রূকুটি।

পাশের জায়গাটা দেখিয়ে খোকন বললে, বসুন না—

ভদ্রমহিলা মোটা গলায় বললেন, লেডীজ সীট ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এক মুহূর্তে কী যে বুঝল খোকন—নিজেই জানে না। চট করে উঠে পড়ল—তারপর একেবারে সামনে গিয়ে অনেক কষ্টে আঁকড়ে ধরল রডটা। হঠাৎ তার মনে হল, সে অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক বড়।

একজন ভদ্রলোক বললেন, এস খোকা—এখানে জায়গা আছে।

খোকা! না। খোকন জবাব দিলে না।

হাতিবাগানের মোড়ে সে নামবে না—যাবে না ছোটমাসিমার বাড়িতে। এই বাসে চড়ে সে আরো অনেক দূরে চলে যাবে। বালিগঞ্জে, ডায়মণ্ড হারবারে—মধুপুরে। আর তার ভয় নেই—আর কাউকে সে ভয় করবে না। খোকন অনুভব করতে লাগল, আজ—এক্ষুনি সে অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে, ওই ঢ্যাঙা কণ্ডাক্টারটার মাথা ছাড়িয়েও আরো এক হাত ওপরে।

দুপুর বেলার লোকটা

যখন ব্যাপারটা ঘটেছিল, তখন এ কথাগুলো আমি কাউকে বলতে পারিনি; বলিনি এই জন্যে যে, প্রথমত কেউ বিশ্বাস করবে না; দ্বিতীয় কারণ সেদিনের সেই আশ্চর্য মোহ—সেই অদ্ভুত নেশা, তার অনুভূতিকে বলবার মতো ভাষা আমার ছিল না। লোকে শুধু এইটুকুই জানত, আমাকে ছেলেধরা ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পথের মধ্যে—

আমি ফিরে আসবার পরে দু-ঘন্টা ধরে ঠাকুরমা কান্নাকাটি করেছিলেন সে কথা মনে আছে। আরো মনে আছে, জোড়া মণ্ডার হরির লুট হয়েছিল বাড়িতে। এও মনে পড়ছে, ঘটনাটার পরে প্রায় ছ-মাস ধরে একটা চাকর সঙ্গে না নিয়ে আমার কোথাও বেরুবার জো ছিল না—এমনকি স্কুলেও না।

কিন্তু আজ আর ঠাকুরমা বেঁচে নেই। যাঁদের স্নেহ ভালবাসার রক্ষা-কবচ সব সময়ে আমাকে ঘিরে থাকত, তাঁদের অনেকেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। ছেলেধরাকে প্রলুব্ধ করবার মতো বিপজ্জনক বয়সের সীমাটা আমি পার হয়ে এসেছি অনেক—অনেক বছর আগে। আজ অসঙ্কোচে একটা স্বীকারোক্তি করা যাক। এক-একটা বিরক্তিভরা ক্লান্ত মুহূর্তে আজ যখন জীবনটাকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, রাত্রির হাওয়ায় কখনো কখনো যখন দূর থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সমস্ত মনটাকে ব্যাকুল করে তোলে, তখন ভাবি, এর চাইতে সেই ছেলেধরার সঙ্গেই চলে যাওয়া ভালো ছিল। একটা অপরূপ আশ্চর্য পৃথিবীর হাতছানি আমার কাছে বয়ে এনেছিল সে—যে পৃথিবী চিরদিনের মতো আমাদের কাছ থেকে মুছে গিয়েছে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল লোকটা? কোথায় নিয়ে যায় ছেলেধরা? অনেক জল্পনা-কল্পনা শুনেছি এ নিয়ে। কেউ কেউ বলে, ওরা নাকি পাহাড়ের নাগা সন্ন্যাসীদের চর; কারো কারো মতে ওরা ছেলেপুলেদের নিয়ে ভিক্ষুকের কাছে পৌঁছে দেয় ভিক্ষে করবার জন্যে। আর আমার ঠাকুরমা ভাবতেন, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে পদ্মার পুলে বলি দেওয়া হয়। নরবলি না দিলে নাকি খুশি রাখা যায় না রাক্ষসী নদীকে।

এসব কথা শুনে ভয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। নিজের একান্ত অবসরে শুধু বসে বসে এই কথাই ভেবেছি, আমার ফিরে আসবার কোন দরকার ছিল না। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া, বাড়িতে হাজার রকমের শাসন, পরীক্ষার আতঙ্ক, এদের সবকিছুর হাত থেকেই কী আশ্চর্য মুক্তি সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে। নাগা সন্ন্যাসী, ভিক্ষুকের দল, পদ্মার পুল—ওসব কিছুই নয়—সে যে কোন অপূর্ব রূপকথা দিয়ে গড়া।

সে কথা যাক। তার দোরগোড়া থেকে কী ভাবে ফিরে এলুম সেইটেই বলি।

রবিবারের ছুটি ছিল সেদিন। দুপুরের সঙ্গে গরম হাওয়া মাতামাতি করছিল পূর্ণিয়া শহরে। রাস্তায় থেকে থেকে উঠছিল ধুলোর ঘূর্ণি—আমের বাগানে দুটো-একটা ফল রঙ ধরে টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ছিল। আমাদের ভাট্টা বাজারের বাসায় আমি একটা জামরুল গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে ছিলুম। জামরুল এখনো পাকে নি, ভাবছিলাম এক ফাঁকে টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব কি না।

এমন সময়ে এল লোকটা।

পাকা দাড়িগুলো ধুলোয় বাদামি হয়ে গেছে—একরাশ ময়লা শিমুল তুলোর মতো মাথার চুল—হঠাৎ মনে হয় এক-ঝলক হাওয়া ওগুলো উড়িয়ে নিতে পারে। কাঁধে একটা তালি-মারা ঝোলা, একহাতে একটা অষ্টাবক্র লাঠি।

ইসারা করে লোকটা আমাকে ডাকল। ডাকল কাঠের গেটটার ওপার থেকে।

ঠিক ভিক্ষে চাইবে—আমি জানতুম। রবিবারে সকাল থেকেই ওদের শুরু হয়। বেলা তিনটে অবধি। বললুম, দাঁড়াও, চাল এনে দিচ্ছি।

লোকটা মাথা নাড়ল—না, চাল সে চায় না।

তবে ভাত? ভাত ফুরিয়ে গেছে।

না, ভাতও তার দরকার নেই।

তাহলে পয়সা? পয়সা দেওয়া হবে না। সে যেতে পারে।

না, পয়সাও সে চাইতে আসেনি। শুধু দুটো কথা বলতে এসেছে আমার সঙ্গে।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। আমার সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ঐ বুড়ো লোকটার—যার দাড়িগুলো পেকে বাদামি হয়ে গেছে, যার মাথার চুলগুলো একরাশ মলিন শিমুল তুলোর মতো দোল খাচ্ছে এলোমেলো হাওয়ায়? কী মতলব ওর?

একবার ভাবলুম, চোর। ভাববার কারণ ছিল। মাসখানেক আগে দিনদুপুরে বাড়িতে চোর ঢুকে একরাশ বাসন-পত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে—কে জানে সেই লোকটাই লোভে লোভে আবার ফিরে এসেছে কি না। বৈঠকখানা ঘরে ছোটকাকা ঘুমুচ্ছেন, ওঁকে ডাকব কি না মনে মনে ভাবছি, এমন সময়ে লোকটা আবার আমাকে ইসারা করে ডাকল।

এইবার এতক্ষণ পরে আমি ওর চোখদুটো দেখতে পেলুম। আশ্চর্য, এতক্ষণে ও চোখদুটো কোথায় লুকিয়ে ছিল! কালো কোঁচকানো কোটরে গভীর ভুরু অন্ধকারে—কোন্ গহনে অদৃশ্য হয়ে ছিল এমন একটা তীব্র উজ্জ্বল দৃষ্টি।

শাদা দাড়ির ফাঁকে লোকটা হাসল।

এ হাসি আরো আশ্চর্য। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল একে আমি অনেকবার দেখেছি, এ আমার বহুকালের চেনা। এর নামটা এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু একটু পরেই পড়বে। এই দুপুরে—গরম হাওয়ার এই মাতামাতিতে টুপটাপ করে পাকা আম ঝরে পড়বার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে—এর জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছিলুম। আমার জন্যে অনেক কথা এ বয়ে নিয়ে এসেছে, এনেছে অনেক খবর। সেইগুলো শোনবার জন্যেই তো এতক্ষণ আমি এমনি উৎসুক হয়ে এই জামরুল গাছের তলায় বসে প্রহর গুনছি। আবার হাসল লোকটা। আর একবার হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লুম আমি। কাঠের গেট পার হয়ে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়।

আমাদের নির্জন পূর্ণিয়া শহর দুপুরের তপ্ত রোদে এত বেশি নির্জন হয়ে যায় কে জানত। কে জানত গ্রীষ্মের এই গরম হাওয়ায় তার চারিদিকে মাঝরাতের স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। একটা ছাগল চরে না, একটা কুকুর দেখতে পাওয়া যায় না—শুধু পাতার ঝর-ঝর আর বাতাসের হু-হু ছাড়া আর কোন শব্দ থাকে না কোথাও।

লোকটা তার অষ্টাবক্র লাঠিটায় ভর দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার একটা হাত আস্তে রাখল আমার কাঁধের ওপর। দাড়ির ফাঁকে অল্প একটু হেসে ফিস-ফিস করে বলল, চল তাহলে।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, চল। কারণ স্পষ্ট কিছু জানা না থাকলেও আমি বুঝতে পেরেছিলুম, যাওয়াটা আমার দিক থেকে অত্যন্ত জরুরি দরকার। না গেলে মস্ত একটা সুযোগ হারাব। একটা মজার খেলা? ভারি চমৎকার কোন পিকনিক্? অথবা আরো কিছু লোভনীয় তার চাইতে? ঠিক জানা নেই, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

আমরা দুজনে হাঁটতে শুরু করলুম।

মুহূর্তে পূর্ণিয়া শহর মুছে গেল দুপাশ থেকে। সামনে শুধু একটা ছায়া-ছায়া পথ—যতদূর দেখি, ঐ পথটা ছাড়া আর কিছু কোথাও নেই। আর পথটাও কি হঠাৎ মাটি ছেড়ে ধনুকের পিঠের মতো আকাশের দিকে বাঁকা হয়ে উঠে পড়ল? তার দুধারে মানুষ জন, বাড়ি ঘর, জংলা আমের বাগান—কিছুই রইল না। শুধু একরাশ ছায়া-ছায়া অস্পষ্টতা, কিছু মেঘ, খানিকটা ধোঁয়া। আমি কি শূন্য দিয়ে চলেছি?

হঠাৎ তাকিয়ে দেখলুম লোকটার দিকে। কী আশ্চর্য—এ তো সে নয়। কোথায় মিলিয়ে গেল সে লোকটা? এ যেন আর-একজন মানুষ। লম্বা চওড়া চমৎকার চেহারা—মাথায় শাদা ধবধবে পাগড়ি, তাতে কি সব ঝিকমিক করছে। যাত্রার দলের পোশাকের মতো একটা লম্বা ঝকমকে জামা তার গায়ে, পায়ে জরির নাগরা। বয়েস কত আর? ছোট কাকার মতো হবে বড়-জোর।

লোকটা আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর হাতের মুঠো খুলে ধরল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মুঠোর ভেতরে একটা ছোট পাখি। মাটির নয়—জ্যান্ত। কিন্তু এমন রঙের পাখি আমি কখনও দেখিনি! এমন সুন্দর পাখি কখনো থাকতে পারে আমি জানতুম না। সবুজে সোনালিতে মেশানো তার গায়ের রঙ—লাল টুকটুকে ছোট ছোট ঠোঁট—আরো ছোট ছোট দুটি চোখে সে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

—আমাকে দাও—বলেই আমি খপ করে পাখিটার দিকে হাত বাড়ালুম।

সঙ্গে সঙ্গে সবুজে সোনালিতে মেশানো একটা বড় প্রজাপতির মতো লোকটার মুঠো থেকে উড়ে গেল পাখিটা। কিন্তু বেশি দূরে গেল না। ঠিক আমার কাছ থেকে হাত-দুয়েক দূরে সে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। যেন ধরা দেবার আগে কিছুক্ষণ খেলা করতে চায় আমার সঙ্গে।

আমি ছুটে চললুম পাখিটার পেছনে। যেন চমৎকার একটা খেলা শুরু করেছে পাখিটা। কখনো ঠিক হাতের নাগালে আসে—ঠিক ধরবার মুহূর্তেই আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় কাছ থেকে।

লোকটা আমার পাশে পাশে আসছে। ছুটছে না—অথচ ঠিক চলছে সমানে—যেন একটা অদৃশ্য সুতো দিয়ে আমার সঙ্গে সে বাঁধা। মাথার শাদা পাগড়িটায় কি সব রোদে চিকমিক করছে। যাত্রার দলের রাজার মতো জামাটা ঝকঝক করছে রোদে।

তৎক্ষণাৎ পাখিটা ওর হাতের ভেতর এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা মুঠো করে ফেলল লোকটা।

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—মরে যাবে—

লোকটা মুঠো খুলল। একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

কী আশ্চর্য—পাখিটা সেখানে নেই! শুধু মুঠো-ভরা একরাশ পাকা আঙুর। রসে টলটল করছে সেগুলো।

আমি আবার চিৎকার করে উঠলুম : পাখিটা? পাখিটা কোথায় গেল?

লোকটা জবাব দিলে না। ঠোঁটে সেই অদ্ভুত হাসি জাগিয়ে রেখেই খানিকক্ষণ

তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপরে বললে, খাও।

একটা আঙুর তুলে আমি মুখে দিলুম। কী মিষ্টি! এমন আঙুর আমি জীবনে খাইনি! তারপরে আর একটা—আরো একটা—আরো একটা—

হঠাৎ আমার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। তক্ষুনি লোকটা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। তার পরেই মনে হল, অত্যন্ত নরম বিছানায় যেন আমাকে শুইয়ে দিয়েছে।

শুধু থেকে থেকে মনে হচ্ছিল, বিছানাটা দোলনার মতো দুলছে। যেন একরাশ সমুদ্রের ফেনার মধ্যে আমি শুয়ে আছি আর ঢেউগুলো দোলাতে দোলাতে নিয়ে চলেছে আমাকে। একটা চাপা গর্জনও শুনতে পাচ্ছি কোথায়। সমুদ্রের, না ট্রেনের?

গত বছর আমরা পুরীতে গিয়েছিলুম।

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমার ঘুম ভাঙল। কে যেন কাঁধ ধরে আমাকে ঝাঁকাচ্ছে।

চোখ মেলে প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। চারিদিকে লোক—তিন-চারজন লালপাগড়ি পুলিশ—একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। কাটীহার জংশন।

ছোট কাকা আমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে সমানে।—কোন নেশার জিনিস খাইয়েছে নিশ্চয়।—দেখুন তো মশাই, কাছাকাছি ডাক্তার পাওয়া যায় কি না।

বাবার গলা। এবার আর কিছু দেখতে বাকি নেই আমার। একটা বেঞ্চির ওপর বসে আছি আমি। বাবা, ছোটকাকা, অসংখ্য লোক—পুলিশ। আমার পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে সেই লোকটাই। বাদামি রঙের দাড়ি—একরাশ তুলোর মতো শাদা শাদা চুল, সেই অষ্টাবক্র লাঠি, সেই ঝোলাটা। দাড়ির একটা দিক তার লাল হয়ে গেছে—নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। প্রচণ্ড প্রহারের ফল।

পরের ট্রেনে আমরা পূর্ণিয়া ফিরে এলুম।

সন্ধ্যাবেলায় জোড়া মণ্ডার হরির লুট। একমাস ধরে বাড়িতে ছেলে ধরার নানা রোমাঞ্চকর গল্প। দু-মাস ধরে চাকরের কড়া পাহারা।

বড় হওয়ার পরে এক বন্ধু বুঝিয়ে দিলেন, ওর নাম হিপনোটিজম। ওই পাখি, পাকা আঙুর...সব মায়া।

কিন্তু হিপনোটিজম? নানা দুঃখে ভরা আজকের এই বিড়ম্বিত জীবনে সে কথা মানতে আমার ইচ্ছে হয় না। রূপকথার জগৎটা হয়ত মিথ্যে নয়—শুধু সেখানে পৌঁছবার চাবিকাঠিটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এক-আধজন হয়ত আজও সেই স্বপ্নলোকের সন্ধান জানে...হয়ত তাদেরই একজনের দুর্লভ আবির্ভাব সেদিন ঘটেছিল।

কিন্তু এ কথা সেদিন কেউই বিশ্বাস করতেন না। বাবা, ঠাকুরমা, ছোটকাকা... কেউই নয়।

আজকের এই এত বাস্তব দুঃখ-বেদনার ভেতরে এ কাহিনী তোমরাই কি বিশ্বাস করবে?

www.boiRboi.blogspot.com

জয়দ্রথ বধ

অর্জুন এসে আমাকে বললে, চল্ প্যালা, জয়দ্রথ বধ করে আসা যাক।

শুনেই আমি চমকে গেলুম। কারণ অর্জুন নিতান্তই কিছু আর মহাভারতের অর্জুন নয়—সে আমাদের পটলডাঙার মিত্র স্কুলের 'পিলার'—মানে ক্লাস টেনে তিন-বার ফেল্ করে থামের মতো পাকাপোক্ত হয়ে আছে। আমাদের হেডমাস্টার মশাই তাকে ডাকেন খর্জুর বলে। অর্জুন অবশ্য খর্জুর খেতে ভালোই বাসে, কিন্তু ওই খাদ্যবস্তুটি হতে তার নিজের একটু আপত্তি আছে।

এহেন খর্জুর, খুড়ি, অর্জুন জয়দ্রথ বধ করতে চায় শুনে আমার কেমন যেন বিষম লেগে গেল।

অর্জুন বললে, হাঁ করে আছিস্ কেন? আমি কি তোর মুখে রসগোল্লা দিতে চেয়েছি নাকি?

আমি বললুম, না, প্রাণে ধরে কাউকে কোনো দিন তুই রসগোল্লা দিতে পারবি এ অপবাদ তোর সব চেয়ে শত্রু—মানে হেডমাস্টার মশাইও দিতে পারবেন না। কিন্তু তুই এই কলিকালে জয়দ্রথকে পাবিই বা কোথা, আর বধ করবিই বা কেমন করে?

অর্জুন বললে, ধ্যাৎ, তুই কোনো কাজের নোস্। খালি পেট ভর্তি পালাজ্বরের পিলে নিয়ে পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলই খেতে পারিস। আরে আমি বলছি দিকপাল সাহিত্যিক জয়দ্রথ বোসের কথা—যে ভদ্রলোক তিনশো তিপ্পান্নখানা উপন্যাস লিখেছেন।

আমি বললুম, তা খামোকা তাঁকে বধ করবি কেন? আমি তো তাঁর খানপাঁচেক বই পড়েছি—নেহাৎ খারাপ তো লেখেন না। তাঁর সেই যে বইটাতে বাঙালী ডিটেক্-টিভ্ হিমাদ্রিপ্রসাদ সাবমেরিন নিয়ে চীনে দস্যু চুং চাংকে প্রশান্ত মহাসাগরের ত্রিশ হাজার ফুট জলের তলায় গ্রেপ্তার করেছিল—সেটা তো দারুন থ্রীলিং। তা ছাড়া তাঁকে যে বধ করতে যাচ্ছিস্, গায়ের জোরে কি পারবি? একটা মিটিঙে আমি তাঁকে দেখেছি। বিরাট মোটা—আয়সা ভুঁড়ি—

অর্জুন বললে, ধ্যাৎ, তুই জ্বালালি। তোর মাথার ভেতরে তুরপুন চালালে গোবরও বেরুবে না, বেরুবে ছাগলের নাদি! আরে সে বধ নয়। আজকাল বিনি পয়সায় লেখকদের কাছ থেকে বই বাগাচ্ছি আমি। এবার জয়দ্রথ বোসের পালা।

—বিনি পয়সায় লেখকরা বই দেন তোকে?—আমার রোমাঞ্চ হল: তুই বুঝি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ধরপাকড়—কান্নাকাটি, এই সব করিস?

—ধরপাকড়, কান্নাকাটি করব আমি—ছোঃ!—অর্জুন তার খর্জুরবৃক্ষের মতো ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বললে, আমি অর্জুন শিকদার—বুদ্ধির জোরেই ম্যানেজ করে নিই।

কাতর হয়ে বললুম, সেই বুদ্ধির একটু আমায়ও দে না ভাই। আমিও না হয় খানকয়েক বই ম্যানেজ করব।

অর্জুন বললে, হবে—হবে। চল্ আমার সঙ্গে। দেখবি আমার কায়দাটা। এরি জোরে ভস্মলোচনবাবুর মতো খিট্‌খিটে লোক—যার বাড়ির সামনে দিয়ে কুকুর পর্যন্ত

হাঁটতে ভয় পায়—সেই ভস্মলোচন পর্যন্ত আমায় চার-খানা বই দিয়েছে।

—সত্যি?

—সত্যি কিনা নিজের চোখেই দেখবি। কিন্তু খবর্দার—একটা কথা বলবি না। আমি যা বলব—যা করব, সব দেখে যাবি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়বি—ব্যাস্। বুঝেছিস্ তো! রাজী?

জয়দ্রথ বোস চেয়ারের ওপর উবু হয়ে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। আমরা ঢুকতেই বললেন, কী চাই?

অর্জুন আমায় চোখ টিপলে। তারপর বললে, আমরা বিউটি পিকচার্স কোম্পানী থেকে আসছি স্যার! আপনার বই ফিলিম করব। আমার নাম অর্জুন শিকদার—ফিলিম ডিরেক্টার, আর এ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্যালারাম ব্যানার্জী।

জয়দ্রথবাবু বললেন, বসুন বসুন।

এদিকে ফিলিম ডিরেক্টার ফিরেক্টার শুনেই তো আমার ভির্মি লাগবার জো! কী একটা বলে ফেলতে যাচ্ছি, অর্জুন পেছনে হাত নিয়ে কটাং করে আমায় চিমটি কাটলে। আর আমি তখুনি মুখ বুজে একটা চেয়ারে বসে পড়লুম।

জয়দ্রথ বললেন, তা আমার কী বই ফিলিম করতে চান?

—আজ্ঞে চারখানা বই নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে—'রক্তমাখা তক্তপোশ', 'টিকি-সহ ছিন্নমুণ্ড', 'শ্যাওড়া বনের হাতছানি' আর একখানা 'উকুনপুরের জোড়া খুন'। বই চারখানা যদি একবার আমাদের পড়তে দেন—

জয়দ্রথবাবু যেন মুখিয়েই ছিলেন। বললেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ আর বেশি কথা কী! এখুনি দিচ্ছি।

থেলো হুঁকো রেখে জয়দ্রথ বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দে অর্জুনের চোখ মিটমিট করতে লাগল।

—দেখলি? এই হচ্ছে আমার কায়দা। ফিলিমের নাম শুনলে টাকার লোভে লেখকদের আর মাথার ঠিক থাকে না। এই করে কত বই আমি বাগিয়েছি—

—কিন্তু লেখকদের সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়? পথে দেখে যদি চেপে ধরে?

—ইঃ, ধরলেই হল? বললেই হবে—না স্যার, শেষ পর্যন্ত বই পছন্দ হল না। ব্যাস্।

চটির চটাপট আওয়াজ করতে করতে জয়দ্রথ ফিরে এলেন। তারপর চারখানা বই অর্জুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন। তা ফিলিম করছেন কবে?

—খত শিগগির পারি।—একগাল হেসে অর্জুন বললে, তিন-চার দিনের মধ্যেই খবর দেব! আজ তা হলে উঠি?

জয়দ্রথ বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যান।—বলেই ড্রয়ার থেকে একটা লম্বা মতন কাগজ বের করে বললেন, এর তলায় একটা সই করে দিন। আর ঠিকানাটাও লিখে দিন।

—সই কেন?—একটু যেন ঘাবড়েই গেল অর্জুন।

—কিছু না—কিছু না—আমার বাড়িতে মান্যি-গণ্যি কেউ এলে আমি তাঁদের অটোগ্রাফ রাখি। হ্যাঁ—ঠিকানাটাও দেবেন।

—ও এই কথা!—এক গাল হেসে অর্জুন তখুনি তার তলায় সই করে দিলে।

আমি অবিশ্যি অটোগ্রাফ খাতা অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম লম্বা কাগজে

www.boiRboi.blogspot.com

কাউকে অটোগ্রাফ নিতে দেখিনি। আবার কাগজটার মাথার ওপর টিকিট-ফিকিটের মতো কী সব ছাপা। কে জানে—বড় লেখকদের অটোগ্রাফের কাগজ হয়তো ওই রকমই হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে অর্জুন প্রায় চার-পা তুলে লাফাতে লাগল : দেখলি—দেখলি তো প্যালা! কেমন মোক্ষম কায়দাটা! মুখের কথা পড়তে না পড়তেই চার-চারখানা বই। এমনি চাইলে তো দিতই না—বলত, কিনে নিয়ে পড়ো গে। দ্যাখ—খাতির করে বই তো দিলই—সঙ্গে সঙ্গে ডটের মাথায় অটোগ্রাফও দিয়ে এলুম।

আমি বললুম, কিন্তু নিজের ঠিকানা দিয়ে আসিস্ নি তো?

—পাগল! অত কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ আমাকে? যা মনে এসেছে তাই লিখে দিলুম : ৫।৭।২ বাদুড়বাগান বাই লেন—এই যাঃ—ওটা যে রাঙা পিসের ঠিকানা!

বললুম, সর্বনাশ করেছিস্! যদি ওখানে খুঁজতে যায়?

অর্জুন বললে, ক্ষেপেছিস্? সময় আছে নাকি লেখকদের? ঠিকানাই যদি খুঁজে বেড়াবে, তা হলে তিনশ তিপ্পান্নখানা উপন্যাস লিখবে কখন? তা ছাড়া সে আয়সা গলি যে সাতদিনেও বের করতে পারবে না। আচ্ছা প্যালা—গুড্‌নাইট। চলি। টা—টা—

আমি বললুম, বা-রে! চারটে বই বাগালি, একটা আমায় পড়তে দিবি না? অন্তত 'উকুনপুরের জোড়া খুন'টা—

নাক কুঁচকে অর্জুন বললে, যা—যা! ইচ্ছে হয়, পয়সা দিয়ে কিনে পড় গে। বলেই বিশ্বাসঘাতক এক লাফে সামনের একটা দোতলা বাসে উঠে পড়ল।

ঠিক দশদিন পরে অর্জুন এসে হাজির হাউ-হাউ করতে করতে।

—প্যালারে, আমি গেলুম!

—কী হয়েছে?

—ওই জয়দ্রথ বোস! দু হাজার টাকার দাবিতে উকিলের চিঠি দিয়েছে রাঙা পিসের ঠিকানায়। রাঙা পিসে সেটা আবার পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের ঠিকানায়। আর বাবা সেটা খুলে পড়েছে!

—অ্যাঁ! চারটে বইয়ের দাম দু হাজার টাকা!

—আরে বইয়ের নয়, ফিলিমের! ওই যে আমাকে দিয়ে অটোগ্রাফ সই করাল না? ওটা স্রেফ শয়তানি—আমি কি জানি ওকে স্ট্যাম্প কাগজ বলে? সেই কাগজে আমি নাকি লিখেছি—এই চারখানা বই আমি ফিলিমের জন্য আট হাজার টাকার চুক্তি করেছি আর আগাম বাবদ দু হাজার টাকা এক হপ্তার মধ্যেই দেব। সে টাকা দিইনি বলেই এই উকিলের চিঠি!

—অ্যাঁ!

অর্জুন চিঁ চিঁ করে বলতে লাগল—বাবা হান্টার নিয়ে তাড়া করেছিল, কোনো মতে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এখন কী করি বল তো প্যালা—বাড়ি ফিরব কেমন করে?

মহাভারতের অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছিল, কিন্তু কলির জয়দ্রথ অর্জুনকেই বধ করে ফেলেছে! আমি তাকিয়ে দেখলুম, অর্জুনের মুখটা এখন ঠিক খর্জুরের, মানে একতাল পিণ্ডিখেজুরের মতোই দেখাচ্ছে।

কম্বল নিরুদ্দেশ

এক

অনেক ভেবে চিন্তে চারজন শেষ পর্যন্ত বদ্রীবাবুর 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রিন্টিং হাউসে' ঢুকে পড়লুম। নাম যতই জাঁদরেল হোক, প্রেসের ভেতরটায় কেমন আবছা অন্ধকার। এই দিনের বেলাতেও রামছাগলের ঘোলাটে চোখের মতন কয়েকটা হলদে হলদে ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বলছিল এদিকে ওদিকে; পুরোনো কতকগুলো টাইপ-কেসের সামনে ঝুঁকে পড়ে ঘষা কাচের মতো চশমা পরা একজন বুড়ো কম্পোজিটার চিমটে দিয়ে অক্ষর খুঁটে খুঁটে 'গ্যালি' সাজাচ্ছিল; ওধারে একজন ঘটাং ঘটাং করে প্রেসে কী ছেপে যাচ্ছিল, উড়ে পড়ছিল নতুন ছাপা হওয়া কাগজ—আর একজন তা গুছিয়ে রাখছিল। পুরোনো নোনাধরা দেওয়াল, কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশ রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে বসে একজোড়া আরশোলা বোধ হয় ছাপার কাজই তদারক করছিল, হাত কয়েক দূরে পেটমোটা একটা টিকটিকি জ্বলন্ত চোখে লক্ষ্য করছিল তাদের। ঘরময় কালির গন্ধ, কাগজের গন্ধ, নোনার গন্ধ, আর তারই ভেতরে টেবিল চেয়ার পেতে, খাতা-কাগজপত্র—কালি কলম—টেলিফোন এই সব নিয়ে বদ্রীবাবু একমনে মস্ত একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি থেকে তেলমাখা মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা খাচ্ছিলেন।

টেনিদা আর হাবুলের পাল্লায় পড়ে বদ্রীবাবুর প্রেসে ঢুকে পড়েছি, নইলে আমার এখানে আসবার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। ক্যাবলারও না। আমরা দুজনেই প্রতিবাদ করে বলেছিলুম, 'কী দরকার? যাদের বাড়ীর ছেলে, তাদের যখন কোনো গরজ নেই, আমরা কেন খামোকা নাক গলাতে যাই?'

কিন্তু টেনিদার নাকটা একটু বেয়াড়া রকমের লম্বা আর লম্বা নাকের মুসকিল এই যে পরের ব্যাপারে না ঢোকালে সেটা সুড়সুড় করতে থাকে। টেনিদা খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'বা-রে, তাই বলে পাড়ার একটা জলজ্যান্ত ছেলে দুম করে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে?'

'হয়ে যাক না'—ক্যাবলা খুশি হয়ে বললে, 'অমন ছেলে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকলেই পাড়ার লোকের হাড় জুড়োয়। কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেবে, গোরুর পিঠে আছড়ে পট্‌কা ফাটাবে, বেড়ালছানাকে চৌবাচ্চার জলে চুবোবে, গরীব ফিরিওলার জিনিস হাতসাফাই করবে, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে অকারণে মারধোর করবে, ঢিল ছুঁড়ে লোকের জানলার কাচ ভাঙবে—ও আপদ একেবারেই বিদায় হয়ে যাক না। হনোলুলু কিংবা হন্ডুরাস যেখানে খুসি যাক, মোদ্দা পাড়ায় আর না ফিরলেই হল।'

শুনে নাকটাকে ঠিক বাদাম বরফির মতো করে, টেনিদা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ক্যাবলার দিকে। তারপর বললে, 'ইস্-স, কী পাষাণ প্রাণ নিয়ে জন্মেছিস ক্যাবলা! তুই শুধু পরীক্ষাতেই স্কলারশিপ পাস কিন্তু মায়া-দয়া কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। না হয় কম্বল এক আধটু দুষ্টুমি করেই, তাই বলে একটা নিরীহ

www.boiRboi.blogspot.com

শিশুকে—'

'নিরীহ শিশু।'—ক্যাবলা বললে, 'দুবার ক্লাস সেভেনে ডিগবাজী খেল, তলা থেকে ও শক্ত হয়ে আসছে—এখনো শিশু! তা হলে দেড় হাত দাড়ি গজানো পর্যন্তও কম্বল শিশুই থাকবে, ওর বয়েস আর বাড়বে না। আর নিরীহ। অমন বিচ্ছু, অমন বিটলে, অমন মারাত্মক—'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মারাত্মক বলে মারাত্মক। কম্বলকে সাধুভাষায় সর্বার্থ-সাধক, কিঙ্কিঙ্ক, ডিণ্ডিম, এমন কি সুপসুপা সমাস বললেও অন্যায় হয় না। এই তো সেদিন পয়লা বোশেখে আমায় বললে, প্যালাদা, তোমায় একটা নববর্ষের পেন্নাম করব। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, ব্যাপারটা কী, কম্বলের অত ভক্তি কেন—আর ভাবতে ভাবতেই পেন্নামের নাম করে আমার দুপায়ে বিছুটির পাতা ঘষে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। তারপর একঘন্টা ধরে আমি দাপিয়ে মরি। ও রকম বহুব্রীহি-মার্কা ছেলের চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হওয়াই ভালো—আমি ক্যাবলার কথায় ভিটো দিচ্ছি।'

টেনিদা রেগে বললে, 'শাটাপ্! ফের কুরুবকের মতো বক বক করবি, তা হলে এক এক চড়ে কানগুলো কানপুরে পাঠিয়ে দেব।'

হাবুল অনেকক্ষণ ধরে একমনে কী যেন খাচ্ছিল, মুখটা বন্ধ ছিল তার। এতক্ষণে সেটাকে সাবাড় করে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কানগুলান্ কর্ণাটেও পাঠাইতে পারো।'

'তাও পারি। নাক নাসিকে পাঠাতে পারি, দাঁত দাঁতনে পাঠাতে পারি, আরো অনেক কিছুই পারি। আপাততঃ কেবল ওয়ার্নিং দিয়ে রাখলাম। ক্যাবলা—প্যালা—নো তর্ক, ফলো ইয়োর লীডার—মার্চ।'

ক্যাবলা গোঁজ হয়ে রইল, আমি গোঁ গোঁ করতে লাগলুম। হাবুল আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আরে, না হয় দিছেই তর্ পায়ে বিছুটি ঘইষ্যা—তাতে অত রাগ করস ক্যান? ক্ষমা কইরা দে। ক্ষমাই পরম ধর্ম—জানস না?' শুনে আমি হাবুলের কানে কুটুস করে একটা চিম্‌টি দিলুম—হাবুল চ্যাঁ করে উঠল।

আমি বললুম, 'রাগ করিসনি হাবলা, ক্ষমাই পরম ধর্ম—জানিস না?'

টেনিদা বললে, 'কোয়ায়েট। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটির কোনো মানে হয় না। এখন অতি কঠিন কর্তব্য আমাদের সামনে। আমরা বদ্রীবাবুর ওখানে যাব। গিয়ে তাঁকে জানাব যে কম্বলকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

ক্যাবলা কান চুল্‌কে বললে, 'কিন্তু তিনি তো আমাদের সাহায্য চান নি।'

'আমরা উপযাচক হয়ে পরোপকার করব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু বদ্রীবাবু যদি আমাদের তাড়া করেন?'

ভুরু কুঁচকে টেনিদা বললে, 'তাড়া করবেন কেন?'

'বদ্রীবাবু সকলকে তাড়া করেন। দরজায় ভিখিরী গেলে তেড়ে আসেন, রিক্‌শা-ওলাকে কম পয়সা দিয়ে ঝগড়া বাধান—তারপর তাকে তাড়া করেন, ঝি-চাকরকে দু-বেলা তাড়া করেন, বাড়ির কার্ণিশে কাক বসলে তাকে—'

টেনিদা এবার ঠুকুস করে আমার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে।

'ওফ্—এই কুকুরটার মুখ তো কিছুতেই বন্ধ হয় না। আমরা ভিখিরী, না রিক্‌শাওলা, না দাঁড়কাক, না ও'র ঝি-চাকর? যাচ্ছি উবগার করতে, ভদ্রলোক আমাদের তেড়ে আসবেন? কী যে বলিস তার ঠিক নেই। পাগল, না পেট খারাপ?'

'প্যাটই খারাপ'—হাবুল মাথা নেড়ে বললে. 'চিরটাকালই দেখতাছি প্যাট নিয়াই

প্যালার যত ন্যাটা।'

টেনিদা বললে, 'চুলোয় যাক ওর পেট। এখানে বসে আর গুলতানি করে দরকার নেই—নাউ টু অ্যাক্‌শন। চলো এবার বদ্রীবাবুর কাছেই যাওয়া যাক।'

আমরা কেন এসেছি, 'বদ্রীবাবু সে কথা শুনলেন। প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখে মুড়ির বাটিটা একটু একটু করে সাবাড় করলেন, শেষে আধখানা কাঁচা লঙ্কা কচমচ করে চিবিয়ে খেলেন। তারপর কোঁচায় মুখ মুছে বললেন, 'হুঁ।'

টেনিদা বললে, 'কম্বলকে খোঁজবার জন্যে আপনি কী করছেন?'

বদ্রীবাবু খ্যারখেরে মোটা গলায় বললেন, 'আমি আবার কী করব? কী-ই-বা করার আছে আমার?'

হাবুল বললে, 'হাজার হোক, পোলাডা তো আপনার ভাইপো।'

'নিশ্চয়।'—বদ্রীবাবু মাথা নাড়লেন: 'আমার মা-বাপ মরা একমাত্র ভাইপো, আমারও কোনো ছেলেপুলে নেই। আমার প্রেস, পয়সা কড়ি—সবই সে পাবে।'

'তবু আপনি তাকে খুঁজবেন না?'—টেনিদা জানতে চাইল।

'কী করে খুঁজব?'—বদ্রীবাবু হাই তুললেন।

'কেন, কাগজে বিজ্ঞাপন তো দিতে পারেন।'

'কী লিখব? বাবা কম্বল, ফিরিয়া আইস? তোমার খুড়ীমা তোমার জন্য মৃত্যু শয্যায়? ঠিকানা দাও—টাকা পাঠাইব? সে অত্যন্ত ঘোড়েল ছেলে। ঠিকানা দেবে, আমি টাকা পাঠাব—টাকাও সে নেবে, কিন্তু বাড়ি ফিরবে না।'

'কেন ফিরবে না?'—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

তার কারণ—বদ্রীবাবু একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁতের গোড়া খুঁটতে খুঁটতে বললেন, দু-দুবার ক্লাস সেভেনে ফেল করায় আমি তার জন্যে যে মাস্টার এনেছি, সে নামকরা কুস্তিগীর। তার হাতের একটা রদ্দা খেলে হাতি পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়। কম্বল স্বেচ্ছায় আসবে না। মাস্টার নিরুদ্দেশ না হলে তার উদ্দেশ মিলবে বলে আমার মনে হয় না।

আপনে থানায় খবর দিলেন না ক্যান?—হাবুল বললে, তারা ঠিক—

'থানা?'—বদ্রীবাবু একটা বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেললেন: মাস দুই আগে আমার প্রেসের কিছু টাইপ চুরি হয়ে গিয়েছিল, আমি থানায় গিয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল কম্বল। দারোগা এজাহার নিচ্ছিলেন, টেবিলের তলায় তাঁর পেয়ারের কুকুরটা ঘুমুচ্ছিল। কম্বল নীচু হয়ে কী করছিল কে জানে, কিন্তু হঠাৎ একটা বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। বিকট সুরে ঘ্যাও-ঘ্যাও আওয়াজ ছেড়ে কুকুরটা একলাফে টেবিলে উঠে পড়ল, আর এক লাফে চড়ল একটা আলমারীর মাথায়, সেখান থেকে একরাশ ধুলোভরা ফাইল নিয়ে নীচে আছড়ে পড়ে গেল। একজন পুলিশ তাকে ধরতে যাচ্ছিল—ঘোয়াঙ বলে তাকে কামড়ে দিয়ে—ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজা দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল কুকুরটা। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। এজাহার চুলোয় গেল, থানায় হুলুস্থুল কাণ্ড—পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো বলে দারোগা কুকুরের পেছনে ছুটলেন। কী হয়েছিল জানো?

বদ্রীবাবু একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। ক্যাবলা বললে, 'কী হয়েছিল?'

কম্বল পকেটে হোমিওপ্যাথিক শিশিতে ভর্তি করে লাল পিঁপড়ে নিয়ে গিয়েছিল আর সেগুলো ঢেলে দিয়েছিল কুকুরটার কানে। দারোগা কম্বলকে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তাকে কিংবা আমাকে থানার কাছা-

www.boiRboi.blogspot.com

কাছি দেখলেও পুরোপুরি সাতদিন হাজতে পুরে রেখে দেবেন।'

টেনিদা বললে, 'আপনার কী দোষ? আপনি তো আর কুকুরের কানে পিঁপড়ে দেননি।'

'কিন্তু দারোগার ধারণা, মলটা আমিই দিয়েছি কম্বলের কানে। অভিভাবকের কাছ থেকেই তো ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়।'

'হুঁ, তা হলে আপনার থানায় যাবার পথ বন্ধ'—টেনিদা মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা, আমরা যদি আপনার হয়ে—'

বাধা দিয়ে বদ্রীবাবু বললেন, কিছু করতে হবে না। আমি জানি, কম্বলকে আর পাওয়া যাবে না। সে যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর ফিরে আসবে না।

'কী সর্বনাশ!'—আমি আঁতকে বললুম, 'মারা গেছে নাকি?'

'মারা যাওয়ার পাত্র সে নয়।'—বদ্রীবাবু কান থেকে একটা বিড়ি নামিয়ে ফস করে সেটা ধরালেন : 'সে গেছে দূরে—বহু দূরে।'

হাবুল বললে, কই গেছে? দিল্লী?

'দিল্লী!'—বদ্রীবাবু বললেন, ফুঃ!

'তবে কোথায়?'—টেনিদা বললে, বিলেতে? আফ্রিকায়?

এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে বদ্রীবাবু বললেন, 'না, আরো দূরে। ছেলেবেলা থেকেই তার সেখানে যাওয়ার ন্যাক্ ছিল। সে গেছে চাঁদে।'

'কী বললেন?'—চারজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম আমরা।

'বললুম কম্বল চাঁদে গেছে'—এই বলে বদ্রীবাবু আমাদের হাবাচ্যাকা মুখের ওপর একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন।

দুই

আমরা চারজন বদ্রীবাবুর কথা শুনে পরোটার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর টেনিদার উঁচু নাকটা ঠিক একটা ডিম ভাজার মতো হয়ে গেল। বদ্রীবাবু আমাদের ঠাট্টা করছেন কিনা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অমন হাঁড়ির মতো যাঁর মুখ আর বিতিকিচ্ছির তিরিক্ষি যাঁর মেজাজ—এই ঝুপসী প্রেসটার ভেতরে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো বসে বসে আর কচর মচর করে করে মুড়ি চিবুতে চিবুতে তিনি আমাদের ঠাট্টা করবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

ঠিক সেই সময় প্রেসের পেছন দিকে, বদ্রীবাবুর রান্না ঘর থেকে কড়া রসুন আর লঙ্কার ঝাঁঝের সঙ্গে উৎকট গন্ধ ভেসে এল একটা, খুব সম্ভব শুঁটকি মাছ। সে গন্ধ এমনি জাঁদরেল যে আমরা চার জনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম—আমাদের ঘোর কেটে গেল।

টেনিদা একবার মাথা চুলকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলছেন স্যার, কম্বল চাঁদেই—'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আই অ্যাম শিয়োর।'

ক্যাবলা তার চশমার ভেতর দিয়ে প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গত বছর চশমা নেবার পর থেকেই ওকে খুব ভারিক্কি গোছের দেখায়। মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বললে, 'আপনি এত শিয়োর হলেন কী করে, জানতে পারি কি? যে চাঁদে রাশিয়ানরা এখনো যেতে পারল না, আমেরিকানরাও আজ পর্যন্ত—'

'ওরা না পারলেও কম্বল পারে'—সংক্ষেপে জবাব দিলেন বদ্রীবাবু।

www.boiRboi.blogspot.com

রান্না ঘর থেকে শুঁটকি মাছের সেই বিকট গন্ধটা আসছিল, তাতে নাক-টাক কুঁচকে বেজায় রকম একটা হাঁচতে যাচ্ছিল হাবুল। কী কায়দায় যে ও হাঁচিটাকে সামলে নিলে আমি জানি না। বিচ্ছিরি মুখ করে কেমন একটা ভুতুড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলে : ডানা আছে বুঝি কম্বলের? উইড়া যাইতে পারে?

'আমি ঠিক বলতে পারব না।' বদ্রীবাবু ভাবুকের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলেন : তবে ও যা ছেলে, ওর এত দিনে যে ডানা গজায় নি এ কথাও আমি বিশ্বাস করি না। খুব সম্ভব জামার তলায় ওর ডানা লুকোনো থাকত—আমি দেখতে পাইনি।

'তা হলে আপনি বলছেন' টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, 'সেই ডানা মেলে কম্বল পরীদের মতো উড়ে গেছে?'

'এগজ্যাক্টলি।'

ক্যাবলা বিড়বিড়িয়ে বললে, 'গাঁজা। ক্লীন গাঁজা।'

'তুমি ওখানে হুড়মুড় করে কী বলছ হে ছোক্রা?' বদ্রীবাবুর চোখ চোখা হয়ে উঠল, বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন : কী বকছ—অ্যাঁ?

'কিছু না স্যার—কিছু না।' হাবুল সেন চটপট সামলে নিলে : কইতাছিল—আহা, কী মজা।

'মজা বই কি, দারুণ মজা,' বদ্রীবাবুর প্যাঁচার মতো প্যাঁচালো মুখে এবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল : 'জানো, ছেলেবেলা থেকেই ওর চাঁদের দিকে ঝোঁক। পাঁচ বছর বয়সে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে 'চাঁদ খাব, চাঁদ খাব' বলে পেল্লায় চিৎকার জুড়ল—রাত দুটো পর্যন্ত পাড়ার লোকে ঘুমুতে পারে না। শেষে পুরো একখানা পাটালি খাইয়ে ওকে থামাতে হয়। বারো বছরের সময় চাঁদ ধরবার জন্যে একটা নিমগাছে উঠে বাদুড়ের ঠোকর খেয়ে পানা পুকুরের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল—ভাগ্যিস বেশি জল ছিল না তাই রক্ষে। তারপর বড়ো হয়ে চাঁদা আদায় করতে ওর কী উৎসাহ! সরস্বতী পুজো হোক, ঘেঁটু পুজো হোক আর ঘণ্টাকর্ণ পুজোই হোক—চাঁদার নাম শুনলেই স্রেফ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সেই জন্যেই বলছিলুম, চাঁদ সম্পর্কে ওর বরাবরই একটা ন্যাক্ আছে।'

'চাঁদের ব্যাপারে ন্যাক্ অনেকেরই থাকে, সেটা কিছু নতুন কথা নয়'—টেনিদা একবার গলাখাঁকারি দিলে : 'কিন্তু আমরা যদি কম্বলকে খুঁজে বের করতে পারি, আপনার কোনো আপত্তি আছে বদ্রীবাবু?'

'খুঁজে বের করতে পারলে আপত্তি নেই, না পারলেও আপত্তি নেই।' বদ্রীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু পয়সা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। তোমরা যে গোয়েন্দাগিরির ফী চেয়ে বসবে সেটি হচ্ছে না। সেইটে বুঝে তাকে চাঁদ থেকেই ধরে আনো, কিংবা চাঁদোয়ার ওপর থেকেই টেনে নামাও।'

'আজ্ঞে, কিছুই দিতে হবে না' টেনিদা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, 'একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না আপনাকে। শুধু একটু সাহায্য করতে হবে অন্য ভাবে।'

'পয়সা খরচ না হলে আমি সব রকম সাহায্যেই রাজী আছি তোমাদের।' এবার বেশ উৎসাহিত দেখা গেল বদ্রীবাবুকে : বলো কি করতে হবে।

টেনিদা একবার ক্যাবলার দিকে তাকালো। বললে, 'ক্যাবলা?'

'ইয়েস্ লীডার।'

'আমরা বদ্রীবাবুর কাছ থেকে কী সাহায্য পেতে পারি?'

ক্যাবলা বললে, 'উনি আমাদের কিছু দরকারী ইনফর্মেশন দিতে পারেন।'

'জেনে নাও।' টেনিদা এর মধ্যেই বদ্রীবাবুর সামনে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসে পড়েছিল। এবারে গম্ভীর হয়ে পা নাচাতে লাগল।

ক্যাবলা তার চশমাপরা ভারিক্কী মুখে এমন ভাবে চারদিকে তাকালো যে ঠিক মনে হল যেন ইন্‌সপেক্টর স্কুল দেখতে এসেছেন। তারপর মোটা গলায় বললে, 'আচ্ছা বদ্রীবাবু!'

'হুঁ।'

'নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে আপনি কোনো রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন কম্বলের?'

ক্যাবলার সেই দারুণ সীরিয়াস ভঙ্গি আর মোটা গলা দেখে আমার তাজ্জব লেগে গেল। হাঁ, পুলিশে ঠিক এমনি ভাবেই জেরা-টেরা করে বটে। এমন কি, বদ্রীবাবুও যেন ঘাবড়ে গেলেন খানিকটা।

'ইয়ে—ভাবান্তর—মানে হ্যাঁ, একটু ভাবান্তর হয়েছিল বই কি। অমন একখানা জাঁদরেল মাস্টার দেখলে কেই বা খুশি হয় বলো। তার একটা ঘুষিতেই কম্বল তেঁতুলের অম্বল হয়ে যেত।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে ঘুষি কম্বল খায় নি?'

'খেপেছ তুমি!' বদ্রীবাবু মুখ বাঁকালেন : খেলে কি আর চাঁদে যেত? স্বর্গে পৌঁছুত তার আগে। আসলে মাস্টার প্রথম দিন এসে খুব শাসিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কাল এসে যদি দেখি যে পড়া হয় নি, তা হলে পিটিয়ে তোকে ছাতু করে দেব।

হাবুল বললে, 'অ—বুঝছি। পলাইয়া আত্মরক্ষা কোরছে।'

'তা ওভাবেও বলতে পারো কথাটা। পালিয়েছে মাস্টারের ভয়েই, তাতে সন্দেহ নেই।' বদ্রীবাবু হাবুলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন: 'এবং পালিয়ে সে চাঁদে গেছে।'

টেনিদা দারুণ বিরক্ত হয়ে বললে, 'দেখুন বদ্রীবাবু, সব জিনিসের একটা লিমিট আছে। চাঁদে গেলেই হল—ইয়ার্কি নাকি? আর এত লোক থাকতে কম্বল? সব জিনিস পাটালি খাওয়া নয়, তা মনে রাখবেন।'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।'

'বটে'—আমার ভারী উৎসাহ হল : 'কী প্রমাণ পেয়েছেন? টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের ভেতরে কম্বলকে লাফাতে দেখেছেন নাকি?'

'টেলিস্কোপ আমার নেই।' বদ্রীবাবু হাই তুলে বললেন, 'কিন্তু যা আছে তা এই প্রমাণই যথেষ্ট' বলে বদ্রীবাবু এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলেন আমাদের সামনে।

এক্‌সারসাইজ বুকের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর শ্রীমান কম্বল তাঁর দেবাক্ষর সাজিয়েছেন। প্রথমে মনে হল, কতগুলো ছাতারে পাখি এঁকেছে বোধ হয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে পাঠোদ্ধার করে যা দাঁড়াল, তা এই রকম :

'আমি নিরুদ্দেশ। দূরে—বহু দূরে চলিলাম। লোটা কম্বলও লইলাম না! আর ফিরিব না। ইতি 'কম্বলচন্দ্র।'

এই চিঠির নীচে আবার কতগুলো সাংকেতিক লেখা :

'চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল। ছল ছল খালের জল। ত্রিভুবন থর-থর। চাঁদে চড়—চাঁদে চড়।'

সেগুলো পড়ে আমরা তো থ।

বদ্রীবাবু মুচকে হেসে বললেন, 'কেমন, বিশ্বাস হল তো? চাঁদে চড়—চাঁদে চড়। নির্ঘাৎ চড়ে বসেছে। এমন কি, ইতি লিখে চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে নামের আগে, দেখতে পাচ্ছ না? তার মানে কী? মানে—স্বর্গীয় হয় নি, চন্দ্রলোকে—'

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ, নিশ্চয় চন্দ্রলোকে। তা আমরা এই লেখাটার একটা কপি পেতে পারি?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়। তাতে আর আপত্তি কী!'

ক্যাবলার হাতের লেখা ভালো, সে-ই ওটা টুকে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়ালো টেনিদা।

'তা হলে আসি আমরা। কিছু ভাববেন না বদ্রীবাবু। শিগগিরই কম্বলকে আপনার হাতে এনে দেব।'

'এনে দিতেও পারো, না দিলেও ক্ষতি নেই'—বদ্রীবাবু হাই তুললেন: 'সত্যি বলতে কি, ওটা এম্‌নি অখাদ্য ছেলে যে আমার ওর ওপরে অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করব! তোমরা কম্বলকে খুঁজে বের করতে চাও কেন? সে কি তোমাদের কারুর কিছু নিয়ে সটকান দিয়েছে?'

টেনিদা বললে, 'আজ্ঞে না, কিছুই নেয় নি। আর নেবার ইচ্ছে থাকলেও নিতে পারত না—আমরা অত কাঁচা ছেলে নই। কম্বলকে আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি নিতান্তই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে।'

'পরোপকারের জন্যে? এ-যুগেও ও-সব কেউ করে নাকি?' বদ্রীবাবু খানিকক্ষণ হাঁ করা কাকের মতো চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে : 'তোমরা তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলে। তা ভবিষ্যতে গুড্‌ ক্যারাক্টারের সার্টিফিকেট দরকার থাকলে এসো আমার কাছে, আমি খুব ভালো করে লিখে দেব।'

'আজ্ঞে, আসব বই কি'—ক্যাবলা খুব বিনীতভাবে এ-কথা বলবার পর আমরা বদ্রীবাবুর প্রেস থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় নেমে কেবল কয়েক পা হেঁটেছি, এমন সময়—

'বোঁ-ও-ও'

টেনিদার ঠিক কান ঘেঁষে কামানের গোলার মতো একটা পচা আম ছুটে বেরিয়ে গেল—ফাটল গিয়ে সামনে ঘোষেদের দেওয়ালে। খানিকটা দুর্গন্ধ কালচে রস পড়তে লাগল দেওয়াল বেয়ে। ওইটে টেনিদার মাথায় ফাটলে আর দেখতে হত না—নির্ঘাৎ নাইয়ে ছাড়ত।

তক্ষুণি আমরা বুঝতে পারলুম, কম্বলের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে আছে কোনো গভীর চক্রান্তজাল, আর এরই মধ্যে আমাদের ওপর শত্রুপক্ষের আক্রমণ সুরু হয়েছে।

তিন

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম। তারপর টেনিদা মোটা গলায় বললে, 'হুঁ উড়ুম্বর।'

'উড়ুম্বর?'—আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তার মানে কী?'

'মানে উড়ন্ত আক্রমণ—অম্বর হইতে।' টেনিদা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হতেই পারে না। আর অম্বর হইতে উড়ন্ত আক্রমণ—এ কিছুতেই উড়ুম্বরের ব্যাসবাক্য নয়। তাছাড়া উড়ুম্বর মানে—'

'শাটাপ্‌—তক্কো করবি না আমার সঙ্গে।' টেনিদা দুমদাম করে পা ঠুকল : 'আমি

www.boiRboi.blogspot.com

যা বলব তাই কারেক্ট, তাই গ্রামার। আমি যদি ক্যাবলা মিত্তির সমাস করে বলি, মিত্তির হইয়াছে যে ক্যাবলা—সুপসুপা সমাস, তা হলে কে প্রতিবাদ করে তাকে একবার আমি দেখতে চাই।'

বেগতিক বুঝে ক্যাবলা চশমাসুদ্ধ নাকটাকে আকাশের দিকে তুলে চিল-ফিল কী সব দেখতে লাগল, কোন জবাব দিলে না। হাবুল সেন বললে, 'না, তারে দ্যাখতে পাইবা না। গাট্টা খাওনের লাইগা কারই বা চাঁদি সুড় সুড় কোরতাছে? কী কস্, প্যালা, সৈত্য কই নাই?'

আমি হাবুলের মতোই ঢাকাই ভাষায় জবাব দিলুম, 'হঃ, সৈতাই কইছস।'

টেনিদা বললে, 'না, এখন বাজে কথা নয়। গোড়াতেই দেখছি ব্যাপার বেশ প্যাঁদিচ্চেরী—মানে, দস্তুরমতো ঘোরালো। অর্থাৎ কম্বল মাস্টারের থাপ্পড়ের ভয়েই পালাক আর চাঁদে চড়বার চেষ্টাই করুক, সে নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। তা না হলে একটা পচা আম অমন ভাবে আমার কান তাক করে ছুটে আসত না। বুঝেছিস, ওটা হল ওয়ার্নিং। যেন বলতে চাইছে, টেক্‌কেয়ার, কম্বলের ব্যাপারে তোমরা নাক গলাতে চেয়ো না।'

আমি বললুম, 'তা হলে আমটা ছুঁড়ল কে?'

টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল, যাকে বাংলায় বলে 'হাই ক্লাস।' তারপরে নাকটাকে কি রকম একটা ফুলকপির সিঙ্গাড়ার মতো চোখা করে বললে, 'তা যদি এখুনি জানতে পারতি রে প্যালা, তা হলে তো রহস্য কাহিনীর প্রথম পাতাতেই সব রহস্য ভেদ হয়ে যেত। যেদিন কম্বলকে পাকড়াতে পারব, সেদিন আম কে ছুঁড়েছে তা-ও বুঝতে বাকী থাকবে না।'

বললুম, 'আচ্ছা, ছাতে ওই যে কাকটা বসে রয়েছে, ওর মুখ থেকেও তো হঠাৎ আমটা—'

ক্যাবলা বললে, 'বাজে বকিসনি। কাকে এক-আধটা আমের আঁটি ঠোঁটে করে হয়তো নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অত বড়ো একটা আম তুলতে পারে কখনো? আর মনে কর, যদি ওই কাকটাকে ওয়েট্ লিফটিং চ্যাম্পিয়ান—মানে ওদের মধ্যেই—ধরা যায়, তা হলেও কি আমটা ও বুলেটের মতো ছুঁড়ে দিতে পারে?'

হাবুল ঘাড় নেড়ে বললে, 'যে কাগটা আম ফেইক্যা মারছে, সে হইল গিয়া ডিস্‌কাস্-থ্রোয়িং-এর চ্যাম্পিয়ান।'

টেনিদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার আর হাবুলের মাথা কটাং করে একসঙ্গে ঠুকে দিলে। খুব খারাপ মুখ করে বললে, 'আরে গেল যা! এদিকে দিবা-দ্বিপ্রহরে কলকাতা শহরে আমার ওপর শত্রুর আক্রমণ—আর এ দুটোতে সমানে কুরুবকের মতো বক বক করছে! শোন্—একটাও আর বাজে কথা নয়। আমটা যে আমার দিকেই তাক করে ছোঁড়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ বাড়ি থেকে ছুঁড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খামোকা আমার সঙ্গে লাগতে সাহস করবে, এমন বুকের পাটাও এ পাড়ায় কারো নেই। টেনি শর্মাকে সকলেই চেনে। অতএব প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল। সেইজন্যে মনে হচ্ছে, এখন পচা আম পড়েছে, একটু পরে ধপাৎ করে একটা পেঁপেও পড়তে পারে। আর বড়ো সাইজের তেমন-তেমন একখানা পেঁপে যদি হয়, তা হলে সে চীজ যারই মাথায় পড়ুক, আমরা কেউই অনাহত থাকব না।'

হাবুল সেন বললে, 'আর দশ কিলো ওজনের একখানা পচা কাঁঠাল পড়লে সকলেরেই ধরাশায়ী কইরা দিবো। যদি আত্মরক্ষা কোরতে চাও, অবিলম্বে এইখান থিক্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।'

www.boiRboi.blogspot.com

যুক্তিটা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আমরা আর দাঁড়ালুম না। চটপট পা চালিয়ে একেবারে চাটুজ্জেদের রকে।

টেনিদা কি বলতে যাচ্ছিল, ক্যাবলা বললে, 'না—এখানে নয়। রাস্তার ধারে বসে কোনো সীরিয়াস আলোচনা করা যায় না। চলো আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা টুরে বেরিয়েছেন, কাকা গেছেন দিল্লীতে, বেশ নিরিবিলিতে বসে সব প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

প্রস্তাবে আমরা একবাক্যে রাজী হয়ে গেলুম। সত্যিই তো, এখন আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। শত্রুর চর সব সময় আমাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে কিনা, কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া ক্যাবলার মা নানারকম খাবার করতে ভালোবাসেন, খাওয়াতেও ভালোবাসেন—তাঁকেও তো একটু খুশি করা দরকার।

তা খাওয়াটা মন্দ জমল না। ক্যাবলার মা কেক তৈরী করছিলেন, গরম গরম আমাদের কেটে এনে দিলেন। 'হট কেকে'র সঙ্গে চা টা খেয়ে আমাদের মেজাজ খুলে গেল।

টেনিদা আমাদের লীডার বটে, কিন্তু সে অ্যাক্‌শনের সময়। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি জোগাবার বেলায় ওই ক্ষুদে চেহারার ক্যাবলা মিত্তির। তা না হলে কি আর টপাটপ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায়!

ক্যাবলা প্রথমেই পকেট থেকে কম্বলের লেখার সেই নকলটা বের করল।

—'টেনিদা, এই লেখাটার মধ্যে একটা সূত্র আছে মনে হয়।'

টেনিদা বললে, 'আহা, সূত্র তো বটেই। পরিষ্কার লিখছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছি। মাস্টারের ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে যেদিকে হোক লম্বা দিয়েছে। কিন্তু কম্বলের মতো একটা অখাদ্য জীব চাঁদে গেছে, এ হতেই পারে না। আমি কখনো বিশ্বাস করব না—তা বদ্রীবাবুই বলুক আর কেদারবাবুই বলুক।'

ক্যাবলা হিন্দী করে বললে, 'এ জী, জেরা ঠহ্‌রো না। আরে চাঁদ-উঁদ ছোড় দো, উতো বিলকুল দিল্লাগী মালুম হচ্ছে আমার, নীচের লেখাগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। ওদের কোনো মানে আছে।'

আমি বললুম, 'ওই চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর? তোর মাথা খারাপ হয়েছে ক্যাবলা। ওগুলো স্রেফ পাগলামি, ওদের কোনো মানেই হয় না।'

'বেশি ওস্তাদী করিসনি প্যালা, আমি কী বলছি তাই শোন্। কম্বলকে আমরা সকলেই জানি। তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়ও আমাদের অজানা নয়। সেদিনও সে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, ইটালীর মুসোলিনী কি বেলাঘাটার মৃণালিনী মাসিমার বড়ো বোন? তার হাতের লেখা দেখলে উর্দু কিংবা কানাড়ী বলে মনে হতে থাকে। বন্ধুগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, তা হল ছ-লাইনের একটি কবিতা। তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে। কম্বলের সাধ্যও নেই ওভাবে ছন্দ মিলিয়ে, মিল রেখে, ছটা লাইন দাঁড় করায়।'

হাবুল মাথা নাড়ল : 'হ, বুঝছি। আর কেউ লেইখ্যা দিছে।'

'ঠিক, আর কেউ দিয়েছে। কিন্তু খামোকা লিখতে গেল কেন? নিশ্চয়ই ওর একটা মানে আছে।'—ক্যাবলা কাগজটা খুলে ধরে পড়তে লাগল : 'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল—আচ্ছা টেনিদা?'

টেনিদা বললে, 'ইয়েস।'

'আমার মাথায় প্ল্যান এসেছে একটা। একবার চাঁদনির বাজারে যাবে!'

'চাঁদনির বাজার!'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম। টেনিদা নাক কুঁচকে, মুখটাকে শোনপাপড়ির মতো করে বললে, 'কী জ্বালা, চাঁদনির বাজারে যেতে যাব কেন?'

ক্যাবলা আরো বেশি গম্ভীর হল।

'ধরো সেখানে যদি চক্রধরকে পেয়ে যাই? কিংবা কে জানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো।'

'নাকেশ্বরও বইস্যা থাকতে পারে—কেডা কইবো?'—হাবুল জুড়ে দিলে।

'সবই হতে পারে'—ক্যাবলা বললে, 'চলো না টেনিদা, ঘুরেই আসি একটু। যদি কোনো খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী। ছুটির দিন, একটু বেড়িয়েই নয় আসা যাবে।'

'কিন্তু বেড়াবি কোথায়?'—টেনিদা বিরক্ত হল : 'চাঁদনি তো আর একটুখানি জায়গা নয়। সেখানে চক্রধর বলে কেউ যদি থাকেই, তাকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'এক পাল খড়ের ভেতর থেকে গোয়েন্দারা ছুঁচ খুঁজে বের করতে পারে, আর চাঁদনি থেকে একটা লোককে আমরা খুঁজে পাব না? এই কি আমাদের লীডারের মতো কথা হল? ছি-ছি, বহুৎ শরম কি বাত!'

আর বলতে হল না। তড়াক করে টেনিদা লাফিয়ে উঠল : 'চল্‌, তা হলে, দেখাই যাক একবার।'

আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চীনে বাদাম খেতে খেতে যখন চাঁদনির বাজারে যাওয়ার জন্যে ট্রামে চাপলুম, তখনও আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যিই আমরা এবারে একটা রহস্যের খাসমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আমাদের সামনে এমন দুরন্ত অভিযান ঘনিয়ে আসবে।

চাঁদনির বাজারে ঢুকে টেনিদা কেবল এক ভদ্রলোককে বোকার মতো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'মশাই, এখানে চক্রধর বলে কেউ'—হঠাৎ হাবুল থাবা মেরে তাকে থামিয়ে দিলে। বললে 'টেনিদা—টেনিদা—ওই যে! লুক দেয়ার!'

একটি ছোট সাইনবোর্ড। ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে : শ্রীচক্রধর সামন্ত। মৎস ধরিবার সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিক্রেতা। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

অবশ্য 'মৎস্যে' য-ফলা নেই, তাছাড়া লেখা রয়েছে 'পরিক্ষা প্রার্থনীয়।' কিন্তু তখন বানান ভুল ধরার মতো মনের অবস্থা ক্যাবলার মতো পণ্ডিতেরও নেই। আমরা চারজনেই হাঁ করে সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে রইলুম কেবল।

চার

সাইনবোর্ডে যতই বানান ভুল থাক, মানে 'মৎস'-ই লিখুক আর 'পরিক্ষা'ই চালিয়ে দিক, আসল ব্যাপার হল : এটা চাঁদনির বাজার আর চক্রধর সামন্তের দোকান একেবারে সামনেই রয়েছে। অর্থাৎ কবিতাটার প্রথম দু লাইনের মানে এখানেই পাওয়া যাচ্ছে যে।

হাবুল বললে, 'টেনিদা, অখন কী করন যাইবো?'

ক্যাবলা বললে, 'করবার কাজ তো একটাই রয়েছে। অর্থাৎ এখন সোজা ওখানে গিয়ে চক্রধর সামন্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখা করে কী বলবি?'

টেনিদা পেছন থেকে আমার মাথায় টুক করে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে : 'চক্রধর সামন্তকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে লুচি-পোলাও খাইয়ে দিবি। দেখা করে কী আবার বলব? পরিষ্কার জানতে চাইব, এই কবিতাটির মানে কী, আর শ্রীমান কম্বল কোথায় আছেন।'

ক্যাবলা ছুটে গিয়ে বললে, 'হুঁ, তাহলেই সব কাজ চমৎকার ভাবে পণ্ড হতে পারবে। কম্বলকে যদি এরাই কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। হয়তো কম্বলকে আমরা আর কোনোদিন খুঁজেই বের করতে পারব না।'

হাবুল বললে, 'না পাইলেই বা কী হইবো। সেই পোলাখান না? সে হইল গিয়া এক নম্বরের বিচ্ছু। তারে ধইর‍্যা যদি কেউ চান্দে চালান কইর‍্যা দেয়, দুই দিনে চান্দের গলা দিয়াও কান্দন বাইরাইবো!'

টেনিদা ধমকে বললে, 'তুই থাম। কম্বল যত অখাদ্য ছেলেই হোক, তার কাকার কাছে আমরা তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য, মানে ডিউটি-বাউন্ড। তারপর বদ্রীবাবু পিটিয়ে কম্বলের ধুলো ওড়ান কি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েই পড়ুন সে তিনিই বুঝবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ বকবক করব আমরা? কিছু একটা করতে তো হবে।'

ক্যাবলা বললো, 'আলবৎ করতে হবে। চলো, আমরা মাছধরার ছিপ-সুতো এই সব খোঁজ করিগে।'

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমি কিন্তু ছিপ সুতো নিয়ে বাড়ি যাব না। মেজদা তাহলে আমার কান কেটে নেবে।'

'তোর কান কেটে নেওয়াই উচিত'—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে কটকটিয়ে তাকালো ক্যাবলা : 'আরে বোকারাম, ছিপ-সুতো কিনছে কে? আমরা এটা-ওটা বলে হালচাল বুঝে নেব।'

টেনিদা খুব মুরুব্বির মতো বললে, 'প্যালা আর হাবলাকে নিয়েই মুশকিল। এ দুটোর তো মাথা নয়—যেন এক জোড়া থাজা কাঁটাল। কী বলতে কী বলবে আর সব মাটি হয়ে যাবে। শোন, তোরা দুজন একেবারে চুপ করে থাকবি, বুঝেছিস? যা বলবার আমরাই বলব—মানে আমি আর ক্যাবলা। মনে থাকবে?'

আমরা গোঁজ হয়ে ঘাড় নাড়লুম। মনে থাকবে বই কি। এদিকে কিন্তু ভীষণ রাগ হচ্ছিল টেনিদার ওপর। বলতে ইচ্ছা করছিল, আমাদের মাথা নয় থাজা কাঁটাল, আর তোমার? পণ্ডিত মশাই বলতেন না, 'বৎস টেনিরাম, ওরফে ভজহরি, জগদীশ্বর কি তোমার স্কন্ধের উপর মস্তকের বদলে একটি গোময়ের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়াছেন?' রাগ হলেই তাঁর মুখ দিয়ে সাধুভাষা বেরিয়ে আসত।

সে যাই হোক আমরা তো চক্রধর সামন্তের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে আঠার-উনিশ বছরের একটা ছেলে খাকী হাফপ্যান্ট্ আর হাত-কাটা গেঞ্জী পরে, একটা শালপাতার ঠোঙা থেকে তেলে ভাজা খাচ্ছিল।

আমাদের দেখেই বেগুনী চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?'

ক্যাবলা বললে, 'আমরা ছিপ কিনব।'

'ওই তো রয়েছে, পছন্দ করুন না'—বলে সে এবার একটা আলুর চপে কামড় বসালো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছিপ বিক্রী করার চাইতে তেলে ভাজাতেই মনোযোগ তার বেশি।

'আপনিই বুঝি চক্রধরবাবু?'—টেনিদা ভারী নরম-নরম গলায় ভাব করবার মত

করে জানতে চাইল।

'আমি চক্রধরবাবু হতে যাব কেন?'—আলুর চপের ভেতরে একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে বিচ্ছিরি মুখ করল ছেলেটা।

'তিনি তো আমার মামা।'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক-ঠিক। তাই চক্রধরবাবুর মুখের সঙ্গে আপনার মুখের মিল আছে! ভাগ্নে বলেই।'

ভাগ্নে এবার চটে উঠল, শুনে আলুর চপের মতো ঘোরালো হয়ে উঠল তার মুখ। খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে বললে, 'কী—কার মুখের সঙ্গে মিল আছে বললেন? চক্রধরের? সে সাত পুরুষে আমার মামা হতে যাবে কেন? গাঁয়ের লোকে তাকে মামা বলে—আমিও বলি। আমার মুখ তার মতো ভীমরুলের চাকের মতো? আমার কপালে তার মতো আব আছে? আমার রং তার মতো কটকটে কালো? আমার নাকের তলায় একটা ঝোল্লা গোঁফ দেখতে পাচ্ছেন?'

ক্যাবলার মতো চট্‌পটে ছেলেও কি রকম ঘাবড়ে গেল এবার। বার দুই বিষম খেলো।

'মানে—এই ইয়ে—'

'ইয়ে-টিয়ে নেই। ছিপ কিনতে এসেছেন কিনুন, নইলে খাঁ করে সরে পড়ুন এখান থেকে। খামোকা যা তা বলে মেজাজ খারাপ করে দেবেন না স্যার!'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।'—টেনিদা মাথা নাড়ল : 'ওর কথা ছেড়ে দিন মশাই, ওটা কী বলে ইয়ে—মানে নেহাৎ নাবালক। আপনার মুখখানা—মানে—ঠিক চাঁদের মতো—অর্থাৎ কিনা চন্দ্রকান্ত বাবুও বলা যায় আপনাকে।

'আমার নাম হলধর জানা।'—বলেই সে হঠাৎ কি রকম চমকে উঠল : 'কী নাম বললেন? চন্দ্রকান্ত?'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'নিশ্চয় চন্দ্রকান্ত। এমন কি আপনার টিকোলো নাক দেখে নাকেশ্বর বলতেও ইচ্ছে করছে।'

'কী বললেন? নাকেশ্বর? চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর?'—হলধর জানা তেলে ভাজার ঠোঙাটা মুড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : 'আপনারা যান। ছিপ বিক্রী হবে না। দোকান বন্ধ।'

ক্যাবলা বললে, 'দোকান বন্ধ!'

'হাঁ, বন্ধ।'—হলধর কি রকম বিড়বিড় করতে লাগল : 'আজকে বিষ্যুদ্‌বার না? বিষ্যুদবারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে।'

'মোটেই না, আজকে মঙ্গলবার'—আমি প্রতিবাদ করলুম।

'হোক মংগলবার'—হলধর কাঁচা উচ্ছে চিবুনোর মতো মুখ করে বললে, 'আমরা মঙ্গলবারেও দোকান বন্ধ করে রাখি।'—বলেই সে ঘটাং ঘটাং করে আমাদের নাকের সামনেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে নাক বের করে বললে, 'অন্য দোকানে গিয়ে ছিপ কিনুন, এখানে সুবিধে হবে না।'

ব্যাস, হলধরের সঙ্গে আলাপ এখানেই খতম। হলধর জানাকে আর জানা হল না—তার আগেই ঝাঁপের আড়ালে সে ভ্যানিস্‌ড্‌।

সে তো ভ্যানিস্‌ড্‌—কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে একেবারে চক্কর লাগিয়ে দিলে যাকে বলে। পচা চীনে বাদাম চিবুলে যেরকম লাগে, ঠিক সেই রকম বোকা-বোকা হয়ে আমরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

টেনিদা মাথা চুলকে বললে, 'ক্যাবলা—এবার?'

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ। এখন চলো, কোথাও গিয়ে একটু চা খাই। সেখানে বসে প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা, নিরিবিলি কেবিনও পাওয়া গেল। ক্যাবলাই চা আর কেক আনতে বলে দিলে। এ সব ব্যাপারে চিরকাল পয়সা-টয়সা ও-ই দেয়, আমাদের ভাববার কিছু ছিল না।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, 'ব্যাপারটা খুব মেফিস্টোফিলিস বলে মনে হচ্ছে। মানে সাংঘাতিক। এত সাংঘাতিক যে পুঁদিচ্চেরীও বলা যেতে পারে।'

হাবুল এতক্ষণ পরে মুখ খুলল : 'হ, সৈত্য কইছ।'

'চন্দ্রকান্ত আর নাকেশ্বর শুনেই হলধর কি রকম লাফিয়ে উঠল দেখেছ?'—আমি বললুম, 'তা হলে ছড়াটার দ্বিতীয় লাইনেরও একটা মানে আছে।'

'সব কিছুরই মানে আছে—বেশ গভীর মানে।'—ক্যাবলা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'এখন তো দেখছি ছড়াটার মানে বুঝতে পারলেই কম্বলেরও হদিস পাওয়া যাবে।'

টেনিদা এক কামড়েই নিজের কেকটাকে প্রায় শেষ করে ফেলল। আমিও চট্ করে আমারটা আধখানা মুখে পুরে দিলুম, পাছে ও পাশ থেকে আমার প্লেটেও হাত বাড়ায়। টেনিদা আড় চোখে সেটা দেখল, তারপর ব্যাজার হয়ে বললে, 'কিন্তু পটল-ডাঙার কম্বল কী করে যে চাঁদনির বাজারে এল আর চক্রধরের সংগে জুটলই বা কি-ভাবে, সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেটা বুঝলে তো সবই বোঝা যেত।'—ক্যাবলা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল : 'ভেবেছিলুম, কম্বলের পালানোটা কিছুই নয়—এখন দেখছি বদ্রীবাবুই ঠিক বলেছিলেন। কম্বল চাঁদে হয়তো যায় নি, কিন্তু যে রহস্যময় চাঁদোয়ার তলায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে-ও খুব সোজা জায়গা নয়। ওয়েল, টেনিদা।'

'ইয়েস ক্যাবলা।'

'চলো, আমরা চারজনে চারিদিক থেকে চক্রধরের দোকানের ওপর নজর রাখি। আমাদের তাড়াবার জন্যেই হলধর দোকান বন্ধ করছিল, আবার নিশ্চয় ঝাঁপ খুলবে। দেখতে হবে ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আব নিয়ে কটকটে কালো চক্রধর আসে কিনা কিংবা লম্বা নাক নিয়ে চন্দ্রকান্ত দেখা দেয় কিনা। কিন্তু টেক কেয়ার—সব্বাইকেই একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে—হলধর যাতে কাউকে দেখতে না পায়।'

আমরা সবাই রাজী হয়ে গেলুম।

ক্যাবলা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়াতে ওর বাবা ওকে একটা হাতঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। সেটার দিকে তাকিয়ে ক্যাবলা বললে, 'এখন সাড়ে চারটে। পড়াশুনোর সময় নষ্ট না করেও আমরা আরো দেড় ঘন্টা থাকতে পারি এখানে। কে জানে, হয়তো আজকেই কোনো একটা ক্লু পেয়ে যেতে পারি কম্বলের। ফ্রেন্ডস্—নাউ টু অ্যাকশান—এবার কাজে লাগা যেতে পারে।'

চাঁদনির বাজারে এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা কিছু শক্ত কাজ নয়। আমরাও পাকা গোয়েন্দার মতো চারদিকে চারটে জায়গা বেছে নিয়ে চক্রধরের দোকানের দিকে ঠায় চেয়ে রইলুম। টেনিদা আর ক্যাবলাকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠিক আমার মুখোমুখি একটা লোহার দোকানের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কচ্ছপের মতো গলা বের করছিল হাবুল।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, চক্রধরের দোকানের ঝাঁপ আর খোলে না। চোখ টনটন করতে লাগল, পা ব্যথা হয়ে গেল। এমন সময়, হঠাৎ—পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেন টুক টুক করে দুটো টোকা মারল।

চমকে তাকিয়েই দেখি, ছিটের শার্ট গায়ে, ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা, নাকের নিচে মাছিমার্কা গোঁফ, বেশ ওস্তাদ চেহারার লোক একজন। মিটমিট করে হেসে বললে, 'ছল ছল খালের জল'—তাই না?'

আমি এত অবাক হয়ে গেলুম যে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

লোকটা বলল, 'তা হলে হলধরকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা কেন? কাল বেলা তিনটের সময় তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে গেলেই তো হয়।'

বলে আমার পিঠে টকটক করে আবার গোটা দুই টোকা দিয়ে, টুক করে কোন-দিকে সরে পড়ল যেন।

পাঁচ

কলকাতায় কাঁটাপুকুর আছে, ফড়েপুকুর আছে, বেনেপুকুর, মনোহরপুকুর, পদ্মপুকুর সব আছে, কিন্তু শেয়ালপুকুর আবার কোন চুলোয়! হিসেবমতো শেয়ালদার কাছাকাছিই তার থাকা উচিত, কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় কলকাতার রাস্তার যে লিস্টি থাকে, তাই থেকেই শেষ পর্যন্ত জানা গেল, শেয়ালপুকুর সত্যিই আছে দক্ষিণের শহরতলীতে। জায়গাটা ঠিক কোনখানে, তা আর তোমাদের না-ই বললুম।

শেয়ালপুকুরের সন্ধান তো পাওয়া গেল, তেরো নম্বরও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হল, জায়গাটাতে আদৌ যাওয়া উচিত হবে কিনা? কাঁটাপুকুরে কোনো কাঁটা নেই—সে আমি দেখেছি; মনোহরপুকুরে আমার মাসতুতো ভাই লোটনদা থাকে—সেখানে কোনো মনোহরপুকুর আমি দেখিনি, ফড়েপুকুরেও নিশ্চয়ই ফড়েরা সাঁতরে বেড়ায় না। শেয়ালপুকুরের চারপাশেও খুব সম্ভব এখন আর শেয়ালের আস্তানা নেই—বেলা তিনটের সময় সেখানে গেলে নিশ্চয় আমাদের খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে না। কিন্তু—

কিন্তু চাঁদনীর সেই সন্দেহজনক আবহাওয়া? সেই ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আঁবওলা চক্রধর সামন্ত কিংবা সেই নাকেশ্বর চন্দ্রকান্ত—যাদের এখনো আমরা দেখিনি? সেই তেলেভাজা খাওয়া হলধর আর তালঢ্যাঙা সেই খলিফা-চেহারার লোকটা? এ-সবের মানে কী? ছড়াটা দেখছি ওরা সবাই-ই জানে আর এই ছড়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে কোনো সাংকেতিক রহস্য। পটলডাঙার বিচ্ছুমার্কা কম্বল ও ছড়াটা পেলেই বা কোথায়, আর কারাই বা তাকে নিরুদ্দেশ করল?

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে ঝালমুড়ি খেতে খেতে এই সব ঘোরতর চিন্তার ভেতরে আমরা চারজন হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। বাঙাল হাবুল সেন বেশ তরিবৎ করে একটা লাল লঙ্কা চিবুচ্ছিল, আর তাই দেখে গা শিরশির করছিল আমার। টেনিদার খাড়া নাকটাকে দু আনা দামের একটা তেলে ভাজা শিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছিল, আর ক্যাবলার নতুন চশমাটা ইস্কুলের ভুগোল-স্যারের মতো একেবারে ঝুলে এসেছিল ওর ঠোঁটের ওপর।

টেনিদা মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললে, 'পুঁদিচ্চেরি! মানে, ব্যাপার খুব ঘোরালো।'

আমরা তিনজনেই বললুম, 'হুঁ।'

টেনিদা বললে, 'যতই ভাবছি, আমার মনটা ততই মেফিস্টোফিলিস হয়ে যাচ্ছে।'

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।'

'শাটাপ!'—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বিদ্যে ফলাসনি। লোকগুলোকে কি রকম দেখলি?'

আমি বললুম, 'সন্দেহজনক।'

হাবুল লঙ্কা চিবিয়ে জিভে লাল টেনে 'উস-উস' করছিল। তারই ভেতরে ফোড়ন কাটল: 'হ, খুবই সন্দেহজনক। ক্যামন শিয়াল-শিয়াল মনে হইল।'

আমি বললুম, 'তাই শেয়ালপুকুরে থাকে।'

ক্যাবলা বললে, 'খামোশ্! চুপ কর দেখি। আমি বলি কি টেনিদা, আজ দুপুর-বেলা যাওয়াই যাক ওখানে।'

টেনিদা শিঙাড়ার মত নাকটাকে খুচুর খুচুর করে একটুখানি চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ফেঁসে যাই? মানে—লোকগুলো—'

'চার-চারজন আছি, দিন-দুপুরে আমাদের কে কী করবে?'

'তা ঠিক। তবে কিনা—' টেনিদা গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'হ, সকল দিক ভাইবা-চিন্তাই কাম করন উচিত।'—ভাবুকের মতো মাথা নাড়তে লাগল হাবুল সেন:

'আর—তোমার হইল গিয়া—কম্বলটা একটা অখাদ্য মানকচু। অরে শুয়ারেও খাইবো না! খামাকা সেইটারে খুঁজতে গিয়া বিপদে পড়ুম ক্যান?'

'হবে না! ছিঃ ছিঃ!'—এমনভাবে ধিক্কার দিয়ে কথাটা বললে ক্যাবলা যে, হাবুল একেবারে নেতিয়ে গেল, স্রেফ মানকচু সেদ্ধর মতো। চশমাটাকে আরো ঝুলিয়ে দিয়ে এবারে সে অঙ্ক-স্যারের মতো কটকটে চোখে চাইল হাবুলের দিকে।

'তুই এত স্বার্থপর! একটা ছেলে বেঘোরে মারা যাচ্ছে, তার জন্যে কিছু না করে স্বার্থপরের মতো নিজের গা বাঁচাতে চেষ্টা করছিস! শেম্—শেম্।'

হাবুল জব্দ হচ্ছে দেখে আমিও বললুম, 'শেম্-শেম্!' কিন্তু বলেই আমার মনে হল, হাবুলও কিছু অন্যায় বলে নি। কম্বলের মতো একটা বিকট বাঁদর ছেলে—যে কুকুরের কানে লাল পিঁপড়ে ঢেলে দেয়, লোকের গায়ে পটকা ফাটায় আর প্রণামের ছল করে খ্যাঁচখেঁচিয়ে পায়ে খিমচে দেয়, সে যদি আর নাই ফিরে আসে, তাতে দুনিয়ার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু তক্ষুনি আমি ভাবলুম, কম্বলের মার কি হবে? ছেলে-হারানোর দুঃখ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? আর, কোনো ছেলে যদি খারাপ হয়েই যায়, তা হলেই কি তাকে বাতিল করা উচিত? খারাপ ছেলের ভালো হতে কদিনই বা লাগে? না হলে, ক্লাইভ কী করে ভারতবর্ষ জিতে নিলেন?

আমি ভাবছিলুম, ওরা কী বলছিল শুনতেই পাইনি। এবার কানে এল, টেনিদা বলছে, 'কিন্তু শেয়ালপুকুরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

'করুক না আক্রমণ। আমাদের লীডার টেনিদা থাকতে কী ভয় আমাদের?'—ক্যাবলা টেনিদাকে তাতিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার এক-একটা ঘুষি লাগবে, আর এক একজন দাঁত ছরকুটে পড়বে।'

'হে—হে, মন্দ বলিসনি।'—সঙ্গে সঙ্গে টেনিদার দারুণ উৎসাহ হল আর সে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দেবার জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু ক্যাবলা চালাক, চট করে সরে গেল সে, তার পিঠ সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর চাঁটিটা এসে চড়াৎ করে আমার পিঠেই চড়াও হল।

আমি চাঁ চাঁ করে উঠলুম, আর হাবলা দারুণ খুশি হয়ে বললে, 'সারছে—সারছে—দিছে প্যালার পিঠখান অ্যাক্কেবারে চ্যালা কইরা! ইচ্-চ্—পোলাপান!'

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা বললে, 'সাইলেন্স—নো চ্যাঁচামেচি! বেশি গন্ডগোল করবি তো সবগুলোকে আমি একেবারে জলপান করে ফেলব। যা—বাড়ি পালা এখন। খেয়েদেয়ে সব দেড়টার সময় হাজিরা দিবি এখানে। এখন ট্রুপ ডিসপার্স—কুইক্!'

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই আমরা দেখলুম দুটো রাস্তা বেরিয়েছে দু দিকে। একটা ধোপাপাড়া রোড, আর একটা শেয়ালপুকুর রোড। হাবুল আমাকে বললে, 'এই রাস্তার ধোপারা গিয়া না ওই রাস্তার শিয়ালপুকুরে কাপড় কাচে। বোঝছস্ না প্যালা?'

আমি বললুম, 'তুই থাম, তোকে আর বোঝাতে হবে না।'

'তরে একটু ভালো কইর্যা বুঝান দরকার। তর মগজ বইল্যা তো কিছুই নাই, তাই উপকার করবার চেষ্টা কোরতে আছি। বুঝিস নাই?'

এমন বিচ্ছিরি করে বলছিল যে ইচ্ছে হল হাবুলের সঙ্গে আমি মারামারি করি। কিন্তু তার আর দরকার হল না, বোধ হয় ভগবান কান খাড়া করে সব শুনছিলেন, একটা আমের খোসায় পা দিয়ে দুম করে আছাড় খেলো হাবুল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগে আগে যাচ্ছিল। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আঃ, এই প্যালা আর হাবলাকে নিয়ে কোনো কাজে যাওয়ার কোনো মানে নেই, দুটোই পয়লা-নম্বরের ভন্ডুলরাম। এই হাবলা—কী হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'কিছু হয়নি। হাবলার মগজে জ্ঞান একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই বইতে পারছে না—ধপাধপ আছাড় খাচ্ছে।'

'হয়েছে, তোমার আর ওস্তাদি করতে হবে না। শিগ্‌গির আয় পা চালিয়ে।'

রাস্তার দুধারে কয়েকটা সেকেলে বাড়ি, কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ উঠছে। গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়েছে এখানে ওখানে। ভর দুপুরে লোকজন কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় যেন মিষ্টি গলায় দোয়েল ডাকছিল। এখানে যে কোনো-রকম ভয়ের ব্যাপার আছে তা মনেই হল না।

আরে, এই তো তেরো নম্বর! উঁচু পাঁচিল দেওয়া বাগানওলা একটা পুরোনো বাড়ি। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে বাংলা হরফে নম্বর লেখা। গেট খোলাই আছে, কিন্তু ঢোকবার জো নেই। গেট জুড়ে খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে পেল্লায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান, তার হাতির মতো পেট দেখে মনে হল, সে বাবা কুস্তিগীর আর দারুণ জোয়ান—আমাদের চারজনকে সে এক কিলে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দিতে পারে।

আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে তাকালুম। এই জগদ্দল লাসকে ঘাঁটানো কি ঠিক হবে?

টেনিদা একবার নাক-টাকগুলো চুলকে নিলে। চাপা গলায় বললে, 'পুঁদিচ্চেরি!' তারপর আস্তে আস্তে ডাকল :

'এ দারোয়ানজী!'

কোনো সাড়া নেই।

'ও দারোয়ান স্যার।'

এবারেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'পাঁড়ে মশাই!'

দারোয়ান জাগল। ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আর তাই শুনেই আমরা চমকে উঠলুম।

দারোয়ান সমানে বলছিল : 'চাঁদ—চাঁদনি—চক্কর—চাঁদ—চাঁদনি—চক্কর—'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর।'

কথাটা মুখ থেকে পড়তেই পেলো না। তক্ষুনি—যেন ম্যাজিকের মতো উঠে বসল দারোয়ান। হড় হড় করে খাটিয়া সরিয়ে নিয়ে, আমাদের লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'যাইয়ে—অন্দর যাইয়ে—'

আমরা বোধ হয় বোকার মতো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলুম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে নাকি? যা রাক্ষসের মতো চেহারা, ওকে বিশ্বাস নেই।

দারোয়ান আবার মুচকি হেসে বললে, 'যাইয়ে—যাইয়ে—'

এরপরে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। আমরা দুরু দুরু বুকে দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। আর ঢুকতেই তক্ষুনি খাটিয়াটা টেনে গেট জুড়ে শুয়ে পড়ল দারোয়ান—যেন অঘোর ঘুমে ডুবে গেল।

কিন্তু আমরা কোথায় যাই?

সামনে একটা গাড়িবারান্দাওলা লাল রঙের মস্ত দোতলা বাড়ি। তার জানলার সবুজ খড়খড়িগুলো সাদাটে হয়ে কব্‌জা থেকে ঝুলে পড়ছে, তার গায়ের চুণ বালির বার্নিশ খসে যাচ্ছে, তার মাথায় বট অশথের চারা গজিয়েছে। একটা ভালো ফুলের বাগান ছিল, এখন সেখানে আগাছার জঙ্গল। একটা মরকুটে লিচু গাছের ডগায় কে যেন আবার খামোকা একটা কালো কাক-তাড়ুয়ার হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে।

আমরা এখানে কী করব বোঝবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে তালঢ্যাঙা লোকটা—সেই যাকে আমরা চাঁদনির বাজারে দেখেছিলুম—মাছি মার্কা গোঁফের নিচে মুচকি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'এই যে, এসে গেছেন! তিনটে বেজে দু সেকেন্ড—বাঃ, ইউ আর ভেরি পাংচুয়েল।'

আমরা চারজনে গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। যদি বিপদ কিছু ঘটেই, এক সঙ্গেই তার মোকাবেলা করতে হবে!

টেনিদা আমাদের হয়ে জবাব দিলে, 'আমরা সর্বদাই পাংচুয়াল!'

'গুড্!—ভেরি গুড্!'—লোকটা এগিয়ে চলল, 'তাহলে আগে চলুন মা নেংটী-শ্বরীর মন্দিরে। তিনি তো এ যুগের সব চাইতে জাগ্রত দেবতা।'

'নেংটীশ্বরী!'

লোকটা অবাক হয়ে ফিরে তাকালো : 'নাম শোনেন নি? মা নেংটীশ্বরীর নাম শোনেন নি? অথচ চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের খবর পেয়েছেন? এটা কি রকম হল?'

আমরা বুঝতে পারছিলুম, একটা কিছু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে। 'না-না, নাম শুনব না কেন? না হলে আর এখানে এলুম কী করে?'

'তাই বলুন।'—লোকটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল : 'আমায় একেবারে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জয় মা নেংটীশ্বরী!'

আমরাও সমস্বরে নেংটীশ্বরীর জয়ধ্বনি করলুম।

ছয়

আমরা যেই বলেছি, 'জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়', সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিচিংচেন্দ্র ফাঁক হয়ে গেলেন। মানে, তক্ষুনি সেই সরু গুঁফো তালঢ্যাঙা চেহারার রোগা লোকটা

www.boiRboi.blogspot.com

হুড়মুড় করে একটা নকসা কাটা কালো দরজা টেনে খুলে ফেললে। আর সেই দরজা দিয়ে তাকিয়েই আমরা চারজনে একেবারে থ।

মা কালী, মা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-বিশ্বকর্মা-শীতলা-শিব, মায় ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক দেবতাই তো আমরা দেখেছি—মানে দেবতা আর কী করে দেখব, তাঁদের মূর্তিটুর্তি তো সব সময়েই দেখে থাকি। পাটনার সেই কংগ্রেস ময়দানে দেখেছি, বাঁশ, কাগজ আর সেই সঙ্গে আরো কী সব দিয়ে তৈরী রাবণ-কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিতের আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি—দশহরার দিন যাদের আগুনের তীর মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দরজা খুলতে আজ যা দেখতে পেলুম—এমন ঠাকুর এর আগে কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে হল না।

টেনিদা বিড় বিড় করে বললে, ডি লা গ্র্যাণ্ডি!

আমি বললুম, মেফিস্টোফিলিস!

হাবুল সেন বললে, খাইছে!

আর ক্যাবলা কিছুই বললে না, হাঁ করে চেয়ে রইল, কেবল তার চশমাটা নাকের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে।

কী দেখলুম, সে আর কি বলব তোমাদের। ছোট্ট ঘরটা এই দিন-দুপুরেই অন্ধকার, তার ভেতরে মালার মতো করে লাল নীল অনেকগুলো ইলেক্ট্রিকের বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্বগুলো মিটমিটে হলেও ক'টা এক সঙ্গে জ্বলছে বলে একটা অদ্ভুত রঙিন আলো থমথম করছে ঘরময়। সেই আলোয় চিকচিক করছে মস্ত একটা সিংহাসন—রুপো-টুপো তাতে লাগানো আছে বোধ হয়। সিংহাসনের মাথায় একটা সাদা ছাতা, আর সেই ছাতার তলায় ভেলভেটের গদীতে বসে—

স্বয়ং মা নেংটীশ্বরী। অর্থাৎ কিনা—ইয়া জাঁদরেল একটা নেংটী ইঁদুর।

নেংটী ইঁদুরটার মূর্তি একটা ধুমশো হুলো বেড়ালের চাইতেও তিনগুণ বড়ো। সামনের পা দুটো জড়ো করে, কান খাড়া করে, ল্যাজটাকে পিঠের ওপর দিয়ে বাঁকিয়ে এমন কায়দায় বসে আছে যে আচমকা দেখলে জ্যান্তো বলে মনে হয়। চোখ দুটো বোধ করি কালো কাচ কিংবা পুঁতি দিয়ে তৈরি—লাল-নীল আলোতে সে দুটো যেন শয়তানীতে চিকচিক করছে। তার সামনে একটা মস্ত বারকোষে ছোলা-কলা-বাতাসা-চাল-ডাল এই সব সাজানো রয়েছে, দেবী নেংটীশ্বরীর ভোগ নিশ্চয়।

তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণ চমকে উঠল। রাত-বিরেতে ও-রকম একখানা পেল্লায় ইঁদুর যদি কারুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তা হলে আর দেখতে হবে না। কামড়ে-ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে একেবারে।

লোকটা ধমক দিয়ে বললে, কি হে—হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড়ো? বোম্বাচাক লেগে গেল নাকি তোমাদের? মাকে পেন্নাম করলে না?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চারজনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লুম।

লোকটা বলে চলল, 'হেঁ—হেঁ', ভারী দুর্লভ মূর্তি! দুনিয়ার কোথাও দেখতে পাবে না। এ'র প্রতিষ্ঠে করেছেন কে জানো? বাবা বিট্‌কেলানন্দ। তাঁর নাম শুনেছ তো?'

আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলুম। বিট্‌কেলানন্দ! স্বামী ঘুটঘুটানন্দের সঙ্গে একবার রামগড়ের জঙ্গলে আমাদের দারুণ রকমের একটা মোলাকাৎ হয়েছিল—তাকে মুলো কাৎ-ও বলা যায়, কারণ তিনি আমাদের চার জনকে প্রায় কাৎ করে ফেলেছিলেন। বিট্‌কেলানন্দ তাঁরই মাসতুতো ভাই কি না, কে জানে!

ক্যাবলা ঘাড়-টাড় চুলকে বললে, আজ্ঞে, তা—তা শুনেছি বইকি। বাবা বিট্‌কেলা-

www.boiRboi.blogspot.com

নন্দের নাম কেই বা না জানে!

লোকটা ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল : সে কথা আর বোলো না। তোমরা বুদ্ধিমান বোলে তাঁর খবর রাখো, তাই চাঁদনিতে গিয়ে খালের জলের কবিতা আউড়ে এখানে আসতে পেরেছ। কিন্তু অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, ঠোঁট উল্‌টে অম্‌নি বলে বসবে—'আঁ, বিট্‌কেলানন্দ? সে আবার কে!'—লোকটার মুখ মনের দুঃখে যেন লম্বা হয়ে গেল : ছ্যাঃ, এই জন্যই দেশটার কিছু হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে টেনিদাও কেমন বাজখাই গলায় বলে বসল, আজ্ঞে যা বলেছেন—এই জন্যেই দেশের কিছু হয় না। কি রকম বাঘাটে গলায় টেনিদা বলে ফেলল কথাটা, ঘর গম্‌গম করে উঠল, লোকটাও যেন চমকে গেল। তারপর বললে, অথচ দ্যাখো—বাবা বিটকেলানন্দ স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। চালাকি নয়!

—খাইছে!—হাবুল আর থাকতে পারলো না।

—খাইছে?—লোকটা আবার চম্‌কে গেল : তার মানে? কী খেয়েছে? কোথায় খেয়েছে? কেনই বা খেলো? ক্যাব্‌লা বললে, যেতে দিন—যেতে দিন, ও মধ্যে মধ্যে ওই রকম বলে—কেউ কিছু খায়নি। এখন আপনি যা বলছিলেন বলুন।

—আমি বলছিলুম, স্বপ্নাদেশ!—লোকটা একবার গলাখাঁকারি দিলে : বাবা বিটকেলানন্দ ছেলেবেলা থেকেই ভাবুক। ইস্কুলে মাস্টার পড়া জিজ্ঞেস করলে মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন—পাষণ্ড মাস্টারগুলো ভাবত—বাবার মাথায় কিছু নেই, তাই তাঁকে গোরুর মতো ঠ্যাঙাতো। তারা তো জানত না—বাবা তখন ধ্যান করছেন। কিছু না বুঝেই মহাপাপী মাস্টারেরা পিটিয়ে তাঁর ধুন্ধুড়ি উড়িয়ে দিত—ক্লাসে প্রোমোশন দিত না!

আমি বললুম, আহা!

ক্যাবলা বললে, আহা-হা!

হাবুলও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘাড়ে একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা তাকে থামিয়ে দিলে। লোকটার গলার স্বর ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল, সে বললে, আহো-হো! যাক, তারপরে শোনো। ঠ্যাঙানি খেতে বাবা বিটকেলানন্দের মতো মহাপুরুষেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি ভেবে দেখলেন, মাস্টারের গাঁট্টাতেই যদি তাঁকে মহাপ্রস্থানে যেতে হয়, তা হলে তিনি ধ্যান-জপ করবেন কী করে—আবার জীবেরই বা গতি হবে কী! তারপর একদিন তিনি বাড়ী ছেড়ে সটকালেন।

ক্যাবলা বললে, বুদ্ধের গৃহত্যাগ আর কি।

লোকটা মাথা নাড়ল : যা বলেছ, ব্যাপার প্রায় সেই রকম। কিন্তু জানো বুদ্ধের কাল তো এটা না, মহাপুরুষকে এখন আর চেনে কে! তাই বাবা আর বোধিবৃক্ষের তলায় বসলেন না, তার বদলে গিয়ে চাকরী নিলেন বড়োবাজারের পেটমোটা এক শেঠজীর গদীতে। সেখানে অনেক দেখলেন, অনেক শিখলেন, চালে কাঁকর মেশানো, আটায় ভূষি মেশানো, ওষুধে ভেজাল দেওয়া—সব জানলেন। জেনে শুনে বাবার মগজ সাফ হয়ে গেল—তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন।

—কী স্বপ্ন?—টেনিদা জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখলেন, স্বর্গে পালে পালে নেংটি ইঁদুর হানা দিয়েছে—সেখানকার চাল-ডাল-মধু-সুক্তী-ফল-পাকড় সব খেয়ে ফেলেছে, দেবতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে তাড়া করেছে, ইন্দ্র-চন্দ্র-কার্তিক-টার্তিক সবাই 'বাপরে মা-রে' বলে ছুটে পালাচ্ছে। আর ইন্দ্রের ফাঁকা-সিংহাসনে বসে গোঁফ ফুলিয়ে দেবী নেংটীশ্বরী বলছেন—'দেখছিস কি এখন থেকে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আমারই রাজত্ব শুরু হল। আমার হুকুমমতোই সব চলবে।

আজ থেকে তোদের কাজ হল নেংটি ইঁদুরের মতো চুরি করা—গর্ত কেটে, যেখানে যা পাওয়া যায়—সব লোপাট করা। বাঁচতে হলে এখন থেকে এই রাস্তাই তোদের ধরতে হবে।' দেবী এই পর্যন্ত বলতে বলতেই দুটো বেড়ালের ঝগড়ার আওয়াজে বিটকেলানন্দের ঘুম ভেঙে গেল, হুলোর ভয়েই দেবী উধাও হলেন কিনা কে জানে! আর বাবা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'পেয়েছি—পেয়েছি।' তারপরেই দেবী নেংটীশ্বরীর এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

ক্যাবলা বললে, উঃ, কী রোমাঞ্চকর!

টেনিদা ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, পয়লা নম্বরের মেফিস্টোফিলিস।

—মেফিস্টোফিলিস? লোকটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে বললে, তার মানে?

আমি বললাম তার মানে—ইয়াক ইয়াক!

—ইয়াক ইয়াক? সে আবার কী?—লোকটা খাবি খেলো: তোমরা কোন দেশের লোক হে? তোমাদের যে বোঝা যায় না।

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, ছেড়ে দিন, ওদের ছেলেমানুষি ছেড়ে দিন। মানে খুশি হলে ওরা অনেক সময় ও-সব বলে, ওগুলোর কোন মানে নেই। এখন আপনি যা বলছিলেন, বলুন।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বললে, বলতেই তো চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কী সব বিচ্ছিরি ভাষা আউড়ে সব গোলমাল ক'রে দিচ্ছ?

আমি বললুম, বাবা বিটকেলানন্দ এখানে আছেন?

লোকটা আরো ব্যাজার হল: থাকতেই তো চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাও ম্যাও।

—ম্যাও ম্যাও।

—আবার কী?—ওরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল, বলে কিনা, বাবা চোর, বাবা কালোবাজারী! সইবে না—সইবে না!—ভীষণ চটে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল: বাবা যোগবলে জেলের গরাদ ভেঙে বেরিয়ে আসবেন। আর যে হাকিম তাঁকে জেলে দিয়েছে—

টেনিদা বললে, তাঁর কী হবে?

—কী হবে?—দাঁত কিড়মিড় করে লোকটা বলতে লাগল: রাত্তিরে যখন সে ঘুমুবে, তখন মা নেংটীশ্বরী দল বেঁধে গিয়ে তার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। নির্ঘাৎ দেখে নিয়ো।

বলতে বলতেই—

হঠাৎ কোত্থেকে বিকট গলায় যেন বিশটা হুলো বিড়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল: ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও—

আর দারুণ চমকে উঠল লোকটা।

—লুকোও—লুকোও—লুকোও। বাঁচতে চাও তো এখুনি লুকোও। না হলে—

ঘরঘর শব্দে মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরের দরজা বন্ধ হল, সেই তালঢ্যাঙা লোকটা জালে পড়া গলদা চিংড়ির মতো ছটফটিয়ে উঠল, নেংটীশ্বরীর চোখ দুটো ঘরের সেই নানা রঙের আলোতে ঝকঝক করে জ্বলতে লাগল, কেমন যেন মনে হতে লাগল—মা আলোর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে রয়েছেন, এখুনি 'ইচ্‌-কিচ্‌-খিচ' বলে তেড়ে কামড়াতে আসবেন। তার উপরে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছিরি গুমোট গরমে আমরা সিদ্ধ হচ্ছিলুম—কেমন একটা বদ্‌খৎ গন্ধ আসছিল। একবার মনে হল ওটা নেংটী ইঁদুরের, তার পরেই মনে হল, না চামচিকের গন্ধ।

একেবারে বেকুব বনে গিয়ে আমরা চার মূর্তি—আলু সেদ্ধর মত চারটে মুখ করে—এ ওর দিকে চেয়ে রইলুম। আর টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে একবার চুলকে নিয়ে বললে, হুঁ, পুঁদিচ্চেরী।

লোকটা কি রকম চমকে গেল। বললে, পুঁদিচ্চেরী! সে আবার কী?

হাবুল বললে, ওটা হৈল গিয়া ফরাসী ভাষা। তার মানে হৈল, ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক হইয়া উঠ্‌ছে।

তালঢ্যাঙা লোকটা তাই শুনে এমন ব্যাজার হয়ে গেল যে মনে হল, এক্ষুনি কেউ তাকে জোর করে একমুঠো নিমপাতা খাইয়ে দিয়েছে। সে বললে, ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফরাসী ভাষা বলো আর যাই বলো—ফিসফিসিয়ে বলবে। শুনলে না—ম্যাও ম্যাও এসেছে? যদিও এঘরে ঢুকতে পারবে না—আর ঘরটা কী বলে এমন কায়দায় তৈরী যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না এখানে ঘর আছে, তবু সাবধানের বিনাশ নেই—বুঝতে পারছ না?

আমি বললুম, আজ্ঞে সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু ম্যাও-ম্যাওটা—

ক্যাবলা আমাকে একটা চিম্‌টি কাটল, কিন্তু যখন বলেই ফেলেছি, তখন কথাটা আর সামলে নেওয়া যায় না। লোকটা আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন, ম্যাও ম্যাও বুঝতে পারছ না। আচ্ছা নেংটি ইঁদুরের শত্রু কে?

হাবুল বুদ্ধি করে বললে, মানুষ।

—উঁহুঁ হল না।—লোকটা হ-য-ব-র-ল'র কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচের মতো মাথা নেড়ে বললে, হয়নি, ফেল। তোমার মগজে দেখছি কিছু নেই।

ক্যাবলা বললে, আজ্ঞে না, সেই জন্যেই তো ওর নাম হাবলা। নেংটি ইঁদুরের শত্রু হচ্ছে বেড়াল।

—ইয়া, রাইট। তাহলে মা নেংটীশ্বরীর শত্রু কে হতে পারে?

ক্যাবলা বললে, পুলিশ।

—ঠিক্‌, একদম করেক্‌ট্‌। এইবার বুঝতে পারছ তো? আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়েছে। ধরতে যদি পারে আমাদের সকলকে একেবারে সোজা শ্রীঘর।

—শ্রীঘর?—টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, মানে জেল?

লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিলে।

—স্‌-স্‌-স্‌। তোমার তো দেখছি একেবারে হাঁড়ি চাচার মতো গলা হে। একটু আস্তে কথা বলতে পার না? তা ভেবেছো কি? পুলিশে একবার ধরতে পারলে তোমায় কি নেমন্তন্ন করে পোলাও কালিয়া খাওয়াবে? একেবারে তিনটি বছর ঘানি-গাছে ঘুরিয়ে দেবে—খেয়াল থাকে যেন।

টেনিদা ধুপ করে সেই চামচিকের গন্ধভরা মেঝেটার উপর বসে পড়ল, আমার পেটের ভেতরে পিলে-টিলেগুলো যেন কী রকম তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, হাবুল মুখটাকে ফাঁক করে এমন ভাবে চেয়ে রইল যে মনে হল সে এখুনি হাউ-মাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠবে। এ আবার কি ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল রে বাপু। সেই উনপাঁজুরে বিশ্ববখাটে কম্বলকে খুঁজতে এসে শেষে জেল খাটতে হবে—কে জানে কোন্ চুরি বাটপাড়ির দায়েই জেল খাটতে হবে! আগে একটুখানি বুঝতে পারলেও কে এমন ফ্যাচাঙের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিত। কিংবা আমাদের গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল—টেনিদার নাক বরাবর পচা আমটা যখন শত্রুর অদৃশ্য আক্রমণ থেকে ছুটে এসেছিল—সেই তখন।

আসলে, সব দোষ ক্যাবলার। ওই তো কি রকম বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করে দিলে। মনে হল নিরুদ্দেশ কম্বলকে খুঁজে বের করার মতন মহৎ কাজ দুনিয়ায়

www.boiRboi.blogspot.com

আর বুঝি দ্বিতীয়টি নেই। আমার একটা ভীষণ জিঘাংসা জাগল, ইচ্ছে করল, ক্যাবলার গায়ে কয়েকটা লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দিই, কয়েকটা বিছুটির পাতা ঘষে দিই ওর পায়ে। কিন্তু এখানে লাল পিঁপড়েও নেই, বিছুটিও নেই। এখন কেবল পুলিশের হাতে পড়া, তারপর জেল খাটতে যাওয়া।

জেল খাটতেও নয় রাজী আছি, কিন্তু জেল থেকে বেরুবার পর? বড়দা কি পিঠের একফালি চামড়া বাকী রাখবে? কিম্বা জেলে যাওয়ার আগেই এসে এমন ধড়াধ্ ধম্ পিটুনি লাগিয়ে যাবে তাতেই ছ'মাস কাটাতে হবে হাসপাতালে।

আমার চোখের সামনে শর্ষের ফুল-টুল কী সব দুলতে লাগল। যেন দেখতে পেলুম, মা নেংটীশ্বরী মুখটা একটুখানি ফাঁক করে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছেন, তাঁর বাঁকা লেজটা যেন অল্প অল্প নড়ছে মনে হল, আমি যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব, আমার দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে শুনতে পেলুম, টেনিদা তোৎলা হয়ে বলতে লাগল : পুল্ পুল্ পুলিশ—

তাই শুনে লোকটা উচ্চিংড়ের মতো ভেংচি কেটে বললে, ডোন্ট বী ফুলিশ। বললুম তো, সাড়া কিছু করো না—তাহলেই আর টের পাবে না। আজই তো আর প্রথম নয়, এর আগে আরো তিন চারবার তো ম্যাও ম্যাও এসে গেছে, কিন্তু ধরতে পেরেছে কাউকে? নেংটি ইঁদুর একবার গর্তে ঢুকলে বেড়াল কিছু করতে পারে তার? এটা হল মা নেংটীশ্বরীর গর্ত, যতক্ষণ এখানে আছো—ততক্ষণ ওই যে ইংরেজীতে কী বলে—একেবারে সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি।

এর ভেতরেও ক্যাবলা পণ্ডিতী করবার লোভ সামলাতে পারল না। টিক্-টিক্ করে বলতে লাগল : আজ্ঞে ভুল করেছেন। ওটা সাউন্ড এন্ড ফিউরি নয়—সেফ অ্যান্ড সাউন্ড।

তাই শুনে লোকটার মুখ ঠিক একটা ছারপোকার মতো হিংস্র হয়ে গেল। বললে, তুমি থামো হে ছোকরা, বেশি পণ্ডিতি করো না। চল্লিশ বছর এই সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি দিয়ে চালিয়ে দিলুম, তুমি এসেছ ওস্তাদী করতে। বেশি বকিয়ো না এখন, বাইরে শত্রু, নইলে হয় তো বা কান ধরেই পেঁচিয়ে দেব তোমার।

ক্যাবলা রেগে ঠিক একটা টোমাটোর মতো রাঙা হয়ে গেল, তারপর কী একটা গোঁ-গোঁ করে উঠেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাবলার পণ্ডিতি আমরা অবশ্য কেউ-ই পছন্দ করি না, কিন্তু তাই বলে বাইরের একটা উটকো লোক এসে তার কান ধরতে চাইবে—সে স্কলারশিপ পাওয়া কলেজের ছাত্র, এ-ও তো আমাদের পটলডাঙার একটা জ্বালাময়ী অপমান।

যা ভেবেছি তাই—আমাদের লীডার টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে গাঁ গাঁ করে উঠল।

—কী বলছেন মশাই, কান ধরে পেঁচিয়ে দেবেন। আমরা পটলডাঙার ছেলে—খেয়াল রাখবেন সেটা। হয় আপনার কথা উইথড্র করুন নইলে এগিয়ে আসুন—হয়ে যাক এক হাত।

লোকটা বোধ হয় এতটা আশা করেনি, কিরকম ভেবড়ে গেল কথাটা শুনে। একটু আগেই আমি অজ্ঞান হবো হবো ভাবছিলুম, এখন মনে হল মারামারিটা না দেখে অজ্ঞান হবার কোনো মানেই হয় না। চোখ-কান খুলে খুব খুশি হয়ে দেখতে পেলুম, টেনিদা আস্তিন গোটাচ্ছে।

—শিগগির উইথড্র করুন বলছি, নইলে—

লোকটা তালগাছের মত ঢ্যাঙা হলে কী হয়, বেজায় কাপুরুষ। আড়চোখে

টেনিদার চওড়া চিতনো বুকের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। তারপর বললে, আহা—যেতে দাও, মানে—বাইরে পুলিশ, এখন আত্মকলহ করে দরকার নেই। গোলমাল শুনলেই টের পেয়ে যাবে। তার চেয়ে এসো—সরি বলে ফেলা যাক। ওই যে ইংরেজীতে কী বলে—ফরফিট অ্যান্ড ফরগেট—

ক্যাবলা বললে, উঁহু, আবার ভুল হল। ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।

লোকটার মুখ আবার একটা ছারপোকার মুখের মত হিংস্র হতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদার আস্তিনের দিকে তাকিয়ে কী রকম বিবর্ণ হয়ে গেল, তার মুখটাকে ফড়িংয়ের মুখের মতো মনে হল এখন। সে কেমন যেন পিঁপড়ে পিঁপড়ে গলায় চুঁ চুঁ করে বললে, আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হল, ফরগিভ অ্যান্ড ফরফিট।

—আবার ভুল করলেন। ফরফিট্ নয় ফরগেট্।

—তাই হবে, ফরগেট। আমি উইথড্র করলুম। ওহে ছোকরা, তুমি আর আস্তিন-ফাস্তিন গুটিয়ো না। ওদিকে বাইরে পুলিশ, এদিকে আবার হার্ট খারাপ, এর মধ্যে তুমি আবার যদি দুড়ুদ্দুম করে আমাকে ঘুষি লাগিয়ে দাও—তাহলে আর আমি বাঁচব না।

টেনিদা খুশি হয়ে বললে, বেশ আসুন, হ্যান্ডশেক করি। ভাব হয়ে যাক।

—হ্যান্ডসেক? লোকটা সন্দেহে মিটমিটে চোখে চেয়ে রইল : শেষকালে পাঞ্জা ধরে আঙুল-টাঙুল ভেঙে দেবে না তো? আমার শরীর ভালো নয়, সে আগেই বলে রাখছি।

টেনিদা বললে, না-না, কোন ভয় নেই আপনার। মা কালী, মা নেংটীশ্বরীর দিব্যি, আপনার আঙুলে চাপ দেব না। নিন—আসুন হা ডু ডু—

লোকটা বললে, হা-ডু ডু? আমি তো কপাটি খেলিনি। আমি—

কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে পরপর কয়েকটা জোরালো চিঁচির আওয়াজ উঠল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললে, জয়গুরু—লাইন ক্লিয়ার। ম্যাও ম্যাও চলে গেছে!

ঘড়ঘড়িয়ে দরজাটা খুলে গেল। যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম আমরা। আর সব ভুলে-টুলে গিয়ে টেনিদা গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠল : ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টো-ফিলিস—

সঙ্গে সঙ্গে আমরা বললাম, ইয়াক্-ইয়াক্!

লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল—এবার ঠিক আরশোলার মতো হয়ে গেল ওর মুখটা। কী বলে তোমরা চেঁচালে?

—ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক্-ইয়াক আমি জবাব দিলুম।

—মানে কী ওর?

হাবুল সেন বললে, এটা হৈল ফরাসী ভাষা। মানেটা হৈল গিয়া বড়ই কঠিন।

লোকটা পিরু পিরু করে বললে, তাই দেখছি। কিন্তু যাই বলো বাপু তোমাদের হালচাল আমি বুঝতে পারছি না। তোমরা কোন ব্রাঞ্চ থেকে আসছ? চট না চিটে-গুড়? সতরঞ্চি না ধুচনি?

আমরা আর কেউ কিছু বলবার আগেই ফস করে ক্যাবলা বললে, কম্বল।

—কম্বল?—লোকটা ভুরু কোঁচকালো : বুঝেছি, কোনো নতুন ব্রাঞ্চ হবে। কিন্তু এখনো ও সম্বন্ধে আমরা কোনো খবর পাইনি। যাই হোক, ছড়া যখন জানো আর চাঁদনি পর্যন্তও গেছো তখন চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের কাছেই এবার চলো। তার পারমিট পেলে তখনই ছলো ছলো খালের জল পেরুতে পারবে। আর ঘর থেকে বেরুবার

www.boiRboi.blogspot.com

আগে আরো একবার মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম করো, তিনি সব সিদ্ধি দেবেন।

আমরা আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললুম, জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়।

সাত

সেই তালঢ্যাঙা লোকটার সঙ্গে আমরা গুটি গুটি পায়ে বেরোলুম নেংটীশ্বরীর মন্দির থেকে। লোকটা বলল, 'এবার হাওয়া মহল। এই ডানদিকের সিঁড়ি।'

একটা চওড়া সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে আমরা দেখতে পেলুম। এক সময়ে সিঁড়িটা খুব ভালো ছিল, পাথর-টাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল বলে মনে হয়। এখন এখানে ওখানে পাথর উঠে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে, এই দুপুর বেলাতেও কেমন যেন একটা গুমোট অন্ধকার। মাঝে মাঝে রেলিং ভেঙে গেছে। লোকটা বললে, একটু সাবধানে এসো হে—ইয়ে, কী বলে, সিঁড়িটা তেমন সুবিধের নয়। আমরাই কখনো কখনো আছাড়-টাছাড় খাই। দুঃখের কথা আর কী বলব হে, আমাদের গুরুদেব বিটকেলানন্দ তো সিদ্ধপুরুষ, তা তিনিই একবার এমন কুমড়ো-গড়ান গড়ালেন যে—

হাবুল বললে, 'সিদ্ধপুরুষ অ্যাকেবারে ভাজাপুরুষ হইয়া গেলেন।'

লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে কট্‌কট্‌ করে হাবুলের দিকে তাকালো। বললে, 'তুমি তো দেখছি ভারী ফক্কড় হে ছোকরা! গুরুদেবকে নিয়ে মশকরা।'

ক্যাবলা বললে, 'ছেড়ে দিন, ওর কথা ছেড়ে দিন। ওটা একটা ঢাকাই পরোটা।'

'ঢাকাই পরোটা! তার মানে?'

মানেটা বোঝার আগেই একটা চিৎকার ছাড়লুম আর গুরুজী বিটকেলানন্দের মতোই একটা কুমড়ো-গড়ান অনেক কষ্টে সামলে গেলুম। আমার দু-কানে দুটো ঝাপটা মেরে ই-কিচ'-কিচ' বলতে বলতে একজোড়া চামচিকে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লোকটা খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল : 'ভয় নেই হে, ওরা আমাদের পোষা। কিচ্ছু বলে না কাউকে।'

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, 'কী যা-তা বলছেন। চামচিকে কারুর পোষা হয়?'

'হয়—হয়। গুরুজী বিটকেলানন্দ চামচিকে তো দূরের কথা ছারপোকাকে পর্যন্ত বশ মানাতে পারেন। হয়তো ডেকে বললেন, এই খটমল—নিকাল আও বাচ্চা—জেরা ড্যানস করো, অমনি দেখবে তক্তপোষের ফাটল থেকে দলে দলে ছারপোকা বেরিয়ে 'ট্যাংগো' নাচ শুরু করেছে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ট্যাংগো নাচ কাকে বলে?'

লোকটা বললে, 'আমি কী করে জানব? অতই যদি জানব, তা হলে তো অ্যাদ্দিনে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারতুম। এ-সব ধাষ্টামো করে বেড়াতে হত না।'

হাবুল মাথা চুলকোতে লাগল। ভেবে-চিন্তে বললে, 'তা'হলে পাটকেলানন্দেরে ম্যাও-ম্যাও-তে ধইরা লইয়া গ্যাল ক্যান? তিনি তো তাগোও ট্যাংগো কইরা নাচাইতে পারতেন।'

লোকটা আরশোলার মতো ঘাবড়ানো-ঘাবড়ানো মুখ করে বললে, 'বোকো না। এখন সবাই বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে ~~~ দিকি। এইবার কাজের কথা হবে। আমরা এসে গেছি।'

সত্যিই আমরা এসে গিয়েছিলুম। দোতলায়। সামনেই একটা ফাটল-ধরা ময়লা-মতন মস্ত বড়ো ন্যাড়া ছাদ। আর এক কোণায় একটা ঘর। ঘরের সামনে বড়ো একটা খাঁচা, তার ভেতরে একটা বাদুড়—নীচে মাথা দিয়ে ঝুলে রয়েছে। আমাদের দিকে ঘুম-ঘুম চোখ মেলে চেয়ে দেখল একবার।

ক্যাবলা বললে, 'ওকি স্যার—ওখানে একটা বাদুড় কেন?'

'বাদুড় বোলো না, ওর নাম অবকাশরঞ্জিনী।'

'অবকাশরঞ্জিনী!'—ক্যাবলা খাবি খেলো : 'বাদুড়ের কখনো অমন নাম হয়?'

'হয়—হয়। নামের তোমরা কী জানো হে? এ-সব গুরুদেবের লীলা। জানো—উনি একটা ছারপোকার নাম দিয়েছেন বিক্রমসিংহ। আর এই যে বাদুড় দেখছ, ইটি সামান্যি নয়। এই যে অবকাশরঞ্জিনী—এ খুব ভালো খাম্বাজ গাইতে পারে।'

টেনিদা হঠাৎ গাঁ-গাঁ করে বললে, 'কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—একদম গুল।'

'গুল?'—লোকটা কি রকম যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল : 'বেশ, তাহলে এ-সব কথা থাক। এখন কাজের কথা হোক।'

'কার সঙ্গে কাজের কথা?'—আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম : 'ওই অবকাশ-রঞ্জিনীর সঙ্গে নাকি?'

'চুপ!'—ঠোঁটে আঙুল দিয়ে লোকটা বললে, 'দাঁড়াও।'

সামনে ঘরটার দরজা ভেজানো ছিল। ঢ্যাঙা লোকটা আলগোছে একটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আর তক্ষুণি ভেতর থেকে কে যেন কাঁ-কাঁ করে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমার জ্বর হয়েছে, ডিপথিরিয়া হয়েছে, পেটের মধ্যে রিং-ওয়ার্ম হয়েছে, কে জানে জলাতঙ্কও হয়েছে কিনা। আমি এখন যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারি। আমি কোনো কথাই জানিনে হুজুর—আমাকে ছেড়ে দিন।'

আমরা দেখতে পেলুম, ঘরের ভেতরে মাদুর পাতা। তার ওপর একটা লোক একরাশ কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর খালি বিচ্ছিরি গলায় বলছে, 'আমার জলাতঙ্ক হয়েছে স্যার—মাইরি বলছি—এখন লোক পেলেই কামড়ে দেব।'

তিন লাফ দিয়ে আমরা চারজন পিছিয়ে এলুম। ঢ্যাঙা লোকটা বললে, 'আঃ, কী হচ্ছে হে চক্রধর! খামোকা ভদ্দরলোকের ছেলেদের ঘাবড়ে দিচ্ছ কেন? কম্বল ফেলেই চেয়ে দ্যাখোনা একবার। ম্যাও ম্যাও নেই, তারা অনেকক্ষণ চলে গেছে, আমি বিন্দেবন কথা কইছি।'

শুনেই, কাঁথা-কম্বলের ভেতর যেন তুফান উঠল একটা। সেগুলোকে চারদিকে ছিটকে ফেলে সোজা উঠে বসল একটা লোক—যার বর্ণনা এর আগেই আমরা শুনেছি। আমরা চারজন দেখলুম, লোকটার কটকটে কালো রঙ, মুখে একটা ঝোল্লা গোঁফ, কপালের বাঁ-দিকে মস্ত আব। এই দারুণ গরমে কাঁথা-কম্বল চাপা দিয়ে সে ঘামে নেয়ে গেছে, কেমন ম্যাড়মেড়ে মুখ করে সে গঙ্গারামের মতো আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সে বিন্দেবন—অর্থাৎ ঢ্যাঙা লোকটাকে বললে, 'তা তুমি এয়েচো, সেটা আগে কইতি কী হয়েচেলো?'

'কইব কখন?'—বিন্দেবন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের সাড়া পেয়েই তো তুমি কাঁথার ভেতরে সেঁধিয়ে ক্যাচর-ম্যাচর করতে লাগলে।' বিন্দেবন দিব্যি তখন দেশী ভাষায় কথ বলতে লাগল।

'সাবধানের বিনেশ নেই—বুয়েচো না?'—চক্রধর ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেলল : 'এ্যাই দ্যাকো—গরম কম্বল চাপিয়ে ঘেমে নেয়ে গেইচি, এখন বুঝি সর্দি লেগে গেল আবার।

www.boiRboi.blogspot.com

সে যাক—এ'য়ারা?'

'এ'য়ারা খদ্দের।'

খদ্দের? আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালুম। টেনিদা কী একটা বলতেও যাচ্ছিল, ক্যাবলা তার পাঁজরায় ছোট্ট একটা চিমটি কাটল, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। আর চক্রধরও চোখ কুঁচকে আমাদের দিকে চেয়ে রইল—যেন ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

বললে, 'খদ্দের? এত ছেলেমানুষ?'

টেনিদা বললে, 'আমরা কলেজে পড়ি। ছেলেমানুষ নই।'

'তা বটে—তা হলে তো আর ছেলে-মানুষ কওয়া যায় না।'

বিন্দেবন মাথা নাড়ল: 'তা ছাড়া ও'রা ছড়া বলেচেন; চাঁদনীতে তোমার দোকানেও গেছলেন।'—বিন্দেবন আমাদের দিকে তাকালো: 'বুঝছেন তো, ইনিই হচ্ছেন গুরুদেবের প্রধান শিষ্য—পাটকেলানন্দ। একেই বাহিরের লোক চক্রধর সামন্ত বলে জানে। বসুন—বসুন আপনারা!'

আমরা মাদুরে বসে পড়লুম।

পাটকেলানন্দ ওরফে চক্রধর এবার গম্ভীর হয়ে ঝোল্লা গোঁফে তা দিলে। তারপর খানিকক্ষণ ভাবুক-ভাবুক মুখ করে চোখ বুজে বসে রইল। সে যে আর চক্রধর নয়, একেবারে মূর্তিমান পাটকেলানন্দ, সেইটেই যেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল আমাদের। এতক্ষণ যে কম্বলের তলায় পড়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছিল, এখন আর তা বোঝবারও জো নেই।

বাইরে বাদুড়টা হঠাৎ খ্যাঁচম্যাচে আওয়াজ করে উঠল।

সেই আওয়াজে চক্রধর চোখ খুলল।

'ঠিক আছে। অবকাশরঞ্জিনী সাড়া দিয়েছে। ঠিক আছে।'

টেনিদা বোকার মত বললে, 'মানে?'

'মানে অবকাশরঞ্জিনীর ভেতরে গুরুদেব যোগশক্তি সঞ্চার করেছেন। ও ক্যাচ-মেচিয়ে উঠলেই আমরা বুঝতে পারি, কোথাও কোনো গোলমাল নেই।'

'যদি ক্যাঁচম্যাচ না করে?'—আমি জানতে চাইলুম।

'তা হলে খোঁচা দিতে হয়।'

'যদি তাও চুপ কইরা থাকে?'—হাবুল কৌতূহলী হল।

'তখন বুঝতে হবে ব্যাপার খুব সঙ্গীন। তখন তক্কোপোষের ফাটল থেকে বিক্রম-সিংহকে ডাকতে হবে। যাকগে, সে সব অনেক কথা।'—চক্রধর বললে, 'তা হলে আপনারা চারজন?'

টেনিদা বললে, 'হুঁ, চারজন।'

'কোথায় থাকেন?'

—'পটলডাঙ্গা।'

'ছড়া বলুন'—সঙ্গে সঙ্গে নামতা পড়ার মতো আমরা কোরাসে আরম্ভ করলুম: 'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর—'

চক্রধর বললে, 'থাক—থাক, আর দরকার নেই। চন্দ্রকান্তকে ওখানে গিয়েই পাবেন—মানে মহিষাদলে। এই বিন্দেবনই আপনাদের নিয়ে যাবে। টাকার রসিদ আছে তো?'

টাকার রসিদ! আমি চমকে কি বলতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা আমাকে একটা খোঁচা মারল। তারপর বললে, 'আজ্ঞে হাঁ, রসিদ-টসিদ সব আছে। বাড়িতে রেখে এসেছি।'

'তা হলে আর কী? কবে যাবেন?'

ক্যাবলা ফস করে বললে, 'রবিবার?'

'সে তো বেশ কথা। আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভোর ছটার মধ্যে এলে চটপট চলে যেতে পারবেন, সন্দের মধ্যে ফিরেও আসতে পারবেন। রাজী?'

আমরা কিছু বলার আগেই ক্যাবলা বললে, 'রাজী।'

'তা হলে এই কথা রইল।'—চক্রধর আবার ফ্যাঁচ করে হে'চে উঠল: 'ইঃ, জব্বর সর্দিটাই লাগল। খামোকা ক্যাঁথা-কম্বল চাপিয়ে—মরুকগে, এখন মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম করে বাড়ি চলে যান। আর রবিবারে ভোর ছটায় আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ঠিক?'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক।'

'জয় মা নেংটীশ্বরী—তোমারই ইচ্ছে মা!'—চক্রধর শিবনেত্র হয়ে যেন ধ্যানে বসল। তারপর বললে, 'হাঁ, আর একটা কথা। যাবার আগে অবকাশরঞ্জিনীর ভোগের জন্য স'পাঁচ আনা পয়সা রেখে যাবেন মনে করে।'

আট

সে তো হল। রবিবার না হয় মহিষাদলেই গেলুম। কিন্তু তারপর?

সবটাই কি রকম গোলমেলে ঠেকছে। হতচ্ছাড়া কম্বলের আগাগোড়াই বিটকেল ব্যাপার। যখন নিরুদ্দেশ হয়নি, তখন পাড়াসুদ্ধ লোকের হাড় ভাজা করে ফেলছিল; যখন উধাও হল তখনও মাথার ভেতরে বনবনিয়ে কুমোরের চাক ঘুরিয়ে দিলে।

আচ্ছা—তোমরাই বলো, লোকে কি আর নিরুদ্দেশ হয় না! পরীক্ষায় ফেল-টেল করে ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে কিংবা হয়তো ঠাকুর্দার কাছ থেকে একটা গীটার আদায় করবার আশায়, কেউ হয়তো বন্ধুর বাড়িতে চম্পট দেয়—আবার কেউ বা মাসি-পিসির বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারপর যেই বিজ্ঞাপন বেরুল: 'প্রিয় টাপা, শীঘ্র ফিরিয়া আইস! মা মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না', কিংবা 'স্নেহের ন্যাদা, তোমার ঠিকানা দাও—সকলেই কাঁদিতেছে—' তখন গর্তের থেকে পিঁপড়ের মতো সব সুড়সুড় করে একে একে বেরিয়ে এল। তারপর বরাত বুঝে কারুর অদৃষ্টে চাঁটানি, কারুর বা হাওয়াইয়ান গীটার!

কিন্তু এই সব ভালো ছেলেদের মতো বুঝে-সুঝে 'নিরুদ্দেশ' হবে, কম্বলচন্দর কি সে জাতের নাকি? তার কাকা বলে বসল—সে চাঁদে গেছে, তার নাকি ছেলেবেলা থেকেই চাঁদে যাওয়ার 'ন্যাক' আছে একটা? এ-সব বাজে কথা কে কবে শুনেছে? তারপরে ল্যাঠার পর ল্যাঠা! কোত্থেকে কান ঘেঁষে এক আমের আঁটি, একটা যাচ্ছেতাই ছড়া—চাঁদনির বাজার, শেয়ালপুকুর, পাটকেলানন্দ, মা নেংটীশ্বরী, ঝোল্লা-গোঁফ চক্রধর সামন্ত—বাদুড়ের নাম অবকাশরঞ্জিনী—ধুত্তোর, কোনো মানে হয় এ-সবের?

এতেও শেষ নয়। এখন আবার ঘাড়ে চড়াও হয়েছে এক তালঢ্যাঙা বিন্দেবন। আবার তার সঙ্গে রবিবারে মহিষাদলে যেতে হবে। মহিষাদল নামটাই যেন কি রকম—শুনলেই মনে হয় একদল বুনো মোষ শিং বাগিয়ে তাড়া করে আসছে। কপালে কী আছে, কে জানে। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর আমাদের কোন্ চাঁদে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে—তাই বা কে বলতে পারে।

তারপর আবার কী সব রসিদ-ফসিদের কথাও বলছিল চক্রধর। তার মানে, অনেক

www.boiRboi.blogspot.com

গণ্ডগোল আছে ভেতরে। ক্যাবলা সমানে তো টিক্ টিক্ করছে, কিন্তু মহিষাদলের মোষদের পাল্লায় পড়ে—

আমি আর হাবুল সেন এসব নিয়ে অনেক গবেষণা করলুম।

হাবুল ভেবে-চিন্তে বললে, সত্য কইছিস্ প্যালা। আমরা ফ্যাচাঙে পড়ুম।

আমি বললুম, পেছনে আবার পুলিশ আছে ওদের। কী করছে লোকগুলো কে জানে। শেষকালে আমাদের সুদ্ধু ধরে নিয়ে যাবে।

হাবুল—তা লইয়া যাইবো। লইয়া গিয়া রাম-পিটানি দিবো।

আমি বললুম, আর বাড়িতে?

—কান ধইরা ছিঁড়্যা দিবো। পুলিশের পিটানির থিক্যাও সেটা খারাপ।

আমি বললুম, অনেক খারাপ। তোর হয়তো একটা কান ছিঁড়ে দেবে, কিন্তু মেজদার বরাবর নজর আমার কানের দিকেই। ওর ডাক্তারী কাঁচি দিয়ে কচাকচ করে কেটে নেবে।

হাবুল কিছুক্ষণ ভাবুকের মতো আমার কানের দিকে চেয়ে রইল। শেষে মাথা নেড়ে বললে, তা কাইট্যা নিলে তোরে নেহাৎ মন্দ দ্যাখাইবো না। তোর খাড়া খাড়া কান দুইখান—

আমি বললুম, শাট আপ! বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে হাব্লা!

হাবুল ফের বললে, আইচ্ছা, মনে যদি কষ্ট পাস, তাহলে ওই সব কথা থাকুক। তোর আদরের কান দুইখ্যান লইয়া তুই ঘাস-ফাস চাবা। তা অখন কী করন যায়, তাই ক'।

আমার ইচ্ছে করছিল হাবলাকে একটা চড় বসিয়ে দিই, কিন্তু ভেবে দেখলুম এখন গৃহযুদ্ধের সময় নয়। এই সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর হাব্লার সঙ্গে একটা ফয়সালা করা যাবে।

রাগ-টাগ সামলে নিয়ে বললুম, তা হলে চল, ক্যাবলার কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি—যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আর দরকার নেই, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের চাঁদবদন না দেখলেও আমাদের চলবে।

হাবুল বললে, হ। দ্যাখনের তো কত কী-ই আছে। ইচ্ছা হইলেই তো চিড়িয়াখানায় গিয়া আমরা জলহস্তীর বদনখান দেইখ্যা আসতে পারি। আর কম্বলরে দিয়াই বা আমাগো কী হইবো? পোলা তো না—য্যান্ একখানা চামচিকা। চক্রধরের অবকাশ-রঞ্জিনীর থিক্যাও খারাপ।

আমি সায় দিয়ে বললুম, বিক্রমসিংহের চাইতেও খারাপ। সে তো শুধু আরশোলা, ও একটা কাঁকড়াবিছে।

এই সব ভালো ভালো আলোচনা করে আমরা ক্যাবলার কাছে গেলুম। কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। তার মা—মানে মাসিমা ছানার মুড়কি তৈরী করছিলেন, আমাদের বসিয়ে তাই খেতে দিলেন। আমরা ক্যাবলার ওপর রাগ করে এত বেশি খেয়ে নিলুম যে ক্যাবলার জন্যে কিছু রইল বলে মনে হল না।

পেট ঠাণ্ডা হলে মন খুশি হয়, আমরা দুজনে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যেই টেনিদার বাড়ির কাছে পৌঁছেছি, অমনি কোত্থেকে হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—বেলা দশটার সময় অমন গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছিস যে দুজনে? ব্যাপার কী?

হাবুল বললে, আমরা সঙ্গীত-চর্চা করতে আছিলাম।

—সঙ্গীত-চর্চা? ওকে চচ্চড়ি বলে। তোদের গানের চোটে পাড়ায় আর কুকুর

www.boiRboi.blogspot.com

থাকবে না মনে হচ্ছে। তা এত আনন্দ কেন? কী হয়েছে?

—আমরা ক্যাবলার বাড়িতে গিয়ে ছানার মুড়কি খেয়ে এসেছি।

—আমি জানালুম।

—অ, তাই এত ফুর্তি হয়েছে। তা আমাকে ডেকে নিলি না কেন? ক্যাবলাও এমন বিশ্বাস-ঘাতক?

—ক্যাবলাকে বাড়িতে পাই নি। আর তোমার কথা আমাদের মনে ছিল না।

—মনে ছিল না?—টেনিদা চটে গেল। মুখটাকে বেগুন ভাজার মতো করে বলল, ভালো কাজের সময় মনে থাকবে কেন?—যা বেরো এখান থেকে, গেট আউট।

আমি বললুম, আউট আবার কোথায় হবো? বেরুবার আর জায়গা কোথায়? আমরা তো রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।

টেনিদার মুখটা এবারে খোকার ডালনার মতো হয়ে গেল। আরো ব্যাজার হয়ে বললে, ইচ্ছে করছে দুই চড়ে তোদের দাঁতগুলোকে দাঁতনে পাঠিয়ে দিই। তা হলে মরুগে যা—রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে কুকুর তাড়া গে।

হাবুল বললে, না, কুকুর তাড়ামু না। তোমার কাছে আসছি।

—আমাকে তাড়াতে চাস?

—বালাই, ষাইট্ তোমারে তাড়াইবো কেডা? তুমি হইলা আমাগো লীডার—যারে কয় ছত্রপতি। তোমার কাছে এ্যাক্টা নিবেদন আছিলো।

—ইস্—ছানার মুড়কি খেয়ে খুব যে ভালো ভালো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। টেনিদা একটা ভেংচি কাটল : তা নিবেদন কী?

—আমরা মহিষাদলে যামু না। মইষে গুঁতাইয়া মারবো।

—যাসনে।—বাঘাটে গলায় টেনিদা বললে, লোকের বাড়ি বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়া। কাপুরুষ কোথাকার। কাওয়ার্ডস্ মেনি ডেথ্ ডাইজ—ইয়ে—টাইম—মানে বিফোর—

আমি বললুম, উঁহু, ভুল হল। কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি ডেথ্স্—

ছানার মুড়কির রাগ টেনিদা ভুলতে পারছিল না, চিৎকার করে বললে, শাটাপ্! তোকে আর আমার ইংরিজি শুদ্ধু করতে হবে না—নিজে তো একত্রিশের ওপরে নম্বর পাস্ না! মরুক্ গে, কোথাও যেতে হবে না তোদের। আমি আর ক্যাবলা যাব, একটা দারুণ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব কম্বলকে, বীরচক্র পুরস্কার পাব আর তোরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবি। কম্বলের কাকা যখন খাটি দেবে, তখন পোলাওয়ের গন্ধে দরজায় তোরা ঘুরঘুর করবি, ঢুকতে দেবে না, পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

এই বলে টেনিদা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর ধড়াস করে বন্ধ করে দিল দোরটা।

তখন আমি আর হাবুল সেন এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। আমি বললুম, বুঝলি হাবল, ব্যাপারটা রীতিমতো সঙ্গীন।

হাবুল বললে, হ। টেনিদা যারে পুঁদিচ্চেরি কয়, তাই। কি রকম য্যান্ মেফিস্টো-ফিলিস মেফিস্টোফিলিস মনে হইত্যাছে।

আমি বললুম, তা হলে তো যেতেই হয়, কী বলিস?

হইবোই তো। বীরচক্র আমরাই বা পামু না ক্যান্? আর কম্বলের কাকা যখন অগো মাংস-পোলাউ খাওয়াইবো—

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, আর বলিস্ নি, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখিস, আমরাও খাব, নিশ্চয় খাব।

যা থাকে কপালে—পটলডাঙা জিন্দাবাদ! আমরা চারজন—সেই কথা মতো—চক্রধরের দোকানের সামনে থেকে—বিন্দেবনের সঙ্গে মহিষাদলে বেরিয়ে পড়েছি। বাড়িতে বলে এসেছি রবিবারে এক বন্ধুর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসব।

আসবার আগে মেজদা বলে দিয়েছে, পরের বাড়িতে গিয়ে মওকা পেয়ে যা-তা খাসনে। ওই তোর পিলে-পট্‌কা শরীর, শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবি।

কী খাওয়া যে কপালে আছে—সে শুধু আমিই বুঝতে পারছি। কিন্তু বেঁচে থাকতে কাওয়ার্ড হওয়া যায় না—না হয় মোষের গুঁতোতেই প্রাণ দেব। আমি কেবল বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা।

—আচ্ছা-আচ্ছা কী? যদি পেটের গোলমাল হয়, তা হলে তোকে ধরে আটটা ইন্‌জেক্‌শন দেব—সে-কথা খেয়াল থাকে যেন।

বাড়ির ছোট ছেলে হওয়ার সব চাইতে অসুবিধে এই যে, কোথাও কোনো সিম্‌প্যাথি পাওয়া যায় না। এমনি ভালোমানুষ ছোট্‌দি পর্যন্ত খ্যা-খ্যা করে হাসছিল। আমি চটে-মটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই সব অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুও ভালো।

পাঁশকুড়া লোক্যালে চেপে আমরা রওনা হয়েছি হাওড়া থেকে। বিন্দেবন বললে, আমাদের নামতে হবে মেচেদায়, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক হয়ে মহিষাদল। শুনে যত দূর মনে হচ্ছে তা নয়—যেতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু মেচেদা নাম শুনেই আমার কী একটা ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। একবার মামার সঙ্গে মেদিনীপুরে যাওয়ার সময়—এই মেচেদাতে—ঠিক ঠিক!

আমি বলে ফেললুম, খুব ভালো সিঙ্গাড়া পাওয়া যায় কিন্তু!

টেনিদার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু বিন্দেবনের সামনে প্রেস্টিজ্ রাখবার জন্যেই বোধহয়, দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে ধমক দিলে একটা: এটা একটা রাক্ষস। রাত-দিন কেবল খাই-খাই।

বিন্দেবনকে যতটা খারাপ লোক ভেবেছিলুম, দেখলুম সে তা নয়। মিটমিট করে বললে, তা ছেলেমানুষ, খিদে তো পেতেই পারে। খাওয়াব খোকাবাবু—মেচেদার সিঙ্গাড়া খাওয়াব, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না! তারপর কলেজের ছেলে হয়েও তোমরা যখন আমাদের দলে এয়েচ, তখন তো মাথার মণি করে রাখব তোমাদের।

'দলে এয়েচ!' এই কথাটাই আমার কেমন ভালো লাগল না। মনে পড়ল মা নেংটীশ্বরীর সেই মূর্তি—যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে। মনে পড়ল, হঠাৎ সেই 'ম্যাও-ম্যাও' এসে হাজির—চারিদিকে কি রকম সামাল্ সামাল্ রব। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় চলেছি আমরা? কী আছে আমাদের কপালে?

টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রয়েছে। বীরচক্র পাবার জন্যে তখন খুব লাফালাফি করছিল বটে, কিন্তু এখন যেন কেমন ভেবড়ে গেছে বলে মনে হল। হাবুলকে বোধহয় গাড়ীর বেঞ্চিতে ছারপোকায় কমড়াচ্ছিল—সেই বিক্রমসিংহই কিনা কে জানে—সে কিছুক্ষণ পা-টা চুলকে হঠাৎ বিচ্ছিরি গলায় গান ধরল:

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—

সকল দেশের রাণী'—ইয়ে—একবার খুব জোরে গা চুলকে প্রায় দাপিয়ে উঠল: ইস্—কী কামড়াচ্ছে রে! 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি—'

তার গান আর গা চুলকোনোতে প্রায় ক্ষেপে গেল টেনিদা। চেঁচিয়ে বললে,

www.boiRboi.blogspot.com

জন্মভূমি না তোর মুণ্ডু! চুপ কর বলছি হাবুলা, নইলে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেব তোকে।

বিন্দেবন বললে, আহা দাদাবাবু তো ভালোই গাইছেন! থামিয়ে দিচ্ছেন কেন?

তা হলে হাবুলের গানও কারুর ভালো লাগে! হাবুল এত আশ্চর্য হল যে গা চুলকোতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ক্যাবলা একটা ওয়াইড্ ওয়ার্লড্ ম্যাগাজিন পড়ছিল, সেটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। টেনিদা বললে, কী ভয়ানক!

বিন্দেবন জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে বললে, এই যে—কোলাঘাট এসে গিয়েচে। এর পরেই আমরা পেঁছে যাব মেচেদায়।

নয়

মেচেদার সিঙ্গাড়া-টিঙ্গাড়া খেয়ে, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক পৌঁছানো গেল। সেখান থেকে আবার বাস বদলে মহিষাদলে।

নাম শুনে যে-রকম ভয়-টয় ধরে যায়, গিয়ে দেখলুম আদৌ সে রকম নয়। বরং বেশ ছিমছাম জায়গাটা—দেখে-টেখে ভালোই লাগে। খুব বড়ো একটা রাজার বাড়ি আছে, একটা উঁচু রথ আছে, বাজার আছে, অনেক লোকজন আছে। মানুষগুলোকেও তো বেশ সাদা-মাটা মনে হল, কোথাও যে কোনো ঘোর-প্যাঁচ আছে সেটা বোঝা গেল না। আর একটা মোটে মোষ দেখতে পেলুম, একজন তার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে সে মোটেই গুঁতোতে চাইল না।

বিন্দেবন তিনটে রিক্‌শা ডাকল। বললে, তা হলে চলুন, একেবারে মালখানাতেই যাওয়া যাক।

টেনিদা বললে, মালখানা? সে আবার কোথায়?

বিন্দেবন বললে, দেখা নেই তো সব। চন্দ্রকান্তদার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে। তিনিই মালপত্তর সব দেখিয়ে দেবেন। তারপর কলকাতায় কোথায় আপনারা ডেলিভারি নেবেন, সে সবও ওখানেই ঠিক হয়ে যাবে।

মালপত্তর! আমি আর ক্যাবলা একটা রিকশায় চেপে বসেছিলুম। মালপত্তর শুনেই আমার কিরকম যেন বিচ্ছিরি লাগল, সেই শেয়ালপুকুরের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল সেই ম্যাও ম্যাও আসবার কথা, আমি ক্যাবলাকে চিমটি কাটলুম একটা।

ক্যাবলা আমাকে পাল্টা এমন আর একটি চিমটি কাটল যে আমি প্রায় চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিলুম। ক্যাব্‌লা আমার কানে কানে বললে, এখন চুপ করে থাক্ না—গাধা কোথাকার।

চিমটি আর গাধা শব্দটা এ অবস্থাতে আমাকে হজম করে নিতে হল—কী আর করা! সব ব্যাপারটাই এখন এমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে যে আমি গাধার মতোই চুপ করে বসে রইলুম। অবিশ্যি গাধা যে সব সময়ে চুপচাপ বসে থাকে তা নয়—মনে একটু ফুর্তি-টুর্তি হলেই বেশ দরাজ গলায় 'প্যাঁহোঁ হ্যাঁ হোঁ' বলে তারস্বরে গান গাইতে থাকে। আমার গলায় গান-টান শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু কুঁই কুঁই করে কেমন একটা বেয়াড়া গানের আওয়াজ আসছে না? আসছেই তো। তাকিয়ে দেখলুম, সামনের রিক্‌শাতে বসে গান ধরেছে তালঢ্যাঙা বিন্দেবন।

'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো—'

এ যে দেখছি গানের একেবারে গন্ধর্ব! আমার চাইতেও সরেশ, হাবলার ওপরেও এক কাঠি। এমন ভালো গানটারই বারোটা বাজিয়ে দিলে! তাছাড়া এমন সকালের রোদ্দুরে চাঁদের আলোই বা পেলো কোত্থেকে! সেই চাঁদের আলোয় বিন্দেবন আবার মরতেও চাইছে। তা নিতান্তই যদি মরতে চায়, তা হলে নয় মারাই যাক্‌, আমরাও ওর জন্যে শোকসভা করতে রাজী আছি, কিন্তু সে জন্যে অমন চামচিকের মতো গলায় গান গাইবার মানে কী? নিজে এমন গাইয়ে বলেই বোধহয় সে হাবলার গানের তারিফ করছিল।

রিক্‌শা বেশ ঠুনঠুন করে নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিল। দু-দিকে বাড়ি-টাড়ি আছে, গাছপালা, মাঠ এই সব আছে, ভারী সুন্দর হাওয়া দিয়েছে, আকাশটা যেন নীল চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে, এদিকে আবার একটা খালের জল রোদে ঝিলমিল করে উঠছে। বিন্দেবনের মনে ফুরতি হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে—

আমি আর থাকতে পারলুম না। ক্যাবলাকে জিজ্ঞেস করলুম, চামচিকের গান শুনেছিস কখনো! ক্যাব্‌লা বললে, না।

—তা হলে ওই শোন। বিন্দেবন গান গাইছে।

ক্যাব্‌লা বললে, চামচিকে তো তবু ভালো। তুই গান গাইলে তো মনে হয় যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকছে। এখন আর ইয়ার্কি করিসনে প্যালা—অবস্থা খুব সঙ্গীন। আমরা দারুণ বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। দারুণ বিপদ! শুনেই আমি খাবি খেলুম। বিন্দেবনের গান শুনে, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ আর ঝিরঝিরে হাওয়ার ভেতরে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ক্যাবলা আমাকে এমন দমিয়ে দিলে যে বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

চিঁ চিঁ করে বললুম, কি বিপদ?

—একটু পরেই জানতে পারবি।

—তাহলে আমরা রিক্‌শা চেপে কেন যাচ্ছি বিন্দেবনের সঙ্গে? নেমে পড়ে সোজা চম্পট দিলেই তো পারি। ইচ্ছে করে কেন পা বাড়াচ্ছি বিপদের ভেতরে?

ক্যাবলা আরো গম্ভীর ভাবে বললে, আর ফেরবার পথ নেই। এখন একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাবে। আমি বললুম, কিন্তু ওস্‌পার করে কী লাভ? এস্‌পারে থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

—তা যায় কিন্তু কম্বলকে তা হলে পাওয়া যাবে কী করে?

ঠিক কথা। ওই লক্ষ্মীছাড়া কম্বল। যত গণ্ডগোল ওকে নিয়েই। মাস্টারের ভয়ে পালালি তো পালালি—আবার বিটকেল একটা ছড়া লিখে গেলি কি জন্যে? চাঁদে গেছে না হাতি। সেই যে কারা সব নরমাংস খায়, তাদের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর তারা কম্বলকে দিয়ে অম্বল রেঁধে খেয়ে বসে আছে।

কিন্তু কম্বলকে কি কেউ খেয়ে হজম করতে পারবে? আমার সন্দেহ হল। ও ঠিক বাতাপি কিংবা ইল্বলের মতো তাদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। যেদিন কম্বল কোত্থেকে দুটো গুবরে পোকা এনে আমার শার্টের পকেটে ছেড়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই ওকে আমি চিনে গেছি।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে, প্যালা!

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললুম, আবার কী হল?

—এই যে খালের ধার দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এ দেখে কিছু মনে হচ্ছে না তো?

—কী আবার মনে হবে?

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা আরো ফিসফিস করে বললে, আভিতক্‌ তুম্‌ নেহি সমঝা? আরে—সেই যে ছড়াটা 'ছল ছল খালের জল'—

ঠিক ঠিক। 'নিরাকার মোষের দল'—মানে 'মোষ-টোষ' বিশেষ কিছু নেই অথচ 'মহিষাদল' আছে, আর দেখাতেই 'ছল ছল'—আরে, অক্ষরে অক্ষরেই মিলে যাচ্ছে যে!

ক্যাবলা মিট মিট করে হেসে বললে, কী বুঝছিস?

—কিছুই না।

—তোর মাথা তো মাথা নয়, যেন একটা খাজা কাঁটাল। চশমাপরা নাকটাকে কুঁচকে, মুখখানাকে স্রেফ আমড়ার চাটনির মতো করে ক্যাবলা বললে, এটাও বুঝতে পারছিস না? এবার রহস্য প্রায় ভেদ হয়ে এল।

—কিন্তু ভেদ করবার পরে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমাদের শুদ্ধ ভেদ করে দেবে না তো?

—দেখাই যাক্‌। আগেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বলতে বলতে রিক্‌শা থেমে গেল। সামনেই একটা হলদে দোতলা বাড়ি। তার নাম লেখা আছে বড়ো বড়ো হরফে : 'চন্দ্র নিকেতন।'

রিক্‌শা থেকে নেমে বিন্দেবন ডাকতে লাগল : আসুন দাদাবাবুরা, নেমে আসুন। এই বাড়ি।

ক্যাবলা আবার আমার কানে কানে বললে, এইবারে শেষ খেল্‌—বুঝেছিস? বাড়ির নাম চন্দ্র ভবন—অর্থাৎ কিনা—'চাঁদে চড়্‌—চাঁদে চড়্‌!' এইটেই তা হলে শ্রীকম্বলের সেই চাঁদ।

—কম্বলের চাঁদ! এইখানে?—আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে, বোকার মতো বসে আছিস কী? টেনিদা, হাবলা আর বিন্দেবন যে ভেতরে চলে গেল। নেবে আয়—নেবে আয়—

ওদিক থেকে বিন্দেবনের হাঁক শোনা গেল : অ রিক্‌শোওলারা—একটু দেঁইড়ো যাও, আমি এক্ষুণি তোমাদের পয়সা এনে দিচ্ছি।

বিন্দেবন একটা মস্ত ঘরের ভেতর আমাদের নিয়ে বসালো।

ঘরের আধখানা জুড়ে ফরাস পাতা—তার ওপর সাদা চাদর বিছানো। বাকী আধখানায় মস্ত একটা দাঁড়ি-পাল্লা আর কতগুলো কিসের বস্তা যেন সাজানো রয়েছে। একটা ছোট্ট কুলুঙ্গিতে সিঁদুর মাখানো গণেশের মূর্তি। দেওয়ালে একটা রঙিন ক্যালেন্ডার রয়েছে—তাতে লেখা আছে 'বিখ্যাত মশলার দোকান—শ্রীরামধন খাঁড়া খড়্গপুর বাজার, মেদিনীপুর।' দেওয়ালে আবার দু তিন জায়গায় সিঁদুর দিয়ে লেখা রয়েছে 'জয় মা'। মা যে কে ঠিক বুঝতে পারলুম না, বোধ হল নেংটীশ্বরীই হবেন। কিন্তু এ-সব 'জয় মা' আর 'খাঁড়া টাঁড়া' আমার একদম ভালো লাগল না, বুকের ভেতরটায় কি রকম ছাঁৎ করে উঠল, একেবারে পাঁঠা বলির কথা মনে পড়ে গেল।

আমরা চারজনে বসে আছি। ক্যাবলা গম্ভীর, টেনিদা মিট-মিট করে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, হাবুল এক মনে পা চুলকোচ্ছে—বোধহয় ট্রেনের ছারপোকাগুলো ঢুকে আছে ওর জামাকাপড়ের তলায়। আমি ভাবছি, ওই খাঁড়া-টাঁড়া দিয়ে ওরা 'জয় মা' বলে কম্বলকে বলি দিয়েছে কিনা, এমন সময়—

দুজন লোক ঘরে এল। বেশ ভালো মানুষের মতোই তাদের চেহারা, তার চাইতেও ভালো তাদের হাতের প্লেট নামিয়ে দিয়ে বললে, একটু জলযোগ করুন বাবুরা, কর্তা এখুনি আসছেন।

মেচেদার সিঙ্গাড়া এর মধ্যেই যখন তলিয়ে গিয়েছিল, আমরা খুশি হয়েই কাজে

লেগে গেলুম। প্লেটে তিন চার রকমের মিষ্টি, কাজু বাদাম, কলা। মোতিচুরের লাড্ডুতে কামড় দিয়েই আবার আমার মনটা ছটফটিয়ে উঠল। বলির পাঁঠাকেও তো বেশ করে কাঁটাল পাতা-টাতা খাওয়ায়। এরাও কি—

আমি বললুম, ক্যাবলা—এরা—

ক্যাবলা কেবল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে, চুপ।

এর মধ্যেই দেখলুম টেনিদা হাবুলের প্লেটের থেকে কি একটা খপ করে তুলে নিলে। আর তুলেই গালে পুরল। হাবুল চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কী যেন বলতেও চাইল, সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় বাঁ-হাত দিয়ে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারল টেনিদা।

—যা-যা, ছেলেমানুষের বেশি খেতে নেই। অসুখ করে।

একটা শান্তিভঙ্গ ঘটতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল বিন্দেবন। আর পেছনে যিনি ঢুকলেন—

বলবার দরকার ছিল না, তিনি কে। তাঁর নাকের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারলুম। আমাদের টেনিদার নাক চেয়ে দেখবার মতো—আমরা সেটাকে মৈনাক বলে থাকি, কিন্তু এর নাকের সামনে কে দাঁড়ায়। প্রায় আধ হাতটাক লম্বা হবে মনে হল আমার—এ নাক দিয়ে দস্তুরমতো লোককে গুঁতিয়ে দেওয়া চলে।

আধ বুড়ো লোকটা চকচকে টাক আর কাঁচা পাকা গোঁফ নিয়ে এক গাল হাসল। সে হাসিতে নাকটা পর্যন্ত যেন জ্বল-জ্বল করে উঠল তার। বললে, 'দাদাবাবুরা দয়া করে আমার বাড়িতে এয়েচেন, বড্ড আনন্দ হল আমার। অধমের নাম হচ্ছে চন্দ্রকান্ত চাঁই—এঁরা আদর করে আমায় নাকেশ্বর বলেন।'

টেনিদা আবার কী একটা হাবুলের প্লেট থেকে তুলে নিয়ে গালে চালান করল। তারপর ভরাট-মুখে বললে, আজ্ঞে হাঁ, আমাদেরও ভারি আনন্দ হল।

চন্দ্রকান্ত ফরাসে বসে পড়ে বললে, অল্প বয়সেই আপনারা ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েচেন। এ ভারি সুখের কথা। দিনকাল তো দেখতেই পাচ্ছেন। চাকরী-বাকরীতে আর কিছু নেই, একেবারে সব ফক্কা! এখন এই সব করেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিটকেলানন্দ গুরুজী সেই জন্যেই আমাদের মন্তর দিয়েছেন: 'ধনধাত্রী মা নেংটিশ্বরী, তোমারই ল্যাজ পাকড়ে ধরি।'—আহা!

শুনেই বিন্দেবনের চোখ বুজে এল। সেও বললে, আহা-হ!

চন্দ্রকান্ত বলে চলল, 'মা নেংটিশ্বরীর অপার দয়া যে আপনারা এই বয়েসেই মা-র ল্যাজে আশ্রয় পেলেন। জয় মা!'

বিন্দেবনও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল: জয় মা! তাই দেখে আমরা চারজনও বললুম, জয় মা!

আমরা তিনজন ভালোই খেয়ে নিয়েছিলুম এর ভেতর—কেবল হাবুল সেন হাঁড়ির মত মুখ করে বসে ছিল।

টেনিদা খেয়ে দেয়ে খুশি হয়ে বললে, আপনাদের এখানে তো বেশ ভালোই মিঠাই পাওয়া যায় দেখছি। মানে কলকাতায় আমরা তো বিশেষ পাই-টাই না—মানে ছানা-টানা বন্ধ—

চন্দ্রকান্ত বললে, বিলক্ষণ! আমাদের এখানকার মিষ্টি তো নাম করা। আরও কিছু আনাবো?

টেনিদা ভদ্রতা করে বললে, না—মানে ইয়ে—এই হাবুল একটা চমচম খেতে চাইছিল—

—নিশ্চয়-নিশ্চয়—চন্দ্রকান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডাকল ওরে বিধু, আরও ক'টা

চমচম নিয়ে আয়। আরো কিছু এনো।

—চন্দরদা, এত আদর করে খাওয়াচ্ছ কাকে?—বাজখাই গলায় সাড়া দিয়ে আর একটি লোক ঘরে ঢুকল। হাতকাটা গেঞ্জীর নীচে তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ডুমো ডুমো হাতের মাস্‌ল, ছাঁটা ছাঁটা ছোট চুল, করমচার মতো টকটকে লাল তার চোখের দৃষ্টি।

চন্দ্রকান্ত বললে, এঁরা কলকাতা থেকে এয়েচেন—ছড়া বলেচেন—আমাদের হেড্‌ আপিসে গিয়েচেন—

সেই প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে একটা হুঙ্কার করল। বললে, চন্দরদা সর্বনাশ হয়েছে। এরা শত্রু!

আমরা যত চমকালুম, তার চাইতেও বেশি চমকালো চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন! —শত্রু!

—আলবাৎ!—দাঁতে দাঁতে কিশ্‌ কিশ্‌ করতে করতে একটা রাক্ষসের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল জোয়ানটা: আমি খগেন মাশ্চটক—আমার সঙ্গে চালাকি। এরা সেই পটলডাঙার চারজন—চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে থাকে, আমার সেই বিচ্ছু ছাত্র কম্বলকে এদের পিছে পিছেই আমি ঘুর ঘুর করতে দেখেছি!—করমচার মতো চোখ দুটোকে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন মাশ্চটক বললে, এত বড়ো এদের সাহস যে আজ একেবারে বাঘের গর্তে এসে মাথা গলিয়েছে। আজ যদি আমি এদের পিটিয়ে মোগলাই পরোটা না করে দিই, তা হলে আমি মিথ্যেই স্বামী বিট্‌কেলানন্দের চ্যালা!

দশ

একেই বলে আসল পরিস্থিতি—টেনিদার ভাষায় বলা—'পুঁদিচ্চেরি!'

ঘরের ভিতরে বাজ পড়েছে—এই রকম মনে হল। চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন হাউ-মাউ করে উঠল, আমরা চারজন একেবারে চারটে জিভেগজার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলুম। আর পাকা করমচার মতো ক্ষুদে ক্ষুদে লাল চোখ দুটোকে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ক্ষ্যাপা মোষের মতো চেঁচাতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর জোয়ান খগেন মাশ্চটক।

আর এতক্ষণে আমার মনে হল, এই মোষের মতো খগেনটা আছে বলেই জায়গাটার বোধহয় নাম হয়েছে মহিষাদল। সেই সঙ্গে আরো মনে পড়ল আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কেন যেন খামোখাই আমার বাঁ কানটা কটকট করছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল, আজ একটা যাচ্ছেতাই রকমের কিছু ঘটে যাবে।

আমরা পটলডাঙার চারজন—বিপদে পড়লে কি আর ভয়-টয় পাই না? আমি যখন আগে ছোট ছিলুম, পেট ভর্তি পিলে নিয়ে প্রায়ই জ্বরে পড়তুম, তখন রাত্তিরে —জানলার বাইরে একটা হুতুম প্যাঁচা হুমহাম করে ডেকে উঠলেও, ভয়ে আমার দম আটকে যেত। তারপর বড়ো হলুম, দু-একটা ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেল বরাতে। তখন দেখতে পেলুম, বিপদে ঘাবড়ে যাবার মতো বেকুবি আর কিছু নেই। তাতে বিপদ কমে না—বরং বেড়েই যায়। তার চাইতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হয়, এখন কী করা যায়—কী করলে সব চাইতে ভালো হয়! তা ছাড়া আরো দেখেছি—যারা আগ বাড়িয়ে ভয় দেখাতে আসে, তারা নিজেরাই মনে মনে ভীরু। পিঠ সোজা করে—বুক

www.boiRboi.blogspot.com

টান করে—মনে জোর নিয়ে রুখে দাঁড়ালে তারাই অনেক সময় পালাতে পথ পায় না।

আমি দলের তিনজনের দিকে চেয়ে দেখলুম। আমার বুকটা একটু দুর দুর করছিল—হাবুল পা চুলকোতে চুলকোতে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, এখন একটা মজা করবো, চুপ কইর‍্যা বইস্যা থাক। ক্যাবলার হাতে একটা ঘড়ি ছিল, সে বার বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। আর আমাদের টেনিদা—বিপদ এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে লীডার হয়ে যাবে—আমি দেখলুম, সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খগেনের দিকে, আর একটু একটু করে শার্টের আস্তিন তুলছে ওপর দিকে।

তখন আমার মনে পড়ল—টেনিদা বক্সিং জানে, 'জুডো' মানে জাপানী কুস্তিটাও সে শিখে নিয়েছিল গত বছর; তক্ষুনি আমার বুকের ধুকধুকুনি থেমে গেল খানিকটা। বুঝতে পারলুম, খগেন মাশ্চটক যত সহজে আমাদের পিটিয়ে পরোটা করতে চাইছে, ব্যাপারটা অত সোজা হবে না। আর যদি টেনিদা একা ওকে সামাল দিতে না পারে—আমরা তিনজন তো আছি, এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব খগেনের ওপর। যদি কিছু অঘটন ঘটেই যায়—ওই মোষের মতো খগেনটার ঘুষি-টুষি খেয়ে—আমি, রোগা-পটকা প্যালারাম যদি বেমক্কা মারাই যাই, তাতেই বা কী আসে যায়। একবার বই তো দুবার মরব না! ভয় পেয়ে—কেঁচোর অধম হয়ে মাটিতে মুখ লুকিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভালো।

আমি বুঝতে পারছিলুম—আমরা বাঘের গর্তে পা-ই দিই আর যা-ই করি, আমাদের চাইতেও ঢের বেশি ঘাবড়েছে বিন্দেবন-চন্দ্রকান্তের দলবল। খগেন লম্ফ-ঝম্প করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল—চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরই হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে দিলে।—আহা-হা, আগে থেকেই অমন মার মার করচ কেন হে খগেন? এঁয়ারা তো দেখচি ভদ্দর লোকের ছেলে সব—শত্রু হতে যাবেন কী করে? বিত্তেন্তটা একবার খোলসা করে বলো দিকি।

—বৃত্তান্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু!—খগেন গাঁ গাঁ করে উঠল।—কলকাতায় আমি একটা বিচ্ছু ছেলেকে পড়াতে গিয়েছিলুম একদিন—তার নাম কম্বল। অমন হতচ্ছাড়া উনপাঁজুরে ছেলে দুনিয়ায় আর দুটো হয় না। গিয়ে তাকে পাঁচটা শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে দিয়ে বললুম, এগুলো চট্‌পট্ করে ফ্যাল্—কাল সারা রাত পাড়ার জলসায় গান শুনে আমার গা ম্যাজ ম্যাজ করছে, আমি আধ ঘন্টা ঝিমিয়ে নিই। ঘুম ভেঙে যদি দেখি অঙ্ক হয়নি, তা হলে একটি কিলে তোকে একটা কোলা ব্যাং বানিয়ে দেব। বলেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে একটু দেরীই হয়ে গেল। জেগে দেখি, ঘরে কম্বল নেই, একটা অঙ্কও সে কষেনি। উঠে হাঁকডাক করতে তার কাকা এসে বললে, কম্বলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তোমাকে দেখেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আমরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলুম। বিন্দেবন বললে, তাম্পর?

—তারপর আমার পকেটে হাত দিয়েই বুঝতে পারলুম, হতভাগা ছেলে আমার পকেট হাট্‌কেছে। একটা কমলা লেবু রেখেছিলুম খাব বলে—সেটা নেই, তার বদলে কাগজে মোড়া দুটো আরশোলা। আর সাংকেতিক কবিতা লেখা আমাদের কাগজটা, তাতে কালির দাগ-টাগ লাগা—নিশ্চয় কিছু করেছে সেটা নিয়ে। এখন বুঝতে পারছি, ছড়াটা নকল করে সে এদের হাতে দিয়েছে, আর এরা তাই থেকে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছে এখানে।

আমরা চারজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

চন্দ্রকান্ত বললে, কিন্তু এঁয়ারা যে বললে রসিদ টসিদ—

www.boiRboi.blogspot.com

—একদম বাজে কথা, এরা রসিদ কোথায় পাবে? এ চারটেকে আমি পটলডাঙায় চাটুজ্জেদের রকে বসে পাকৌড়ী-ডালমুট খেতে দেখেছি। আর কম্বলটাও এদের পেছনে প্রায় ঘুর ঘুর করত।

চন্দরদা, আর দেরী নয়, তুমি পারমিশন দাও—আমি আগে এদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে নিই। তারপরে—হাতের সুখ হয়ে গেলে পোড়ো বাড়িটার ঠাণ্ডী গারদে সাত-দিন আটকে রাখা যাক, কাঁকড়া বিছে আর চামচিকের সঙ্গে ক'দিন কাটাক—ব্যাস, দুরস্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে এখানকার মালপত্তর সরিয়ে দাও—শেয়ালপুকুরের আস্তানায় খবর পাঠাও।

চন্দ্রকান্ত তার প্রকাণ্ড নাকটা চুলকে বললে, কিন্তুক্ খগেন—

—কিন্তু পরে হবে, আগে আমি এদের দেখছি—

যমদূতের মতো এগিয়ে এল খগেন। বিন্দেবন বললে, ওরে তোরা সব দেখছিস কী—দরজাগুলো বন্দ করে দে—

অর্থাৎ খাঁচায় বন্ধ করে ইঁদুর মারবার বন্দোবস্ত!

আর তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠল টেনিদা। ঘর কাঁপিয়ে সিংহনাদ ছাড়ল : বুঝে-সুঝে গায়ে হাত দেবেন মশাই, নইলে—

—ওরে, এ যে বুলি পড়ছে! খগেন মাশ্চটকের দাঁত কিচ্ কিচ্ করে উঠল : তাহলে এইটেকেই আগে মেরামত করি। বাকীগুলো তো ছারপোকা, এক একটা টিপুনি দিয়েই ম্যানেজ করে ফেলব।

বলেই, খগেন টেনিদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই লম্বা ঘরটার ভেতরে—যেখানে দেওয়াল ভর্তি করে 'জয় মা' আর 'খাঁড়া-টাঁড়া' এই সব লেখা রয়েছে, দেখতে দেখতে তার ভেতরে যেন ভীম আর জরাসন্ধের যুদ্ধ বেধে গেল। আমরা সরে এলুম দেওয়ালের একদিকে—বিন্দেবনের দল আর এক দিকে। খগেন টেনিদাকে জাপটে ধরতে গিয়েও পারল না—বক্সিংয়ের সাইড্ স্টেপিং করে সে চট করে সরে গেল একদিকে, আর দুহাতে খানিক বাতাস জাপটে ধরে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল খগেন।

টেনিদা ঠাট্টা করে বললে, আহা মাশ্চটক মশাই ফসকে গেল বুঝি? রাগে খগেনের মুখটা নিটোল একটা খাজা কাঁটালের মতো হয়ে গেল। লাল করমচার মতো চোখ-দুটোকে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন বললে, আঁ—আবার এয়ার্কি হচ্ছে। আমি খগেন মাশ্চটক, আমার সঙ্গে ফাজ্লিমি! আমি যদি এক্ষুনি তোকে চটকে আলুসেদ্ধ বানিয়ে না দিই তো—খগেন আবার ঝাঁপ মারল।

আর তক্ষুনি বোঝা গেল টেনিদা কী, আর আমরাই বা তাকে লীডার বলে মেনে নিয়েছি কেন। এবার খগেন টেনিদাকে চেপে ধরল আর ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইলেকট্রিক কারেন্টের শক্ খেলো একটা। জাপানী জুডোর একটি মোক্ষম প্যাঁচে দড়াম করে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল খগেন—চিৎপটাং। আর তার গলা দিয়ে বেরুল বিট্‌কেল এক আওয়াজ : গাং!

ঘরসুদ্ধ লোক একদম চুপ। চন্দ্রকান্ত, বিন্দেবন, দুটো চাকর—চোখ কপালে তুলে পাথর হয়ে রইল। টেনিদা বললে, কী মাশ্চটক মশাই, আমাকে মেরামত করবেন না?

খগেন মাশ্চটক একবার ওঠবার চেষ্টা করেই আবার ধপাৎ করে শুয়ে পড়ল। কেবল বললে, গাং—ওফ্-ফ।

হঠাৎ বিন্দেবন লাফিয়ে উঠল : চন্দর দা—দেখচ কী? এরা ক্ষুদে ডাকাতের দল।

খগেনের মতো অত বড়ো লাশকেও অমন করে শুইয়ে দিলে? আমি দলের আরো লোকজন ডাকি—সবাই মিলে ওদের—

টেনিদা আস্তিন গুটিয়ে বললে, কাম অন—

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম লীডারের পাশে। বললুম, কাম অন—কাম অন—

হাবুল আমার কানে কানে বললে,—অখন আরো মজা হইবো।

ঠিক তখন—

ঠিক তখন বন্ধ দরজার গায়ে ঝনঝন করে ঘা পড়ল। কে যেন মোটা গলায় ডাক দিয়ে বললে, পুলিশ—শিগ্গির দরজা খোলো—

এগারো

চাঁদ-চাঁদনি'র রহস্য তো বোঝা গেল। আসলে চোরা কারবারীর এক বিরাট দল—ওই ছড়াই হল ওদের সাংকেতিক বাক্য। ছড়া বলতে পারলে আর চক্রধর সামন্তের দোকানে একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই ওরা তাকে চিনে নেয় নিজের লোক বলে। তারপরে সব একসুতোয় গাঁথা। শেয়ালপুকুরের বাড়ি, গুরু বিটকেলানন্দ, দেবী নেংটেশ্বরী সব জলের মতো সোজা। ম্যাও ম্যাও যে কেন হানা দেয়, কেন ঝোল্লা গোঁফ আর আঁব নিয়ে চক্রধর কম্বলের তলায় শুয়ে পড়ে—সব পরিষ্কার। তারপর 'ছল ছল খালের জল, নিরাকার মোষের দল' থেকে একেবারে মহিষাদল—একদম আদত ঘাঁটিতে।

সব রহস্যের সমাধান। জিয়োমেট্রিতে যাকে বলে 'কিউ-ই-ডি'—অর্থাৎ কিনা—'ইহাই উপপাদ্য বিষয়'।

ক্যাবলা আগে থেকেই হুঁশিয়ার। তার যে মামা পুলিশে চাকরী করে, গোড়াগুড়িই তাঁকে সব খবর সে জুগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন, 'হুঁ, বদমায়েসদের একটা গ্যাং আছে। এবার ধরে ফেলব। তোরা চালিয়ে যা ওদের সঙ্গে। আমি পেছনে লোক রাখব। তাছাড়া মহিষাদলেও পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছি।'

এমন কি পাঁশকুড়ো লোক্যালে, ঠিক আমাদের পাশের কামরায় বসে বৈরাগী-বৈরাগী চেহারার যে ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে ট্রেনের বাইরে গলা বাড়িয়ে গেয়ে উঠছিলেন : 'হরিনাম বলো রে, নিতাইগৌর ভজো রে'—তিনি নাকি আমাদের ওয়াচ করছিলেন। 'চন্দ্র ভবন' পর্যন্ত দূর থেকে আমাদের ফলো করেছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের ঘরে যখন টেনিদা খগেন মাশ্চটককে কীচক বধ করে ফেলেছে, তখন তিনিই থানা থেকে পুলিশ নিয়ে চলে এসেছিলেন।

পুলিশের লোকেরা ওদের তো দলটল সুদ্ধ ধরে ফেলল, তারপর চন্দ্রকান্তের বাড়ি থেকে অনেক রকম কি সব লুকোনো জিনিস-টিনিসও পেলো; আর আমাদের কি বলল? সে সব শুনলে তোমাদের হিংসে হবে। আমরা তো লজ্জায় কান-টান লাল করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর পুলিশের দারোগা টেনিদার হাত-টাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তুমি তো দেখছি ছোকরা রীতিমত গ্রেট্ম্যান। অত বড়ো একটা তিন মণী জোয়ানকে তক্তাপাট করে দিলে—অ্যাঁ! তোমরাই হচ্ছ দেশের গৌরব—তোমাদের মতো ছেলেই এখন দরকার।'

শুনে, টেনিদার মৈনাকের মতো উঁচু নাকটা বিনয়ে কি রকম যেন ছোট একটা

www.boiRboi.blogspot.com

সিঙাড়ার মতো হয়ে গেল। আমার কানে কানে বললে, 'জানিস প্যালা—খগেন মাশ্চটককে জুডোর প্যাঁচ কষিয়ে কি রকম খিদে পেয়ে গেল। পেটের ভেতরে চুঁই চুঁই করছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'খিদে পেল? এখুনি খেয়ে—'

দারোগা শুনতে পেলেন। আমাকে আর কথাই বলতে দিলেন না। বললেন, 'খিদে পেয়েছে? বিলক্ষণ! এই রামভজন—জলদি রসগোল্লা-সন্দেশ-মোতিচুর-সিঙাড়া—বাজারসে যা মিলেগা— ঝুড়ি ভর্তি করকে লে আও।'

সবই তো হল। চোরাকারবারীরা তো ধরা পড়ল—অবকাশরঞ্জিনী আর বিক্রম-সিংহও ওদের সঙ্গে হাজতে গেল কিনা কে জানে! কিন্তু আসল গণ্ডগোল রয়েই গেল।

কম্বল এখনো নিরুদ্দেশ। তার টিকিরও তো খবর পাওয়া গেল না। সে কি সত্যি সত্যিই চাঁদে চলে গেল নাকি? ওর কাকা তো বলেছিলেন—কম্বলের চাঁদে চলে যাওয়ার একটা ন্যাক্ আছে!

আমরা চোরাকারবারী ধরতে চাইনি, কম্বলকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। তার মানে আমাদের অভিযান এ যাত্রা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমরা কী বলব ব্রজকিশোরবাবুকে? কী করে মুখ দেখাবো তাঁর কাছে?

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি, টেনিদা আর হাবুল এই নিয়ে গবেষণা করছিলুম। তা হলে কি আবার নতুন করে খোঁজা আরম্ভ করতে হবে? একটা ক্লু-টু তো চাই।

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে বললে, পেতেই হবে হতচ্ছাড়াকে! তারপরে যদি কম্বলকে পিটিয়ে কাপেট না বানিয়েছি, তা হলে আমার নাম টেনি শর্মাই নয়।

হাবুল বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। অমন পোলার নিরুদ্দেশ থাকনই ভালো। পোলা তো না—য্যান অ্যাক্খান ভাউয়া ব্যাং।

টেনিদা হাবুলের দিকে তাকালো: ভাউয়া ব্যাং কাকে বলে?

—ভাউয়া ব্যাং কয় ভাউয়া ব্যাংরে।

—শাটাপ্!—বিচ্ছিরি মুখ করে টেনিদা বললে, ইদিকে নানান ভাবনায় মরে যাচ্ছি, এর মধ্যে উনি আবার এলেন মশকরা করতে। ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি, তা হলে এক থাপ্পড়ে তোর গাল—আমি জুড়ে দিলুম : গালুডিতে উড়িয়ে দেব।

—বাঃ—এটা তো বেশ নতুন রকম বলেছিস। বিরক্ত হতে গিয়েও টেনিদা খুশি হয়ে উঠল : এর আগে তো কখনো শুনিনি।

—হুঁ হুঁ, আমি সব সময়েই ওরিজিন্যাল—মাথা নেড়ে বললুম।

—ওরিজিন্যাল তুই তো হবিই। তোর লম্বা লম্বা কান দুইখান দ্যাখলেই সেইডা বোঝন যায়—হাবুল ফোড়ন কাটল।

ওফ্! টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : আমি মরছি নিজের জ্বালায়, এগুলোর বাজে বকুনিতে তো পাগল করে দিলে। এখন ওই কম্বলটাকে—বলতে বলতে আমাদের পেছনে আর একটা রাম চিৎকার!

'কম্বল-সম্বল যথা দরবেশ কাঁপে চুপে চুপে—'

আমরা ভীষণভাবে চমকে তাকিয়ে দেখি, ক্যাবলা। কচরমচর করে পরমানন্দে কী চিবুচ্ছে।

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, খামোকা অমন করে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচালি যে ক্যাবলা? ক্যাবলা বললে, এম্নি।

—এমনি?—ভেংচি কেটে টেনিদা বললে, একেবারে পিলেসুদ্ধ চমকে গেল। খাচ্ছিস কী?

—কাজুবাদাম।

হাত বাড়িয়ে টেনিদা বললে, আমার ভাগ দে।

—নেই। খেয়ে ফেলেছি।

—খেয়ে ফেলেছিস?—টেনিদা গজ গজ করতে লাগল : এই জন্যই দেশের কিচ্ছু হয় না।

হাবুল সেন বলল, হইবোও না। আমারেও দ্যায় নাই।

টেনিদা হাবুলকে চড় মারতে গেল: এটা এমন বক্তিয়ার হয়েছে না—যে কোনো সিরিয়াস কথা এর জন্য বলার জো নেই। ওয়েল ক্যাবলা—এখন কম্বলের কী করা যায় বল তো?

ক্যাবলা বাদাম চিবুতে চিবুতে বললে, কিছুই করা যায় না। করার দরকার নেই।

—মানে?

—মানেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, এসো। চলো সবাই আমার সঙ্গে।

বেশিদূর যেতে হল না। আমাদের পাড়াতেই একটুকরো পোড়ো জমি, কারা যেন বাড়ি-টাড়ি করছে। তিন চারটে ছেলে সেখানে ইঁট পেতে একটা টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে। তাদের একজনের মাথায় একটা ভাঙা শোলা হ্যাট্, সে চিৎকার করে বল দিচ্ছিল—এই সোবার্স বল দিচ্ছেন, এই ব্যারিংটন আউট হয়ে গেলেন—

আমি, হাবুল আর টেনিদা চোখ গোল করে বললুম : ওই তো কম্বল! ক্যাবলা বললে, নির্ঘাত।

আমি বললুম, ও এখানে কী করে এল?

—তার মানে ও কোথাও যায়নি। এখেনেই ছিল।

—এখানেই ছিল?—টেনিদার মুখটা হালুয়ার মত হয়ে গেল : তা হলে নিরুদ্দেশ হল কী করে? ওর কাকা যে বললেন, কম্বল নিশ্চয় চাঁদে চলে গেছে?

ক্যাবলা বললে, চাঁদে ঠিক যায়নি, চাঁদের রাস্তায় খানিকটা গিয়েছিল।

—চাঁদের রাস্তায়?—হাবুল একটা হাঁ করল : রকেট পাইল কই?

—রকেটের দরকার হয়নি।—ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল : চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়েছিল দিন কতক।

—অ্যাঁ!—আমরা তিনজনে খাবি খেলুম।

—হুঁ, সব খবরই আমি জোগাড় করে এনেছি। ওই দশাসই মাস্টার খগেন মাশ্চটকের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কম্বলের কাকিমাই সে ব্যবস্থা করেছিলেন। কাকা তো বসে আছেন প্রেস নিয়ে, বাড়ির ভেতরে কতটুকু যান, কীই বা খবর রাখেন। আমরা যখন কম্বলের খোঁজে চাঁদনি-ধোপাপুকুর মহিষাদল ছুটে বেড়াচ্ছি, তখন শ্রীকম্বল কাকিমার আদরে দিব্যি চিলেকোঠার ঘরে খেয়ে-দেয়ে মোটা হচ্ছেন। সেই প্রথম দিনে আমাদের দিকে কে পচা আম ছুঁড়েছিল—এবার বুঝতে পারছ

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা?

—বিলক্ষণ!—টেনিদা হুঙ্কার করল: ওই হতভাগাই চিলেকোঠা থেকে আমার নাকটাকে পচা আমের টার্গেট করেছিল!

টেনিদার হুঙ্কারেই কিনা কে জানে—কম্বল আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। আর তাকিয়েই বিকট ভেংচি কাটল একটা। স্বভাব যাবে কোথায়! এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ভাউয়া ব্যাং কাকে বলে! ভাউয়া ব্যাং না হলে অমন ভেংচি কেউ কাটতেই পারে না।

জয়ধ্বজের জয়রথ

এক

শীতের মিষ্টি নরম রোদে জয়ধ্বজ মণ্ডল—যার ডাকনাম জয়—নতুন ঝকঝকে সাইকেলটায় চড়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

সাইকেলটা এত নতুন, এত সুন্দর, আর প্যাড্‌লে পা ছোঁয়াতেই এমন তরতর করে চলে যে, জয়ধ্বজের মনে হচ্ছিল সে যেন একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া কিংবা ময়ূর-পঙ্খী নৌকোয় চড়ে এগিয়ে চলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে জয়ধ্বজ চলল স্টেশনের রাস্তায়। কোনো কাজ আছে, তা নয়। আজ রবিবার—দোকান বন্ধ। জয়ধ্বজের ছুটির দিন। এই দিনটাতে—স্টেশনের পাশে নেপালদার চায়ের দোকানে আড্ডাটা ভারী ভালো জমে। বিশেষ করে আচার্য-বাড়ীর সুকুমার—যাকে ট্যাঁপা বলে সকলে জানে, জয়ধ্বজের যে প্রাণের বন্ধু তাকেও পাওয়া যাবে সেখানে। ক্রিসমাসে কলেজ বন্ধ, ট্যাঁপা কলকাতার হস্টেল থেকে দেশে এসেছে।

সাইকেলে করে যেতে যেতে ভারী ভালো লাগছিল জয়ধ্বজের। সাইকেলটা তাকে দিয়েছেন তার মামা ভীমরাজ পুরকায়েত। নাম ভীমরাজ হলেও মামা মোটেই ভীমের মতো দশাসই ন'ন—লম্বা রোগা চেহারা, গলায় তুলসীর মালা, ভীষণ বৈষ্ণব—মাছ-মাংস-পেঁয়াজ স্পর্শ করেন না। মামীও খুব ভালো মানুষ—বাড়ীতে বসে রঙ-বেরঙের দড়ি দিয়ে নানা রকম শিকে তৈরী করেন, থালার মতো সব বড়ো বড়ো ফুল-টুল কাটা বড়ি বানান, ক্ষীর আর নারকেল দিয়ে অনেক রকম মিষ্টি করতে পারেন। পলাশপুরের বাজারের সব চাইতে বড়ো কাপড়ের দোকানটার মালিক হলেন মামা। তাঁর ছেলেপুলে নেই, জয়ধ্বজ তাঁর একমাত্র ভাগনে। সবাই জানে, মামা তাঁর জমি-জমা, দোকানপাট সব জয়ধ্বজকেই দিয়ে যাবেন।

জয়ধ্বজের বাবা রেলে চাকরি করতেন। তার পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি একটা দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই থেকে মামা বিধবা ছোট বোন আর ভাগনেকে দেখা-শোনা করছেন।

লেখাপড়ায় জয়ধ্বজ যে খুব ভালো, তা নয়। একবার ফেল করে যখন থার্ড ডিভিশনে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করল, তখন মামা বললেন, 'খুব হয়েছে, আর পড়ে কাজ নেই।'

শুনে জয়ধ্বজের চোখে জল এসে গেল।

'বা রে, আচার্যিদের ট্যাঁপা যে কলেজে পড়তে যাচ্ছে!'

ভুরু কুঁচকে মামা বললেন, 'ট্যাঁপা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে—দুটো লেটার পেয়েছে। ও কলেজে পড়বে না তো কে পড়বে? আর তুই? স্কুল-ফাইন্যালে একবার ডিগবাজি খেলি, একশো-দেড়শো টাকার চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবি তো? কী লাভ তাতে—শুনি? ব্যবসাই লক্ষ্মী, জানিস তো? আমার দোকানে ভিড়ে পড়—ব্যবসা শেখ—মানুষকে না ঠকিয়ে সৎপথে থাক—দেখবি ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যাবে।'

জয়ধ্বজ গোঁ হয়ে বাড়ী চলে এল।

অবশ্য, জয়ধ্বজের নিজের যা জমিজমা আছে, তাতে এক রকম করে তার কলেজে পড়বার খরচটা যে চলে না যেত, তা নয়। ছেলের কষ্ট দেখে মা'রও দুঃখ হলো। আর নিজের ছেলে বি-এ, এম-এ পাশ করে পণ্ডিত হবে—কোন্ মা-ই বা তা চান না? কিন্তু দাদার বুদ্ধির ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, তিনি জানেন, দাদা যা করেন তা ভালোর জন্যেই।

মা বললেন, 'মন খারাপ করিসনি বাবা—দাদা যা বলছেন তাতে তোর ভালোই হবে। আমার বাবা তো সাত-আট বিঘে জমি আর বাস্তুভিটেটুকু ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। দাদা নিজের চেষ্টায় অত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছে, অত সম্পত্তি করেছে! দাদার কথা শুনে চল, তাতে তোর উন্নতিই হবে।'

কী আর করা—ভীষণ মন খারাপ করে জয়ধ্বজ মামার দোকানে চাকরি করতে গেল।

প্রথম প্রথম বেজায় বিরক্তি লাগত। কোথায় ট্যাঁপা কলকাতায় মজা করে কলেজে পড়ছে—কত নতুন জিনিস শিখছে, ফাঁকে ফাঁকে কখনো যাচ্ছে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে, কখনো চিড়িয়াখানায়; আর সে এই দোকানে বসে সমানে শুনছে: 'নামা ধনেখালি, আন শান্তিপুরী—দেখা বেগমপুর।'

তারপর আস্তে আস্তে সয়ে গেল। তারও পরে ভালো লাগতে শুরু করল। মামা ভীমরাজ পুরকায়েত আগাগোড়া নজর রাখেন তার দিকে। ভুলচুক হলে ছোট-খাটো ধমকও দেন—'এ ব্যবসার কাজ বাপু, সব সময় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।'

অবশ্য মামার উদ্দেশ্য আলাদা। এত বড়ো ব্যবসাটা যার হাতে তুলে দিয়ে যাবেন, তাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে যাওয়া দরকার—সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত তার ওপরে। ত্রিশ বছরের পরিশ্রমে যে দোকান তিনি গড়ে তুলেছেন, আনাড়ীর হাতে তা নষ্ট হয়ে যাবে, ভীমরাজ তা কোনমতেই সইতে পারবেন না।

আজ দু' বছর ধরে ভাগনের কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছে, না—ছেলেটার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, ওর ওপর ভরসা করা যায়। খদ্দেরের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে, কথা কইতে জানে, আগের চাইতে বরং দোকানের কাটতি বেড়েছে। তাই খুশি হয়ে এবার ভীমরাজ জয়ধ্বজকে একখানা ভালো সাইকেল কিনে দিয়েছেন।

সাইকেল তো নয়—যেন রাজস্ব! যেদিন সকালে ব্রাউনপেপারে মোড়া নতুন সাই-কেলটা তাকে দেখিয়ে মামা বললেন, 'ওটা তোর—তোকে দিলুম—' সেদিন জয়ধ্বজ প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। একটা সাইকেলের সখ যে তার কতদিনের—সে কথা তার চাইতে বেশী আর কে জানে! এ যে না চাইতে হাতে স্বর্গ পেয়ে যাওয়া!

সাইকেলে চড়ে যেদিন প্রথম পথে বেরোল—মনে হলো সে যেন মূর্তিমান সম্রাট।

নতুন সাইকেল—ঝকঝক তকতক করছে। তার রঙের গন্ধ, তার নতুন সীটের গন্ধ, তার চকচকে চেন, তরতর করে তার ছুটে চলা—আঃ! গ্রামে তো আরো অনেক সাইকেলই আছে, কিন্তু রং-চটা, ঝরঝরে, বুড়োটে। তার সাইকেল তাদের মাঝখানে রাজার রাজা!

'বাঃ বেড়ে সাইকেলটি তো!' লোকে মুগ্ধ হয়ে বলে।

'হুঁ-হুঁ, মামা দিয়েছে।'

'তা দেবেই তো। ভীমরাজের তো আর পয়সার অভাব নেই!'

এই সাইকেল নিয়ে জয়ধ্বজ পাগল। দু'বেলা ধুয়ে-মুছে তকতকে করে রাখে। সবার সাইকেল থাকে বাড়ীর বারান্দায় কিংবা উঠানে, কিন্তু জয়ধ্বজ রাত্রে তুলে রাখে

www.boiRboi.blogspot.com

শোওয়ার ঘরে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, চেয়ে চেয়ে সাইকেলটাকে দেখে। আলো-নেভানো ঘরে সাইকেলটা চিকচিক করে—মনে হয়, জয়ধ্বজের দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসছে সে।

নতুন সাইকেল—পীচের রাস্তায়—প্রাণের খুশিতে এগিয়ে যাচ্ছিল জয়ধ্বজ। সাইকেল তো চলছে না—যেন উড়ছে। মাঠে তখনো শীতের শিশিরের গন্ধ—ছোলা আর কলাই শাকে ধান-কাটা মাঠে সবুজের ছোপ, খেজুরগাছে ঝরার রসের কলসীতে ভিড় জমিয়েছে মৌমাছি আর ভীমরুলের ঝাঁক। জয়ধ্বজের মনে হলো, জগতে এই মুহূর্তে তার মতো সুখী বোধহয় আর কেউ নেই!

সুখের মাত্রাটা আরো বাড়ল—যখন নেপালদার চায়ের দোকানের সামনেই চোখে পড়ল ট্যাঁপাকে।

ট্যাঁপা বললে, 'তোর নতুন সাইকেল বুঝি? চমৎকার হয়েছে তো!'

কিন্তু সাইকেল তো আছেই। ট্যাঁপাকেই পাওয়া যাবে না—ক'দিন পরেই তার কলেজ খুলবে, সে চলে যাবে কলকাতায়। কত গল্প জমে আছে তার কাছে—কত খবর শোনবার আছে কলকাতার। সাইকেলটা দোকানের সামনে রেখে ট্যাঁপার গলা দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জয়ধ্বজ দোকানে ঢুকল। চেঁচিয়ে বললে, 'নেপালদা—দু' গেলাস ভালো চা আর সব চেয়ে ভালো বিস্কুট।'

ঘন্টা দুই জমাট আড্ডা চলল। তারপর ট্যাঁপা বললে, 'চল, তোর নতুন সাইকেল দেখি।'

'তুই দেখে কী করবি?'—জয়ধ্বজ হাসল: 'তুই তো পড়ুয়া ভালো ছেলে, সাইকেলে চাপতে পর্যন্ত জানিসনে।'

'তোর ক্যারিয়ারে উঠব।'

'খুব ভালো কথা।' জয়ধ্বজ খুশি হয়ে বললে, 'আজ দিনটা ভারী সুন্দর, চল—তোকে ক্যারিয়ারে বসিয়ে ঈশানীতলার কালীমন্দির পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।'

ট্যাঁপা আনন্দে হাততালি দিয়ে বললে, 'গ্র্যান্ড আইডিয়া!'

কিন্তু বাইরে বেরিয়েই—

জয়ধ্বজ চমকে উঠল: 'ট্যাঁপা, সাইকেলটা তো দেখছি না!'

'সে কি রে!'

'এখানে—এই জায়গাতেই তো ছিল। তালা দিয়ে গিয়েছিলুম।'—জয়ধ্বজের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল: 'মাটিতে এই তো চাকার দাগ। কিন্তু সাইকেলটা কোথায় গেল? কেউ চুরি করে নিলে না তো?'

'চুরি!'—ট্যাঁপা খাবি খায়: 'সে কি রে!'

'তা হলে যাবে কোথায়? নেপালদা—নেপালদা—'

একটা ভাঙা পেয়ালায় ডিম ফেটাচ্ছিল নেপালদা, সেইটে হাতে করে লাফিয়ে বেরিয়ে এল সে। এল দোকানের আরো তিনজন খদ্দের। না—সাইকেলের খবর তারা কেউ জানে না। শীতের এই সকালে—চারদিকের এই আলোর ভেতর—নতুন সাইকেলটা—জয়ধ্বজের ময়ূরপঙ্খী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

জয়ধ্বজ একেবারে ধপ্ করে বসে পড়ল ধুলোর উপর।

দুই

সত্যিই সাইকেলটা উধাও! দিনে-দুপুরে হাওয়া!

না—কেউ কিছু জানে না। অথচ নেপালদা যেখানে দাঁড়িয়ে চা বানায়, ওমলেট তৈরি করে কিংবা টোস্ট্ ভাজে, সেখান থেকে তিন-চার হাত দূরেই সাইকেলটা ছিল—সাইকেলটা ছিল—বলতে গেলে নেপালদার একেবারে চোখের সামনে। যে বাচ্চা ছেলেটা নেপালদার অ্যাসিস্ট্যান্ট্, সে তো সারাক্ষণই বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। তা হলে কে এর মধ্যে সাইকেলটাকে নিয়ে সরে পড়ল?

এ যে পি সি সরকারের ম্যাজিককে হার মানিয়েছে!

অবিশ্যি বাচ্চাটা একবার একটু দূরের টিউবওয়েলটায় জল আনতে গিয়েছিল; নেপালদাও হয়তো ভেতরে তখন চা-টা কিছু দিচ্ছিল তার খদ্দেরদের। সেই ফাঁকেই নিয়ে সটকেছে খুব সম্ভব। খুব ওস্তাদ চোর বলতে হবে! একেবারে তক্কে তক্কে ছিল!

ভারত্তাত্তিক বঙ্কিম পান্ডা বললেন, 'যা—নন্দীগ্রাম থানায় খবর দিয়ে আয়।'

নেপালদা বললে, 'ছাই হবে। পুলিশের দারোগা থাকে তার হাজারো রকমের কাজকর্ম নিয়ে। সাইকেল-চোর খুঁজতে তার বয়ে গেছে।'

বঙ্কিম পান্ডা মাথা নেড়ে বললেন, 'তা বটে, তা বটে। তবু চুরির ব্যাপার যখন, পুলিশে খবর একটা দিতেই হয়।'

ট্যাঁপা বললে, 'তাই ভালো জয়, চল—আমরা থানাতেই যাই। অমন করে বসে পড়লে তো চলবে না—এমন চমৎকার ঝকঝকে সাইকেলটা, যেমন করে হোক উদ্ধার করাতেই হবে।'

সুরেশ হালদার গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে এতক্ষণ খুকখুক করে কাশছিলেন। এবার একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'দিনে দিনে দেশের হলো কী? চারদিক চোর-ছেঁচড়ে একেবারে ছেয়ে গেল নাকি?'

ট্যাঁপা আবার বললে, 'ওঠ জয়—এখন বসে থাকলে হবে না। দেরী করলে চোর যে কোথায় পালিয়ে যাবে ঠিক নেই। চল—চল—'

নেপালদা, বঙ্কিম পান্ডা আর সুরেশ হালদার সবাই একসঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেরী করা ঠিক নয়।' সুরেশ হালদার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তক্ষুনি তাঁর ভীষণ কাশি এসে গেল, আর বলতে পারলেন না।

জয়ধ্বজ উঠল, ট্যাঁপার সঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়। আর পেছনে নেপালদার দোকানে এই সাইকেল চুরির ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত আলোচনা চলল, সুরেশ হালদার আরো বেশী করে কাশতে লাগলেন।

খানিকটা চুপচাপ করে—ট্যাঁপার সঙ্গে সঙ্গে গোঁজ হয়ে হাঁটতে লাগল জয়ধ্বজ। তারপর বললে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি রে ট্যাঁপা?'

'কেন—থানায়!'

'না—থানায় যাব না।'

'সে কি!'—ট্যাঁপা আশ্চর্য হয়ে গেল: 'কী করবি তা হলে?'

'থানায় গিয়ে কী হবে?'—জয়ধ্বজ বললে, 'ভূপেনকাকার বাড়ীতে গত বছর চুরি হয়ে গেল, তারপর কী হলো মনে নেই? পরদিন দারোগা এসে অনেক মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে বললেন, চোর ব্যাটাকে যদি একবার ধরে দিতে পারেন, তা হলে ওটাকে পিটিয়ে একেবারে তক্তা করে দেবো। শুনে ভূপেনকাকা মনের দুঃখে বললে, চোরকে যদি ধরতেই পারব, তবে আপনাকে আর ডাকব কেন? আর ধরতে পারলে পিটিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

তন্তা করবার জন্যে আপনাকে ডাকতে হবে না—ওটাও আমরাই পারব এখন। দারোগা রেগে বললেন, আপনার তো খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। যান—যান, আপনার চোর আপনিই ধরুন গে। বলে সেই যে গেলেন, একেবারেই গেলেন। না—থানা-টানায় সুবিধে হবে না।'

ট্যাঁপা বললে, 'কিন্তু—'

জয়ধ্বজ বললে, 'দাঁড়া, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে নিই। ওসব দারোগা-ফারোগার দরকার নেই। তুই আমাকে একটু হেল্‌প্‌ করতে পারবি?'

'কেন পারব না? কিন্তু তুই কী করতে চাস, সেইটেই আমি ঠাহর পাচ্ছি না।'

জয়ধ্বজ বললে, 'যা করব, তোতে আমাতে।'

'তোতে আমাতে!'—ট্যাঁপা আরো আশ্চর্য হলো: 'আমরা কী করতে পারব?'

'সব করতে পারব। উদ্ধার করব সাইকেলটা।'

ট্যাঁপা বললে, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছে, জয়! আমরা কি হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, না প্রেমেন মিত্তিরের পরাশর বর্মা? তুই বাংলা ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে—'

'মোটেই ডিটেক্‌টিভ বই না।'—জয়ধ্বজ বিরক্ত হলো: 'তুই এরকম ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, আর আমিও তো নেহাত হাঁদা গঙ্গারাম নই। দুজনে মিলে একটা কিনারা করতে পারব না? আয়, এই বাদাম গাছটার তলায় একটু বসা যাক। একটু ভেবে-চিন্তে দেখা যাক সব—বুদ্ধি করা যাক একটা।'

ট্যাঁপাকে প্রায় জোর করে টেনেই জয়ধ্বজ বাদাম গাছের তলায় এনে বসাল।

ট্যাঁপা বললে, 'কী পাগলামি করছিস তুই? মিথ্যে দেরী করে কী লাভ? বাদাম গাছের তলায় বসে আমরা প্ল্যান করব, আর সেই ফাঁকে চোর সাইকেলটা নিয়ে দশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে যাবে।'

জয়ধ্বজ বললে, 'না—যাবে না। আমার এই সাইকেল এদিক্‌কার সক্কলের চেনা। দিনে-দুপুরে ওটাকে নিয়ে কেউ বেশী দূর চালাতে সাহস পাবে না। যদি সরাতে হয়—সরাবে রাতের বেলায়,' দিনে কোথাও লুকিয়ে রাখবে।'

'কিন্তু চোর যদি গাঁয়ের লোক না হয়? যদি পথ-চলতি কেউ ওটা নিয়ে সটকে থাকে?'

পথ-চলতি কে এখন আসবে এদিকে? দু'ঘণ্টার মধ্যে ইস্টিশনে কোনো ট্রেন আসেনি, বাইরের কেউ খামোকা এদিকে আসে না। নিয়েছে গ্রামেরই কেউ। কোনো চেনা লোক।'

'চেনা লোক!'

'সাইকেলটার ওপর অনেকেরই নজর পড়েছিল রে!'

'আচ্ছা জয়—' ট্যাঁপার একটা কথা মনে হলো: 'এমন তো হতে পারে, মজা দেখবার জন্যে কেউ ওটা নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে একটুখানি?'

'হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু মজা দেখবার জন্যেও যদি কেউ নিয়ে থাকে, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, জয়ধ্বজ মণ্ডলের সঙ্গে চালাকি চলে না। সোজা কথা, আমরা ওটা খুঁজে বের করবই।'

'যদি খুঁজে না পাই?'

'পেতেই হবে।'—জয়ধ্বজ গম্ভীর হয়ে বললে, 'মামা সাইকেলটা দেবার সময় আমাকে বলেছিল যত্ন করে রাখিস—কেউ চুরি-টুরি করে নিয়ে না যায়। আমি বলেছিলুম, কোনো চোরের ঘাড়ে তিনটে মাথা নেই যে, জয়ধ্বজ মণ্ডলের সাইকেল চুরি করে নেবে। মামা বলেছিল, বেশ, দেখব, কেমন হুঁশিয়ার ছেলে তুই! সাইকেলটা

উদ্ধার না করে মামার কাছে গিয়ে এখন দাঁড়াতে পারব আমি? প্রেস্‌টিজ্‌ থাকবে আমার?'

'তা বটে—তা বটে—' ট্যাঁপা ভাবনায় পড়ল।

'তা ছাড়া সুরেশ হালদারকে তো জানিস। এক নম্বরের গেজেট। এখুনি খুক-খুক করে কাশতে কাশতে মামার কাছে গিয়ে খবর দেবে—নেপালের চায়ের দোকান থেকে তোমার ভাগনের সাইকেল লোপাট। তখন আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে—বল? নাঃ—এ অপমান সহ্য করা যায় না। সাইকেল উদ্ধার করে তারপর মামার কাছে গিয়ে বলব: 'দেখলে তো—জয়ধ্বজ মণ্ডলের জিনিস কেউ হজম করতে পারে না।'

ট্যাঁপা অধৈর্য হয়ে বললে, 'তা নয় হলো। কিন্তু এখানে বসে বসে ভাবলে তো আর ওটা ফিরে পাওয়া যাবে না।'

'দাঁড়া না—একটু বুদ্ধি খাটাই। আমি তোকে বলছি ট্যাঁপা—সন্ধ্যের আগে গাঁ থেকে সাইকেল বেরুবে না। এখন বেলা সাড়ে ন'টা। তার মানে, প্রায় ঘণ্টা দশেক সময় রয়েছে আমাদের হাতে। আগে ভেবে দেখা যাক—কাকে কাকে সন্দেহ করা যেতে পারে।'

'আচ্ছা—ভাব।'

'প্রথমেই মোনা পাল।'

শুনেই ট্যাঁপা চমকে উঠল: 'ঠিক বলেছিস। মোনা পাল দাগী চোর, চার বার জেল খেটেছে। এ কাজ ও ছাড়া আর কারুরই নয়।'

'দাঁড়া—দাঁড়া। দাগী চোর হলেও মোনা পাল গাঁয়ের কারু কিছু কখনো চুরি করেনি। ওকে লিস্টে প্রথমে রাখব না। তারপর নেউলে—'

'নেউলে?'

'আরে নিয়োগীদের নেউলে। ওর হাতটান আছে, বুঝলি? একবার ওর বাবার হাতঘড়ি চুরি করে মহিষাদলে কাকে বেচে এসেছিল না? তারপর ধরা পড়ে বাপের হাতে রাম-ঠ্যাঙানি খেয়েছিল। আমার সাইকেলটার দিকে ক'বার ও আড়ে আড়ে তাকিয়েছে—আমি লক্ষ্য করেছি।'

'তা হলে নিশ্চয় এ নেউলে নিয়োগীরই কাণ্ড।'

জয়ধ্বজ বিরক্ত হয়ে বললে, 'নাঃ, তুই জ্বালালি ট্যাঁপা! আরে সবটা আগে ভালো করে ঠাউরে নিতে দে না। তিন নম্বর পঞ্চু সামন্ত। লোকটা সুবিধের নয়—জানিস তো। তার ওপর একটা সাইকেলের দোকান আছে তমলুকে। সেখানে ওটা অনায়াসেই বেচে দিতে পারে।'

ট্যাঁপা প্রায় বলতে যাচ্ছিল, 'তবে ওটা পঞ্চু সামন্তই নিয়েছে'—কিন্তু জয়ধ্বজের চোখের দিকে তাকিয়ে সামলে গেল।

জয়ধ্বজ বললে, 'আপাততঃ এই তিনজনকে দিয়েই শুরু করি। তারপরে অন্যদের কথা ভাবা যাবে। প্রথমে কার কাছে যাওয়া যায় বল দিকি?'

'মোনা পাল।'

'না—মোনা নয়। আগে নেউলে নিয়োগী।' বলেই উঠে দাঁড়াল জয়ধ্বজ: 'চল ট্যাঁপা—নাউ টু অ্যাক্‌শন।'

নেউলে নিয়োগীর দেখা পেতে দেরী হলো না। তার বাড়ীর দিকে এগোতেই চোখে পড়ল, এক হাতে একটা ঠোঙা নিয়ে নিবিষ্ট মনে ডালমুট খেতে খেতে কোথায় চলেছে সে।

দূর থেকে ট্যাঁপা ডাকল: 'এই নেউলে, একটু দাঁড়া। তোর সঙ্গে একটা কথা

www.boiRboi.blogspot.com

আছে।'

শুনেই নেউলে দারুণ চমকে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল ডালমুটের ঠোঙাটা। তারপর আর কোনো দিকে না তাকিয়ে—মাঠের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে—টেনে দৌড়।

তিন

'এই নেউলে, দৌড়োচ্ছিস কেন? দাঁড়া না—' আবার চেঁচিয়ে উঠল ট্যাঁপা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? নেউলে ছুটছে তো ছুটছেই—মনে হলো, একেবারে হলদিয়ার বন্দরে পৌঁছোবার আগে সে আর থামবে না। একটা পাটকিলে রঙের এঁড়ে গোরু খুব যত্ন করে ঘাস-টাস খাচ্ছিল, নেউলে উলটে পড়ল তার ঘাড়ে। গোরুটা লেজ তুলে দৌড় লাগাল—ম্যা ম্যা করে তিন-চারটে ছাগলও ছিটকে পড়ল চারদিকে।

আর নেউলে যে-ভাবে ছুটল, তাতে বোধহয় অলিম্পিক রেকর্ড হয়ে যেত একটা।

'এই নেউলে—এই নেউলে—পালাচ্ছিস কেন?'—পেছনে ছুটতে ছুটতে জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপা সমানে ডাকতে লাগল। নেউলে একবার ফিরে তাকায়, আবার দৌড়তে থাকে। যেন অলিম্পিক রেকর্ডটা না করে কোনোমতেই সে থামবে না।

তা রেকর্ডটা হয়েও যেত, খুব সম্ভব হলদিয়ায় পৌঁছেও যেত সে। কিন্তু ক্ষেতের আলের ওপর একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেয়ে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থমকে গেল। একটা ঝোপের ওপরে উলটে পড়ে কোলা ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সে, আর সেই ফাঁকে ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ গিয়ে তাকে ক্যাঁক্ করে চেপে ধরল, নেউলে আর একবার উঠে পড়বার চেষ্টা করার আগেই।

নেউলে হাঁসফাঁস করে জয়ধ্বজকে আঁচড়ে দিলে, ট্যাঁপাকে কামড়াবার চেষ্টা করল। রেগে আগুন হয়ে গেল জয়ধ্বজ।

'ভালো করে ওর হাত দুটো চেপে ধর তো ট্যাঁপা! হতভাগা আঁচড়ে-কামড়ে দেবার চেষ্টা করছে! এক চড়ে আমি ওর একপাটি দাঁত খসিয়ে দিচ্ছি!'

ট্যাঁপা পটলডাঙার টেনিদাকে 'কোট' করে বললে, 'কিংবা এক চাঁটিতে ওর কান কানপুরে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।'

বেগতিক দেখে নেউলে হাঁউমাউ করতে লাগল : 'তোমরা আমায় মারছ কেন? ছেড়ে দাও বলছি।'

'তুই আমাকে আঁচড়ে দিলি কেন? ট্যাঁপাকে কামড়াচ্ছিলি কি জন্যে?'

'তোমরা কেন আমাকে মারতে এলে?'

'আমরা তো তোকে মারতে আসিনি। কেবল একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম।'

'হুঁ, জিজ্ঞেস করতে!'—নেউলে গজগজ করতে লাগল : 'আমি যেন কিছু জানি না! ভীম জ্যাঠার বাগান থেকে নারকোলী কুল পেড়ে খেয়েছি বলে তোমরা আমাকে ঠ্যাঙাতে এসেছ।'

নারকোলী কুল!

ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ আশ্চর্য হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, আলগা হয়ে গেল হাতের মুঠো, আর ফাঁক বুঝে নেউলে উঠে পড়ল এক লাফে, চম্পট দেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু জয়ধ্বজের ফুটবল খেলার অভ্যাস আছে, বেকায়দায় পড়লে কেমন করে

www.boiRboi.blogspot.com

ফাউল করতে হয়, সেটাও তার বিলক্ষণ জানা। বসা-অবস্থাতেই সে চট করে একখানা পা ছুঁড়ে দিলে এবং তৎক্ষণাৎ আর একবার চিত হলো নেউলে।

'ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে—!' নেউলে চেঁচাতে লাগল।

গোঁ গোঁ করে জয়ধ্বজ বললে, 'ফের পালাবার চেষ্টা করবি তো ঠ্যাং ভেঙে দেবো এবার।'

হয়রান হয়ে নেউল বললে, 'সত্যি বলছি, আমি পাঁচিল টপকে ঢুকেছিলুম বটে, কিন্তু আট-দশটার বেশী কুল আমি খাইনি। দোতলার বারান্দা থেকে ভীম জ্যাঠা 'কে রে বাগানে?' বলতেই আমি দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। কুলগাছের ডাল কে ভেঙেছে তার কিছু জানি না—' কাঁদো-কাঁদো হয়ে নেউলে সমানে বলে যেতে লাগল : 'সত্যি বলছি, কিছু জানি না।'

জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপা আবার চুপ।

নেউলে বলতে লাগল : 'সত্যি ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। হতে পারে, দু'চারটে কুল আমি বেশী খেয়েছি, লাফিয়ে নামবার সময় কুলগাছের এক-আধটা ডাল ভেঙেও যেতে পারে—কিন্তু তোমার দিব্যি, আর কোনদিন আমি তোমার মামার বাগানে ঢুকব না।'

জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপা আবার এ-ওর দিকে তাকাল। কী বলা যায় ভেবে পেল না।

তারপর একটু সামলে নিয়ে ট্যাঁপা বললে, 'আর সাইকেল?'

'কিসের সাইকেল?'—নেউলে হাঁ করে তাকাল।

ট্যাঁপা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে জয়ধ্বজ থামিয়ে দিল তাকে। ট্যাঁপাকে একবার চোখ টিপে বললে, 'তুই নাকি কার সাইকেলে ঢিল মেরে দুটো স্পোক ভেঙে দিয়েছিস?'

'আমি'—নেউলে এবার চটে গেল—'বেশ মজা তো! না হয় তোমার মামার বাগানে ঢুকে দুটো কুলই খেয়েছি, তাই বলে রাস্তার লোকের সাইকেলে আমি ঢিল ছুঁড়ব? আমি পাগল নাকি?'

'না, তুই একটা বুদ্ধু, তোর মগজে কেবল ঘুঁটে—' এই বলে জয়ধ্বজ টকাস্ করে একটা টোকা মারল নেউলের মাথায় : 'যা ভাগ্। কিন্তু খবরদার, আর কখনো মামার বাগানে ঢুকেছিস তো—'

শেষ কথা আর কে শুনছে? ছাড়ান পেয়ে নেউলে তখন বাড়ীর দিকে ভোঁ-দৌড়!

আশ্চর্য হয়ে ট্যাঁপা বললে, 'ছেড়ে দিলি ওকে?'

ব্যাজার মুখে জয়ধ্বজ বললে, 'ছেড়ে দেবো না কী করব? ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছিস না? মামার বাগানে ঢুকে কুল চুরি করেছে, ডাল ভেঙে পালিয়েছে। ভেবেছে, মামা আমাদের লেলিয়ে দিয়েছে ওকে পিট্টি দেবার জন্য। তাই অমনভাবে পালাচ্ছিল। সাইকেলের ও কিচ্ছু জানে না।'

'কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, ও আমাদের ধোঁকা দিয়ে গেল?'

জয়ধ্বজ একটু হাসল।

'অতই যদি ওস্তাদ হবে তা হলে ও গোয়েন্দা-গল্পের কোনো দস্যু-সর্দার-টর্দার হতে পারত, বাবার ঘড়ি চুরি করে ঠ্যাঙানি খায়? না—নেউলে নয়, ও সাইকেল চুরির কিচ্ছু জানে না। ওকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হলো।'

'তা হলে?'

মাথার ওপর মিষ্টি নীল আকাশ। টুকরো টুকরো শাদা মেঘে রোদের সোনা জ্বলছে। মাথার ওপর দিয়ে এক জোড়া চখা-চখী উড়ে গেল কোনো নদীর চরের দিকে। একটু চুপ করে থেকে জয়ধ্বজ বললে, 'চল, ওঠা যাক।'

'কোথায় যাবি? মোনা পালের ওখানে? না, পঞ্চু সামন্তের কাছে?'
'ভেবে দেখি।'

দুজনে মাঠ পেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল। নেউলে দৌড় করিয়ে তাদের অনেকদূর নিয়ে এসেছে, অনেকটা হেঁটে তাদের গ্রামের দিকে ফিরতে হবে।

ভাবতে ভাবতে চলেছিল, হঠাৎ ট্যাঁপারই চোখে পড়ল। দারুণ উত্তেজিত হয়ে খপ করে জয়ধ্বজের জামা টেনে ধরল।

'জয়, দেখেছিস?'

'কী দেখব?'

'লক্ষ্য কর কাঁচা রাস্তার ওপর। সাইকেলের টায়ারের দাগ।'

দুজনেই ঝুঁকে পড়ল তক্ষুনি।

কাঁচা রাস্তায় সাইকেলের চাকার দাগ থাকা খুব স্বাভাবিক, কত লোকেরই তো সাইকেল আছে আশেপাশে। কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল এই দাগগুলোর। প্রথম কথা—সাইকেলটা খুব অল্প আগেই এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে—কারণ তার ওপরে এখনো পথচলতি মানুষের পায়ের ছাপ কিংবা গোরুর গাড়ির চাকার দাগ পড়েনি। আর দ্বিতীয় কথা—

দ্বিতীয় কথা, চাকার দাগগুলো ভারী স্পষ্ট। আনকোরা নতুন টায়ারের দাগ যেমন পড়ে।

শিউরে উঠে ট্যাঁপা বললে, 'তোর সাইকেলের দাগ।'

জয়ধ্বজ ভুরু কুঁচকে বললে, 'হতে পারে, না-ও হতে পারে।'

'না-ও হতে পারে মানে? একেবারে নতুন সাইকেল?'

'আর কেউ যে একটা নতুন সাইকেল কিনতে পারে না, এমন তো কথা নেই।'

'কিন্তু এদিকের কেউ নতুন সাইকেল কিনলে নিশ্চয়ই জানা যেত। বাজারে সে আসতই।'

'হয়তো আজ-কাল কেউ কিনে এনেছে, আমরা দেখিনি।'

ট্যাঁপা বিরক্ত হয়ে বললে, 'তর্ক করিসনি। আমার মন বলছে, এ তোরই সাইকেল। চল, ফলো করি।'

জয়ধ্বজ বললে, 'চল।'

কিন্তু কত দূরে চলে গেছে সাইকেল, এ পথ কোন্ গ্রাম থেকে কোথায় এগিয়ে গেছে, কে জানে তার খবর! তবু দুজনে সেই দাগ ধরেই এগিয়ে চলল। একটু দূরে আম-জামের ছায়ায় ছোট্ট একটা গ্রাম দেখা যায়—দাসপুকুর। হয়তো দাসপুকুরেই লুকিয়ে আছে সাইকেল-চুরির চাবিকাঠি!

আর তখন তাদের দেখা হলো সেই রাখাল ছেলেটার সঙ্গে। একপাল মোষ তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল সে।

ট্যাঁপা তাকে ডাকল : 'এই, শোন?'

চার

রাখাল ছেলেটা আসছিল গান গাইতে গাইতে। বেশ খুশি মেজাজ। একটা লালচে মতন মোষের বাচ্চার গায়ে হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে টুকটুক করে তাল দিচ্ছিল, আর গাইছিল : 'দেখে এলেম নদীয়ায় সোনার গোরাচাঁদে রে—'

www.boiRboi.blogspot.com

ট্যাঁপা আবার ডাকল : 'এই গোরাচাঁদ, শুনছিস?'

গান থামিয়ে ছেলেটা বললে, 'আমার নাম পেল্লাদ, গোরাচাঁদ নয়।'

'ঠিক আছে, পেল্লাদই হলো। তোর বাড়ী কোথায়?'

'ওই কুমীরডাঙায়। দাসপুকুরের বাঁয়ে।'

'তা বেশ। কিন্তু একটা লোককে তুই দেখেছিস?'

পেল্লাদ হি-হি করে হাসল।

'একটা লোক কেন গো, কত লোককেই তো দেখেছি। এই তোমাদেরও তো দেখছি।'

কথাটা ভুল হয়েছে বুঝে ট্যাঁপা মাথা চুলকোলো। বললে, 'না—না, একটা সাইকেলে-চড়া লোক। সাইকেলে চেপে কেউ এদিক দিয়ে যায়নি?'

'হুঁ, গেছে বই কি। একটু আগেই তো গেল।'

'কি রকম সাইকেল? নতুন?'

'নতুন কিংবা পুরোনো—সে আমি কেমন করে জানব? তবে—' পেল্লাদ একটু ভেবে নিলে : 'তা রোদ্দুরে বেশ চিকিমিকি করছিল বটে।'

'ঠিক ধরেছি তা হলে।'—ট্যাঁপা একই সঙ্গে উৎসাহ আর রোমাঞ্চ বোধ করল : 'বুঝলি জয়, তা হলে ওই লোকটাই। আচ্ছা পেল্লাদ, লোকটা সাইকেল নিয়ে কোন্‌দিকে গেল বলতে পারিস?'

'দাসপুরের দীঘির বাগেই তো গেল মনে হচ্ছে।'—পেল্লাদ এবার চোখ মিটমিট করল : 'কেন গো, বিত্তান্তটা কী? এত খোঁজখবর নিচ্ছ কেন?'

'সে খবরে তোর দরকারটা কী?'—ট্যাঁপা বিরক্ত হলো : 'মোষ চরাতে যাচ্ছিলি, তাই চরা গে। চল জয়, আমরা দাসপুরের দীঘির দিকে এগোই।'

পেল্লাদ ব্যাজার মুখে বললে, 'বেশ লোক তো। নিজেরা আমায় সাত কাহন কথা জিজ্ঞেস করলে, আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেই দোষ? ঠিক আছে, আর কিছু বলব না আমি।'—বলেই বাচ্চা মোষটার পিঠে আবার লাঠির ঠোকা দিয়ে গান ধরল : 'দেখে এলাম নদীয়ায়—'

জয়ধ্বজ একটাও কথা বলছিল না এতক্ষণ, চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিল। ট্যাঁপা তাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, 'দাঁড়ালি কেন, চল না।'

জয়ধ্বজ বললে, 'আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে ট্যাঁপা! সাইকেল গাঁয়ের ভেতরেই কোথাও আছে, বাইরে যায়নি।'

'তুই বললেই হলো?'—ট্যাঁপা চটে গেল : 'তা হলে একটা নতুন সাইকেল নিয়ে দাসপুরের দীঘির দিকে কে গেল? মাইণ্ড ইট—দাসপুরের দীঘি। তার একদিকে ভাঙা একটা শিবমন্দির, দুদিকে জঙ্গল। গ্রাম বেশ খানিকটা দূরে। কেন লোকটা সাইকেল নিয়ে ওদিকে যাবে?'

'কেন?'

'এটাও বুঝতে পারলিনে?'—ট্যাঁপার হঠাৎ মনে হলো, সে শার্লক হোম্‌স্ হয়ে গেছে : 'সাইকেলটা দিনকয়েক ওই ভাঙা মন্দিরে কিংবা জঙ্গল-টঙ্গলে লুকিয়ে রেখে দেবে। তারপর এদিকের হৈ-চৈ থেমে গেলে ওটাকে বের করে এনে সরিয়ে ফেলবে।'

ভুরু কুঁচকে একটু চুপ করে রইল জয়ধ্বজ। তারপর বললে, 'আচ্ছা, চল।'

দুজনে এগিয়ে চলল। ট্যাঁপার উৎসাহই বেশী।

'একটু তাড়াতাড়ি পা চালা জয়! লোকটা সাইকেলটা লুকিয়ে ফেলে যদি একবার সরে পড়তে পারে, তা হলে মুশকিল হবে।'

পথের ধুলোয় টায়ারের দাগ মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার চোখে পড়ছে। যাচ্ছে দাসপুরের দিকেই। পেল্লাদ মিথ্যে কথা বলেনি।

দু'জনে দাসপুর পাশে রেখে দীঘির দিকে চলল।

পুরোনো দীঘি, পুরোনো শিবমন্দির। কতকাল আগেকার কেউ জানে না। দীঘির উঁচু পাড়িতে বেলগাছের সার, আশেপাশে জঙ্গল। অনেককাল আগে এখানে নাকি বাঘ আসত।

এখানেও টায়ারের দাগ। এতক্ষণে জয়ধ্বজেরও উৎসাহ হচ্ছিল। একটা গোলমাল কিছু আছে নিশ্চয়ই। নইলে খামোকা একটা লোক কেন আসতে যাবে এই জংলা দীঘির ধারে?

দীঘির ভাঙা ঘাটটার ওপর ওরা এসে দাঁড়াল। জল চোখেই পড়ে না। হাওয়ায় শালুক দুলছে, পদ্মপাতা দুলছে। ফড়িং উড়ছে—পদ্মপাতার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে খঞ্জন আর জলপিপি। মাথার ওপর ঝিরঝির করছে বেল আর শিরিষের পাতা।

কিন্তু কোথায় সাইকেল—কোথায় কে!

লোকটা এর মধ্যেই সরে পড়ল নাকি?

ট্যাঁপা বললে, 'শিবমন্দিরটা একবার দেখি—আয়।'

মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। মাথার ওপর পাকে পাকে জড়িয়ে একটা অশ্বত্থের গাছ। মন্দিরের দরজা নেই—ভেতরে একরাশ কালো ছায়া, ভাঙা দেওয়াল দিয়ে রোদের দু'-একটা টুকরো পড়েছে ফাটিফাটা বেদীর ওপর। কয়েকটা চামচিকে ইঁট আঁকড়ে ঝুলে আছে কোণায় কোণায়। আর কিছুই নেই।

জয়ধ্বজ বললে, 'এখানে নেই।'

ট্যাঁপা বললে, 'তাই তো দেখছি।'

হঠাৎ দীঘির পাড়ির তলা দিয়ে দুড়দাড় করে শব্দ। কেউ যেন ছুটে পালাচ্ছে।

'জয়, সেই লোকটা!'—ট্যাঁপা লাফিয়ে উঠল : 'পালাচ্ছে!'

দু'জনে দৌড়োল সেইদিকে। ঢালু পাড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে নামতে গিয়ে ট্যাঁপা পা পিছলে পড়ে গেল, গড়িয়ে পড়ল হাত তিনেক। জয়ধ্বজ তাকে টেনে তুলল।

কিন্তু পরিশ্রমটা মাঠেই মারা গেল।

যে দুড়দাড় করে দৌড়ে যাচ্ছে—তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে মানুষ নয়, পাটকিলে রঙের অল্পবয়েসী গোরু একটা। ওদের মধ্যে মধ্যে ও-রকম আচমকা ফুর্তি জেগে ওঠে, তারপরে অকারণেই লেজ তুলে দৌড়ে বেড়ায় খানিকটা।

জয়ধ্বজ বললে, 'ধেৎ—গোরু!'

ট্যাঁপা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'হুঁ, গোরুই তো। কোনো মানে হয় না—মাঝখান থেকে হাঁটুটাই খানিক ছড়ে গেল আমার।'

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ।

জয়ধ্বজ মাটিতে বসে পড়ে একটা শুকনো বেল কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙা ইঁটের ওপর ঠুকতে লাগল।

ট্যাঁপা বললে, 'কী করা যায়, জয়?'

'ভাবছি।'

'তুই তো খালি ভেবেই চলেছিস। কিন্তু লোকটা যে কোথায়—'

জয়ধ্বজ জবাব দিল না, একমনে বেলটাকে ঠুকতে লাগল।

চটে, তার হাত থেকে বেলটাকে কেড়ে নিলে ট্যাঁপা।

www.boiRboi.blogspot.com

'নে—ওঠ ওঠ—আর বসে বসে ছেলেমানুষি করতে হবে না। চল, জঙ্গলের ভেতরে দেখি একবার।'

'কিন্তু ওকে কি আর পাওয়া যাবে? কোন্‌দিকে চলে গেছে এতক্ষণে!'

'যাবে আর কোনদিকে, জঙ্গল ছাড়া? রাস্তার দিক দিয়ে যদি যেত, তা হলে তো আমরাই দেখতে পেতুম। চল জয়—সামনের জঙ্গলে খুঁজে দেখি। নিশ্চয় কোথাও ঘাপটি মেরে আছে এখানে।'

'আচ্ছা, চল—'

বেল, শিরিষ আর আগাছার বনের মধ্যে ওরা কয়েক পা কেবল এগিয়েছে, এমন সময়—

দুম্ করে একটা বন্দুকের শব্দ। একসঙ্গে দু'জনের বুক চমকে উঠল একেবারে।

লোকটাকে দেখা গেল বনের মধ্যে, সাইকেলটাকেও। তার হাতে বন্দুক। সেই বন্দুক থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর জ্বলন্ত চোখে সে চেয়ে আছে ওদের দিকেই।

পাঁচ

লোকটির মাথায় শোলার হ্যাট, গায়ে সাদা হাফশার্ট। মালকোঁচা করে ধুতি পরা। বন্দুক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখনো। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপার দিকে।

আর সাইকেলটা হেলান দেওয়া রয়েছে একটা শিমুল গাছের গায়ে, তার ক্যারিয়ারে বাঁধা একটা ক্যাম্বিসের থলে, একছড়া কলা বেরিয়ে আছে তা থেকে। হ্যান্ডেলে ঝুলছে একটা জলের বোতল।

সাইকেলটা জয়ধ্বজের নয়। কস্মিনকালেই নয়।

আর বন্দুক হাতে লোকটি কিছুক্ষণ এদের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে—জয়ধ্বজ না? এখানে কী মনে করে?'

আরে রাম—রাম, সেই পেল্লাদের কথা শুনে—এ কী কাণ্ড! এ যে জেলা বোর্ডের ওভারসিয়ার মোহনলালবাবু! ভীমরাজ পুরকায়েতের সঙ্গে খুব খাতির—দোকানে প্রায় আসেন—কখনো কাপড়-চোপড় কিনতে, কখনও বা নিছক গল্পগুজব করতে।

ট্যাঁপা গোটা দুই খাবি খেলো। জয়ধ্বজ মাথা চুলকোতে লাগল।

'আজ্ঞে কিছু না—এই একটু বেড়াতে বেড়াতে—'

মোহনলাল বললেন, 'না হে, এদিকটায় বেশী এসো-টেসো না। পুরোনো ইঁটের পাঁজা চারদিকে—বিস্তর গোখরো সাপ আছে। আমি অবিশ্যি মধ্যে মধ্যে আসি, ঘুঘু মারি, বন-মুরগীও পাওয়া যায় এক-আধটা। আর আমার সঙ্গে তো বন্দুক থাকেই।'

দুই বন্ধু চুপ। ট্যাঁপার হাঁটুটা টনটনিয়ে উঠল আবার। ধুত্তোর—খালি খালি ক্রোশখানেক হাঁটার পণ্ডশ্রম। তায় আবার ধুড়ুম করে একটা আছাড় খেতে হলো। পেল্লাদটা তো আচ্ছা হতভাগা! চারদিকের সবাই ওভারসিয়ারবাবুকে চেনে, আর সে চেনে না!

জয়ধ্বজই সামলে নিলে। বললে, 'পাখি-টাখি কিছু পেলেন মোহনকাকা?'

মোহনলাল ব্যাজার হয়ে বললেন, 'কই আর পেলুম! বরাতটাই খারাপ আজকে। বেশ মোটাসোটা একটা তিতির পেয়েছিলুম ঝোপের ভেতরে, বন্দুকের ঘোড়া টিপতে যাচ্ছি, পটুস করে ঠিক সেই সময় একটা গেছো পিঁপড়ে দিলে বাঁ কানটায় কামড়ে! ভীষণ চমকে গেলুম, হাত নড়ে গেল—একটা চার নম্বরের টোটাই বরবাদ। আর টোটার যা দাম আজকাল!'

এই বলে বাঁ কানটা খুচখুচ করে একটু চুলকে নিলেন মোহনলালবাবু। তারপর বন্দুকটাকে দু'ভাঁজ করে ভেঙে কাঁধের ওপর ব্যালান্স করলেন।

'গুলির আওয়াজে সব তো পালিয়েছে এদিক থেকে। দেখি, দীঘির পাড়ের ওপরে এক-আধটা ঘুঘু-টুঘু পাই কিনা। তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, ভারী খিদে পেয়েছে।'—ক্যাম্বিসের থলেটা থেকে কলার ছড়া আর একটা পাঁউরুটি বের করতে করতে বললেন, 'এসো হে জয়ধ্বজ, শেয়ার করো। আর তুমি—তোমাকেও চেনা-চেনা ঠেকছে—হুঁ, আচার্যি-বাড়ীর ট্যাঁপা না?'

ট্যাঁপা বললে, 'আজ্ঞে।'

'তা হলে ব্রাহ্মণ সন্তানকেই আগে দিতে হয়। নাও ধরো—' বলে একটা কলা বাড়িয়ে দিলেন।

'আজ্ঞে না—না, আমাদের কিছু দরকার নেই—আমরা—'

কিন্তু কে শুনছে সে কথা? মোহনলাল দু'জনের হাতে দুটো কলা প্রায় জোর করেই গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, 'রুটি?'

'আজ্ঞে আর না—' জয়ধ্বজ প্রাণপণে প্রতিবাদ করল: 'আমরা একটু আগেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।'

'তা হলে থাক। বন-বাদাড়ে আর ঘুরো না—' বলতে বলতে হঠাৎ মোহনলালবাবুর চোখ মিটমিট করে উঠল: 'বুঝলে জয়ধ্বজ, এদিকে আসবার সময় রাস্তায় তোমার মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

মোহনলাল একেবারে আধখানা কলা মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'তিনি কথায় কথায় তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, যেমন কাজের ছেলে, তেমনি সাবধানী আর সেই রকম দায়িত্বজ্ঞান।'

শুনে জয়ধ্বজের মুখটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল।

সাবধানী আর দায়িত্বজ্ঞানই বটে! না হলে, সকালের এমন ঝিলমিলে রোদের ভেতরে নেপালদার চায়ের দোকান থেকে সাইকেলটা তার চুরি হয়ে গেল! এরপরে মামার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াবে কোন্ মুখে?

কলার বাকীটুকু চিবুতে চিবুতে মোহনলাল আবার মিটমিট করে তাকালেন এদের দিকে।

'যাও—যাও, রোদ্দুরে খামোকা ঘুরতে নেই স্ট্রেট বাড়ী চলে যাও এবার। ভালো কথা—ধাঁধার উত্তর-টুত্তর আসে তোমাদের?'

ট্যাঁপা কলাটা ছুলতে যাচ্ছিল, থমকে গেল সে কথা শুনে। জয়ধ্বজ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'ধাঁধা?'

মোহনলাল মাথা নেড়ে বললেন, 'হুঁ—ধাঁধা। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল জবাব দিতে পারিনি। তোমরা ভেবে দেখো তো। ধাঁধাটা হলো:

চিন্তামণি নেই রে বনে,
থাকেন তিনি ঘরের কোণে।

www.boiRboi.blogspot.com

গো-মাতা তার বলেন হেসে
খড় দেবে যে—দুধ খাবে সে।—বুঝলে কিছু?'

জয়ধ্বজ বললে, 'আজ্ঞে না।'

ট্যাঁপা বিরক্ত হচ্ছিল। জয়ধ্বজের কানে কানে বললে, 'ধাঁধা-ফাঁধা নিয়ে কী পাগলামি আরম্ভ করলি জয়? ওদিকে এতক্ষণে সাইকেল-চোর—'

মোহনলাল মুচকি মুচকি হাসলেন।

'উত্তরটা বুঝি পেয়ে গেছে ট্যাঁপা?'

'আজ্ঞে না—উত্তর পাইনি। পেলে আপনাকে জানাব এখন। চল জয়, আমরা যাই—'

পাঁউরুটিতে মস্ত একটা কামড় দিয়ে মোহনলাল বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। বাড়ি চলে যাও।' তারপর কেমন মিটমিট করে তাকাতে লাগলেন ওদের দিকে। সেই তাকানোটা জয়ধ্বজের ভালো লাগল না।

আবার সেই পুরোনো রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরা। মন-মেজাজ দু'জনেরই খারাপ।

ট্যাঁপা বললে, 'ধুৎ ফল্‌স্ ক্লু।'

জয়ধ্বজ বললে, 'বুঝতে পারিনি এখনো।'

'তার মানে?—' ট্যাঁপা উত্তেজিতভাবে বললে, 'তুই কি ভাবছিস মোহনলালবাবুই সাইকেল-চোর? কিংবা চোরের দলের সঙ্গে যোগ আছে তাঁর?'

জিভ কেটে জয়ধ্বজ বললে, 'আরে রাম!'

'তবে?'

'আমি ভাবছি ধাঁধাটার কথা।'

'দুত্তোর ধাঁধা'—ট্যাঁপা চটে গেল: 'কোথাকার এক চিন্তামণি আর গো-মাতা! কোনো মানে হয় না। যত সব বোগাস লোক।'

'হয়তো একটা মজা করলেন।'

'তা হবে। কিন্তু ট্যাঁপা—তুই তো লেখাপড়ায় দারুণ ভালো ছেলে। ধাঁধাটা মনে আছে তোর?'

'কেন মনে থাকবে না?—

চিন্তামণি নেই রে বনে,
থাকেন তিনি ঘরের কোণে।
গো-মাতা তার বলেন হেসে
খড় দেবে যে, দুধ খাবে সে।—

কিন্তু ধাঁধা চুলোয় যাক। এখন তাড়াতাড়ি পা চালা।'

'কোথায় যাওয়া যাবে এবার?'

'মোনা পালের কাছে। দাগী চোর—কয়েকবার জেল খেটেছে।'

জয়ধ্বজ বললে, 'কিন্তু মামা বলছিল, মোনা নাকি আজকাল আর চুরি-চামারি করে না—স্রেফ ভালোমানুষ হয়ে গেছে।'

'ধুর—বাজে কথা। চোরের স্বভাব বদলায় কোনোদিন?'

'তা ছাড়া মোনা কোনোদিন গাঁয়ের কারুর জিনিস চুরি করেনি।'

'চোরের আবার ধম্মোজ্ঞান!'

'আরে যে দাগী চোর সে তো বোঝে, কারো কোনো কিছু খোয়া গেলে পুলিশ প্রথমেই তাকে সন্দেহ করবে, আর তাকে ধরেই পিটুনি লাগাবে।'

'তুই বড্ড এঁড়ে তক্কো করিস জয়!' ট্যাঁপা ভীষণ বিরক্ত হলো: 'পিটুনি খেলে

চোরের কিছু হয় না। ও-সব ওদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওরা জানে, পেটে খেলে পিঠে সয়।'—রেগে গিয়ে ট্যাঁপা এবার খোসাসুদ্ধু কলাটাই মুখে পুরে ফেলল: 'আমি বলছি, মোনা পালকেই একবার বাজিয়ে দেখি।'

'আচ্ছা—চল।'

মোনা পালকে খুঁজতে হলো না। বাড়ীর সামনেই ছিল সে। কালো কুটকুটে বেঁটে চেহারার লোক, মাথা ভর্তি শাদা শাদা কদমছাঁট চুল, গোঁফ আর ভুরু ধপধপে পাকা। সে তখন একটা দড়ির খাটিয়া তুলে দমাদম করে আছাড় মারছিল। আর সেই খাটিয়া থেকে টুপটাপ করে পড়ছিল প্রমাণ-সাইজের সব ছারপোকা। বিশ্রী রকম মুখ ভেংচে, পা দিয়ে ঘষে ঘষে সেইসব ছারপোকাকে সংহার করছিল মোনা পাল।

ট্যাঁপা ডাকল: 'ও মোনাদা!'

মোনা জবাব দিল না, তেমনি যাচ্ছেতাই মুখ করে ছারপোকা মারতে লাগল।

'ও মোনাদা! বলি শুনছ?'

উত্তরে মোনা পাল আবার খাটিয়ে তুলে আছাড় মারল একটা।

জয়ধ্বজ বললে, 'ওভাবে ছারপোকা সাবাড় করতে পারবে না—খাটিয়ায় আগুন লাগাও। কিন্তু ব্যাপার কী, আমাদের কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?'

মোনা পাল বললে, 'আমি আজকাল, কানে কম শুনি।'

'কবে থেকে?'—জয়ধ্বজ হেসে ফেলল: 'পরশুও তো হাটে তুমি বেশ দর-দাম করে বেগুন কিনছিলে!'

মোনা পাল নিরুত্তরে আবার আছাড় মারল খাটিয়ায়।

'মোনাদা, কবে থেকে কানে কম শুনছ?'—আবার জিজ্ঞস করল জয়ধ্বজ।

'আজ থেকে।'

'কিন্তু আমি এবার এত আস্তে আস্তে বললুম, তবু তো শুনতে পেলে?'

'মধ্যে মধ্যে শুনতে পাই, কিন্তু আর পাব না—' বলে মোনা পাল গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাটিতে চোখ নামিয়ে ছারপোকা খুঁজতে লাগল।

জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপা এ-ওর দিকে তাকাল।

হুঁ—পরিস্থিতি বেশ গুরুতর। সন্দেহের নিবিড় মেঘে আকাশ ঘনীভূত।

ছয়

ট্যাঁপা ডাকল : 'ও মোনাদা!'

মোনাদার সাড়া নেই। মাটির দিকে চোখ রেখে সমানে ছারপোকা খুঁজছে সে।

ট্যাঁপা বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে শোনোই না মোনাদা! কানে না হয় একটু পরেই কম শুনো, তার আগে সোজা বাংলায় দু-একটা কথার জবাব দাও দিকি?'

মোনা পাল এবার কানে হাত দিয়ে কেমন ঘোলা ঘোলা চোখে ট্যাঁপার দিকে তাকাল। তারপর বললে, 'অ্যাঁ—জবাই? আমি তো মুরগী জবাই করি না। কালু মিঞার কাছে যাও।'

'না—না—জবাই না, জবাব। মানে উত্তর।'

মোনা পাল বললে, 'উত্তরপাড়া? সে হলো গে তোমার কোন্নগরের কাছে।'

ট্যাঁপা চটে গিয়ে বললে, 'আমাদের, কী বলে, লাইফ্ অ্যান্ড ডেথ—মানে জীবন-মরণ সমস্যা, আর তুমি মস্করা করছ আমাদের সঙ্গে?'

www.boiRboi.blogspot.com

মোনা বললে, 'গুশকরা? না—না, সে ইদিকে কোথায়? নলহাটি লাইনে যেতে হয়।—আর...' বলেই খাটিয়াটা তুলে আর একবার চীৎকার ছাড়ল একটা।

'সোজা কথায় জবাব দাও মোনাদা—নইলে একটা বিচ্ছিরি কান্ড হয়ে যাবে, তা বলে দিচ্ছি। জয়ের নতুন সাইকেলটা নেপালদার দোকানের সামনে থেকে চুরি হয়ে গেছে। সে সাইকেল তুমি দেখেছ?'

'মাইকেল? মাইকেল তো পদ্য লেখেন। পাঠশালার পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে শুনিছি।'

ট্যাঁপা আবার চেঁচিয়ে উঠল : 'ও—কিছুতেই কানে শুনবে না ঠিক করেছ? খানিকটা ফুটন্ত গরম জল এনে কানে ঢেলে দিচ্ছি তোমার—দেখি শুনতে পাও কি না!'

মোনা এটাও শুনতে পেল না। মাটিতে ছারপোকা খুঁজতে লাগল আবার।

ট্যাঁপা তড়াক করে লাফ মারল একটা, বোধহয় কারো বাড়ী থেকে এক কেট্‌লী গরম জল আনবার জন্যেই দৌড়ে যাচ্ছিল সে। জয়ধ্বজ চটে যায়নি, বরং সমস্ত ব্যাপারটায় তার বেশ মজা লাগছিল।

'আঃ, থাম না ট্যাঁপা। মোনাদা যদি কানে শুনতে না-ই পায়, তাহলে কী করা যাবে আর?'

'না, কানে শুনতে পায় না! সবটাই চালাকি।'

'দাঁড়া—দাঁড়া, মাথা গরম করিসনি। আমি দেখছি।—ও মোনাদা!'

মোনাদা তেমনি কানে হাত দিয়ে ঘোলা চোখে জয়ধ্বজের দিকে তাকাল।

'পোনার কথা বলছ? তোমার মামা এবার অনেক পোনা ছেড়েছে তালডাঙ্গার পুকুরে।'

ট্যাঁপা খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, জয়ধ্বজ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে। তারপর বললে, 'মামা যে অনেক পোনা ছেড়েছে তালডাঙ্গার পুকুরে, সে আমি ভালোই জানি। সে খবর তোমায় দিতে হবে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, আমার সাইকেলটার কথা।'

মোনা বললে, 'কিছু শুনতে পেলুম না।'

'পাবে—পাবে—' জয়ধ্বজ একটু হাসল : 'মামা আমার সাইকেলটার কথা তোমায় কিছু বলেছিল?'

ট্যাঁপা লক্ষ্য করল না, কিন্তু জয়ধ্বজ টের পেল, মোনা পাল যেন চমকে উঠল একটু।

'জামা? খামাকা জামা গায় দেবো কেন?'

'জামা নয়—মামা।'

'ধামা? কিনবে? তা আমাকে বলছ কেন? বুনোপাড়ায় যাও, ওরা ধামা-কুলো তৈরী করে বেচে। যত ধামা চাও—দেবে।'

ট্যাঁপা রাগে সাপের মতো ফুঁসছিল। বললে, 'কী ওর সঙ্গে বকবক করছিস জয়! ও কোনো জবাব দেবে না। সোজা আঙুলে যে ঘি ওঠে না, সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। চল—থানায় যাই। সাইকেল এ-ই সরিয়েছে—নির্ঘাত'।

মোনা বললে, 'ভাত খাবে? এই বেলা তিনটের সময়? কেন—দুপুরে খাওয়া হয়নি নাকি?'

দাঁত কিড়মিড় করে ট্যাঁপা বললে 'জয়, এর সঙ্গে আর দু' মিনিট কথা বললে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে—রিয়্যালি! থানাতেই চল। দারোগা ধরে নিয়ে গিয়ে

একে বেশ করে ঠ্যাঙাক—সুড়সুড় করে সত্যি কথা আপনিই বেরিয়ে আসবে।'

'না। থানায় যাব না। মোনাদা যাতে এক্ষুনি কানে শুনতে পায়, সে ব্যবস্থা আমি করছি।'—বলেই জয়ধ্বজ মুখটাকে মোনা পালের বাঁ কানের কাছে নিয়ে গেল। তারপর কানের ফুটোয় মুখ রেখে আকাশ কাঁপানো এক বাজখাই হাঁক ছাড়ল : 'মো-না-দা!'

সেই নিদারুণ চীৎকারে ট্যাঁপার পর্যন্ত পিলে চমকে উঠল। আর মোনা আতঙ্কে গিয়ে এক লাফে হাতখানেক শূন্যে উঠে পড়ল, তারপর ধপাৎ করে বসে গেল মাটিতে।

জয়ধ্বজ বললে, 'এতেই শুনতে পাবে, না ডান কানেও আর একটা আওয়াজ দেবো?'

মোনা পাল একেবারে হাউমাউ করে উঠল।

'উরিব্বাবা! তোমার এক চীৎকারেই আমার মগজে তালগোল পাকিয়ে গেছে বাবা জয়ধ্বজ! আর হাঁক ছেড়ো না—তা হলে মারা পড়ে যাব। তুমি মানুষ খুনের দায়ে ফেঁসে যাবে তাহলে।'

'এবার সব কথা শুনতে পাচ্ছ মোনাদা?'

'শুনতে পাচ্ছিনে আবার? আমার যে বুড়ী পিসিমা তিরিশ বচ্ছর বদ্ধ কালা হয়ে রয়েছে, তোমার ওই বোম্বাই হাঁক শুনলে তারও কান সাফ হয়ে যেত। বলো, কী বলতে চাও।'

ট্যাঁপা বললে, 'এবার ডান কানে আমিও একটা ডাক ছাড়ি জয়! তখন থেকে বড্ড ভুগিয়েছে।'

মোনা পাল সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে দু'কান চেপে ধরল।

'আরিব্বাস! এতেই আমার মাথায় ঘুরন-চক্কর চলছে—তুমিও যদি একখানা ছাড়ো, তা হলে আর আমি নেই, স্রেফ গো-হত্যে হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি তোমাকে।'

জয়ধ্বজ বললে, 'তা হলে সোজাসুজি ক'টা কথার উত্তর দাও।'

'বলো।'

'আজ সকাল থেকে তুমি কী করছিলে?'

'কী আবার করব? ঘুম থেকে উঠে, মুখটুখ ধুয়ে, বাসী ভাত খানিক ছিল, তাই খেয়ে—'

'তাই খেয়ে?'

'মাঠে গেলুম। সেখানে ধান কাটা হচ্ছিল। আমিও খানিকটা কাটলুম।'

'তারপরে?'

'তারপর তোমার মামার সঙ্গে দেখা হলো।'

জয়ধ্বজ নড়ে উঠল একটু।

'মামা কী বললেন?'

'কী আর বলবেন? কেমন আছো-টাছো এইসব। তা আমি বেশীক্ষণ মাঠে থাকতে পারিনি। আমার একজন সোয়ারী ছিল কিনা, তাকে গোরুর গাড়ীতে করে ইস্টিশনে নিয়ে গেলুম—সকালের ট্রেন ধরাতে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? বাড়ী এসে ডোবা থেকে ক'টা কুচো চিংড়ি ধরলুম, কলমী শাক তুলে তাই দিয়ে রান্না করলুম। তারপর ভাত রেঁধে—'

ট্যাঁপা ছটফট করে উঠল : 'আচ্ছা জয়, পাগলামি হচ্ছে? এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মোনাদার আবোল-তাবোল শুনছিস, অথচ—'

www.boiRboi.blogspot.com

জয়ধ্বজ বললে, 'দাঁড়া—দাঁড়া, শুনেই নিই না। কিছুই বলা যায় না, কাজে লেগে যেতে পারে।—হ্যাঁ, ভাত রাঁধবার পরে কী করলে মোনাদা?'

'কী আর করব? খেলুম। কুচো চিংড়ি দিয়ে কলমী শাকের ঝোলটা যে কী ভালো হয়েছিল—'

'সে থাক। তারপর?'

'তারপর খাটিয়া পেতে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু অ্যায়সা ছারপোকা—বুঝলে, গোটা পিঠে যেন হালচাষ করে দিলে। ঘুমোব কি, পাঁচ মিনিট শুয়ে থাকে—সাধ্যি কার! তারপর খাটিয়া টেনে এনে ছারপোকা মারছি—এমন সময় তোমরা এলে।'

'এর মধ্যে আর কিছু নেই?'

'কিস্সু নেই। মা-কালীর দিব্যি।'

'মা-কালীর নাম নিয়ে মিথ্যে কথা বলছ মোনাদা? নাকি আবার চীৎকার ছাড়ব?'

'না—না, আর দরকার হবে না—' মোনা পাল শিউরে উঠে বললে, 'এখনো আমার বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি। তা—তা এর মধ্যে একটা কিছু হয়েছিল বই কি।'

'কী হয়েছিল?'

'সে ভীষণ ব্যাপার—' মোনা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলে : 'সে তো এখানে বলা যাবে না, চুপি চুপি বলতে হবে।'

'কেউ শুনছে না, কোনো লোক নেই এদিকে। বলো তুমি।'

মোনা বললে, 'না—না, বাইরে সে কথা বলবার জো নেই। চলো আমার ঘরের ভেতরে।'

ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ বললে, 'বেশ, ঘরেই চলো তা হলে।'

ট্যাঁপা আগে ঘরে ঢুকল, পেছনে জয়ধ্বজ। এবং তৎক্ষণাৎ—

তৎক্ষণাৎ এক টানে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে মোনা পাল। তারপর—ঝনাৎ! সোজা শেকল তুলে দিল দরজায়।

ভেতর থেকে ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ চেঁচিয়ে উঠল : 'এ কি হচ্ছে মোনাদা—দরজা বন্ধ করে দিলে কেন? খোলো—খোলো—'

অট্টহাসি করে মোনা পাল বললে, 'আমার কান খারাপ হয়ে গেছে, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

মোনা পালের ঘরে শেকল-বন্দী হয়ে তো দু'জনে থ।

ব্যাপারটা যে সত্যি সত্যিই এত দূর গড়াতে পারে, এ রকম ভাবাই যায়নি। এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো যাকে বলে। নেপালদার দোকানের সামনে থেকে জয়ধ্বজের নতুন সাইকেলটা চুরি হয়ে গেল, হতেই পারে, অনেক সাইকেলই তো চুরি যায়। কিন্তু গোটা জিনিস শেষ পর্যন্ত এমন প্যাঁচালো হয়ে যাবে, এ ওদের স্বপ্নেও ছিল না।

তা হলে কেবল একটা সাইকেল চুরিই নয়, যে কোনো এক ছিঁচকে চোরের কাণ্ড-কারবারও নয়! এর পেছনে গভীর চক্রান্ত আছে। কিন্তু কী চক্রান্ত? কী সে উদ্দেশ্য?

আর মোনা পাল—

কথা নেই, বার্তা নেই—দুম করে শেকল আটকে পালিয়ে গেল! কালা সাজবার ভান করে বাঁদর নাচাচ্ছিল ওদের! লোকটা তো দারুণ ঘুঘু!

ট্যাঁপা বিরক্ত হয়ে বললে, 'জয়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী? এই ঘরে কয়েদ

হয়ে থাকব নাকি?'

জয়ধ্বজ বললে, 'থাম, একটু ভেবে নিই।'

'এতে আবার ভাবাভাবির কী আছে! বেরুতে হবে না এখান থেকে?'

জয়ধ্বজ বললে, 'বেরুবার জন্যে চিন্তা নেই, ও যা পল্‌কা দরজা, একটা-দুটো লাথি মারলেই শেকল-টেকল সুদ্ধ উপড়ে পড়ে যাবে।'

'তবে তাই করা যাক, আয়।'

ট্যাঁপা দরজার দিকে এগোচ্ছিল, জয়ধ্বজ তার হাত চেপে ধরে বললে, 'দাঁড়া।'

'দাঁড়াব কী? এটা কি একটা ঘর নাকি?'—ট্যাঁপা নাক কোঁচকালো : 'রামো—রামো, কী নোংরা বিছানা-টিছানা পড়ে রয়েছে মেঝেতে! ওদিকে আবার কতগুলো হাঁড়িকুঁড়ি! যেন ছুঁচোরও গন্ধ পাচ্ছি।'

'তা কী করা যাবে, গরীব মানুষের ঘর এরকমই হয়ে থাকে।'

'তোর আবার মোনা পালের জন্যে দরদ দেখা দিল নাকি?'—ট্যাঁপা একটা হাঁ করল : 'হতে পারে গরীব, কিন্তু তাই বলে শয়তানী করবে আমাদের সঙ্গে? মানে কী এর?'

'মানে একটা আছেই, একটু একটু আঁচ পাচ্ছি যেন।'

'কী পাচ্ছিস?'

'সাইকেলটা ও-ই সরিয়েছে।'

'সে তো এখন জলের মতো পরিষ্কার—' ট্যাঁপা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'তা হলে আর সময় নষ্ট করে কী হবে, চল—দরজা ভেঙে বেরিয়ে পড়ি। ধরে ফেলি মোনাকে।'

'ধরা যাবে না। বুড়ো হলে কী হয়, এখনো ঘোড়ার মতো ছোটে। ওকে দৌড়ে ধরা তোর-আমার কাজ নয়। ও যদি অলিম্পিকে যেত না, বুঝলি, ঠিক সোনার মেডেল পেয়ে যেত স্প্রিন্টে।'

ট্যাঁপা বললে, 'জয়, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এদিকে মোনা পাল গেল পালিয়ে, আর তুই সোনার মেডেল পাওয়াচ্ছিস ওকে! ধরতে হবে না লোকটাকে?'

'ধরা যাবে ওকে, আর ধরেও কোনো লাভ নেই। আমি ততক্ষণ একটু ভেবে আমাদের পরের প্রোগ্র্যামটা একটু ঠিক করে নিই।'

'এই ঘরে? এই ছুঁচোর গন্ধের ভেতর?'

'চুলোয় যাক ছুঁচো। আগে মোনার ওপর একটু প্রতিহিংসা নেওয়া যাক।'—মিটমিট করে হাসল জয়ধ্বজ : 'শুধু ছুঁচোর গন্ধ পাচ্ছিস, আর কিছু না? ওদিকে দড়ি-বাঁধা একছড়া পাকা চাঁপা কলা ঝুলছে, দেখছিস? নিয়ে আয়—সাবাড় করে দিই।'

'এই তোর কলা খাওয়ার সময়?'

'কলা খাওয়ার আবার সময়-অসময় আছে নাকি? পেলেই খেতে হয়। কলা খেতে খেতে প্ল্যান ঠাওরাব—'

ট্যাঁপাকে দরকার হলো না, জয়ধ্বজ নিজেই কলার ছড়াটা পেড়ে আনল। বললে, 'নে।'

উৎসাহ ছিল না, তবু ট্যাঁপাকে কলা মুখে পুরতে হলো।

জয়ধ্বজ বললে, 'বেশ কলাগুলো—না?'

ট্যাঁপা রাগ করে বললে, 'সাইকেল তোকে পেতে হবে না, ওই কলাই খা।'

'আহা—দাঁড়া দাঁড়া।'—কলা চিবুতে চিবুতে জয়ধ্বজ বললে, 'আচ্ছা, মোহন-

www.boiRboi.blogspot.com

লালবাবুর সেই ছড়াটা মনে আছে?'

'দুত্তোর ছড়া! কী হবে তা দিয়ে?'

'দরকার আছে। বল না। তুই ভালো ছাত্র, ঠিক মনে করে রেখেছিস।'

ট্যাঁপা গজগজ করে বললে,

'চিন্তামণি নেইকো বনে,
আছেন তিনি ঘরের কোণে
গো-মাতা তায় বলেন হেসে,
খড় দেবে যে, দুধ খাবে সে।'

জয়ধ্বজ বললে, 'হুঁ। গো-মাতা তায়—মানে এই দুটো লাইনই খটকা ঠেকছে।'

'এখন বুঝি ধাঁধার উত্তর বের করবি?'

'উঁহু, সাইকেল খুঁজে বের করব। চল—বেরোই এখান থেকে।'

ট্যাঁপা তৎক্ষণাৎ বন্ধ দরজায় লাথি মারতে যাচ্ছিল, জয়ধ্বজ বললে, 'দরকার নেই।'

'মানে? বেরুব কী করে?'

'আরে ভেতরের ওই দরজাটা দেখছিস না? খিল দেওয়া রয়েছে? খুললেই বেরিয়ে যেতে পারব।'

'তাই তো—তাই তো!' ট্যাঁপা লজ্জা পেল। এ পাশে একটা খিল-দেওয়া দরজা যে রয়েছে তার সে খেয়ালই হয়নি। আসলে উত্তেজনায় তার মাথাই গরম হয়ে গিয়েছিল, আর জয়ধ্বজ ওটা ঢুকেই দেখতে পেয়েছে বলে একটুও ঘাবড়ায়নি।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দু'জনে পেছনের উঠোনে। মোনা পালের বাড়ীতে তো কোনো পাঁচিলের বালাই নেই, কাজেই বাইরের রাস্তায় ঘুরে আসতে আধ মিনিটও লাগল না।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কোনোদিকে জন-মানুষের চিহ্ন নেই। মোনা পাল যে কোথায় উধাও হয়েছে, ভগবানই জানেন। কেবল বাইরে তার ছার-পোকা-ভর্তি খাটিয়াটা আকাশে চারটে ঠ্যাং তুলে চিৎপাত হয়ে রয়েছে।

ট্যাঁপা বললে, 'কী করবি এখন? মোনাই নিশ্চয় সাইকেলচোর, কিন্তু কোথায় পাচার করল সেটা?'

পাশেই একটা জামগাছের তলায় মোনার গোরুর গাড়ীটা। বলদ দুটো একটু দূরে মাঠে বাঁধা—ঘাস খাচ্ছে তারা।

কপাল কুঁচকে জয়ধ্বজ একটু ভাবল। তারপর এগিয়ে গেল গোরুর গাড়ীটার দিকে।

ট্যাঁপা বললে, 'ওখানে কী?'

'দ্যাখ্ না—'

জয়ধ্বজ দ্রুত হাতে গোরুর গাড়ীতে বিছানো খড়গুলো সরাতে লাগল।

'ওর তলায় সাইকেল লুকোনো আছে? তোর মাথা খারাপ?'

জয়ধ্বজ জবাব দিল না। আর একটু পরেই তার গলা থেকে বেরুল একটা জয়ধ্বনি।

'ট্যাঁপা—এই দ্যাখ্‌।'

একমুঠো খড় বাড়িয়ে ধরেছে জয়ধ্বজ। তাতে তেলকালিমাখা।

'অ্যাঁ—এ যে—'

'হ্যাঁ, সাইকেল থেকে লেগেছে'—জয়ধ্বজ হাসল : 'এই গোরুর গাড়ীতেই সাইকেল পাচার করেছে স্টেশন থেকে আসবার সময়। কিন্তু নেপালদা তো তখন বাইরে দাঁড়িয়ে

চা করছিল—' জয়ধ্বজ ভুরু কোঁচকালো: 'চল ট্যাঁপা!'

'নেপালদার কাছে?'—উত্তেজনায় ট্যাঁপা হাঁপাতে লাগল।

'না, পঞ্চু সামন্তের কাছে। ভুলে গেলি! তমলুকে তার সাইকেলের দোকান?'

'চল—চল—'

দু'জনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

সাত

জয়ধ্বজ বললে, 'তা হলে এবার—'

ট্যাঁপা বললে, 'হুঁ, পঞ্চু সামন্ত।'

'দাঁড়া—তা হলে ব্যাপারটা মনে মনে একটু গুছিয়ে নিই।'—মোনা পালের এক কাঁদি চাঁপা কলা খেয়ে মেজাজটা খুব ভালো হয়ে গিয়েছিল জয়ধ্বজের : 'গোড়া থেকেই ধরা যাক। আমরা নেপালদার দোকানে ঢুকে চা খাচ্ছিলুম কখন? ধর—ন'টা—সাড়ে ন'টা। খড়্গপুর লোক্যাল আমাদের স্টেশন পার হয়েছে কখন? ধর—আটটা চল্লিশ—এই রকম একটা সময়ে। তা হলে—'

'তাহলে সাইকেলটা নিয়ে ট্রেনে তুলে দেয়নি তো রে?'

'সে কী করে হবে? গাড়ীতে সোয়ারী ছিল বলছে। তাদের সামনে আর সাইকেলটা চুরি করবে কী করে?'

'যদি সাঁট থাকে?'

'হতে পারে। কিন্তু তারও একটা মুশকিল আছে। স্টেশনের ভেতর একটা সাইকেল নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তোলা—লোকের চোখে পড়বেই। তা ছাড়া আটটা চল্লিশের গাড়ীতে কাউকে তুলতে হলে দশ-পনেরো মিনিট আগে এসেছে নিশ্চয়ই, তাকেও তো টিকিট কাটতে হবে। তাহলে আটটা পনেরো থেকে আটটা ত্রিশের ভেতরে—আগেও হতে পারে—মোনা পাল এসেছে স্টেশনে। তখন তো আমরা নেপালদার দোকানে পোঁছুইনি মোটেই।'

ট্যাঁপা একটু ভেবে বললে, 'হুঁ, ঠিক কথা।'

'নিতে হবে ফেরবার সময়। সে কখন? ন'টার পর থেকে সাড়ে ন'টার ভেতর।'—জয়ধ্বজের ভুরুটা একটু কুঁচকে এল: 'তখন তো নেপালদা দোকানের সামনে তার কাঠের টেবিলে চা তৈরী করছে। সাইকেল রয়েছে তার চোখের সামনেই।'—একটু থামল জয়ধ্বজ: 'কী করে সম্ভব যে নেপালদা দেখতে পেল না?'

ট্যাঁপা হঠাৎ শিউরে উঠল: 'আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, নেপালদার সঙ্গে চোরের বন্দোবস্ত আছে?'

জয়ধ্বজ হাসল।

'যাঃ!'

'যাঃ কেন? অসম্ভব নাকি?' ট্যাঁপা এবার গোয়েন্দা গল্পের লাইনে ভাবতে আরম্ভ করেছিল: 'বুঝলি, বাইরে থেকে যাকে সবচেয়ে ইনোসেন্ট মনে হয়, আসলে হয়তো দেখা যায় সে-ই সব চাইতে বড়ো ক্রিমিন্যাল। শার্লক হোম্‌সের একটা গল্পে—'

'আরে দূর শার্লক হোম্‌স্!'—ট্যাঁপার এ-সব ভালো ভালো চিন্তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলে জয়ধ্বজ: 'গল্পের কথা রাখ। জানিস, অনেক সময় নেপালদা কলকাতায় গেলে মামা তার হাতে দু-তিন হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়ে দেয় দোকানের জিনিস

www.boiRboi.blogspot.com

কেনবার জন্যে? এত বিশ্বাস করে যে, বলে—নেপালের কাছ থেকে হিসেব মেলাবারও দরকার নেই। আর যারই হোক, মামার কখনো লোক চিনতে ভুল হয় না।'

'তোর ভারি বিচ্ছিরি স্বভাব, জয়! ভেবেচিন্তে ক্লু বের করি, আর সঙ্গে সঙ্গে তুই সব গুলিয়ে দিস।'

জয়ধ্বজ বললে, 'কী করা যায় বল? মিথ্যে ক্লুর পেছনে ছুটে তো কোনো লাভ নেই। আমার কেবল মনে হচ্ছে—সবটাই যেন চোখের সামনে রয়েছে অথচ আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। যেন সেইসব প্রশ্নের অঙ্কের মত—পড়লে ধাঁধা লাগে, কিন্তু জিনিসটা ধরতে পারলেই টক করে হয়ে যায়।'

বিরক্ত হয়ে ট্যাঁপা বললে, 'মোনা পালকে ধরলেই অঙ্কের ফল মিলে যেত।'

'নিশ্চয়। একটুও সন্দেহ নেই।'—জয়ধ্বজ মাথা নাড়ল: 'আমাদের ধোঁকা দিয়ে বেমালুম পালিয়ে গেল। আর সামনে থেকে পালালেই বা কী করা যেত? এখন চুরি করে না, কিন্তু চোরের ঠ্যাং তো—তার সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়া তোর-আমার কাজ নয়।'

'লোকটার কানে আরো গোটা দুই চীৎকার ছাড়তে পারলে কাজ হত'—ট্যাঁপা গজগজ করতে লাগল।

'তা হত। কিন্তু সে কান যে এখন ক'মাইল দূরে, তা কে জানে!'

'তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'নাঃ—চল, পঞ্চু সামন্তের ওখানে একবার যাওয়া যাক। ওরই তো সাইকেলের দোকান আছে তমলুকে, চোরাই সাইকেল পাচার করে দেওয়া ওর পক্ষেই সম্ভব।'

আবার চলা। ট্যাঁপা ক্রমশঃ বিরক্ত হচ্ছে, ভাবছে—এখন মোনা পালকেই খুঁজে বের করা উচিত, তা হলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর মাথার ভেতর একটা চিন্তাই পাক খাচ্ছে জয়ধ্বজের: চোখের সামনে থেকে সাইকেলটা তুলে নিয়ে গেল, তবু কেন দেখতে পেল না নেপালদা—কেন?

আর চোরের সঙ্গে কোনো যোগ আছে নেপালদার—এ কথা পাগলেও ভাবতে পারে না!

পঞ্চু সামন্তের একটা ছোট দোকান আছে এখানেও। সকালটা সে এখানে থাকে, বিকেলে বাসে চেপে তমলুক যায়।

দোকানের সামনে, একটা প্রকাণ্ড পাম্পারের ওপর প্রায় বৈঠ্‌কি দিয়ে একটা সাইকেল-রিকশার চাকায় হাওয়া ভরছিল মিচ্‌কে। পঞ্চুর ভাইপো। তার ভালো নাম একটা কিছু নিশ্চয় আছে, কিন্তু সবাই তাকে মিচ্‌কে বলেই ডাকে। নামটা বেমানান নয়, ভারী ঘুঘু ছেলে।

ওদের আসতে দেখেই কেমন যেন আড়চোখে তাকাল মিচ্‌কে, তারপরেই আবার পাম্পারের ওপর বৈঠ্‌কি দিতে লাগল।

ট্যাঁপা বললে, 'কেমন সন্দেহজনকভাবে তাকাল—দেখেছিস জয়?'

জয়ধ্বজ বললে, 'হুঁ।'

ওরা দাঁড়িয়ে রইল, মিচ্‌কে হুস হুস করে পাম্প দিতে লাগল। পাম্প হয়ে গেলে, রিক্‌শাওলা নিতাই কৈরী তার 'পাঞ্জাব মেল' নাম লেখা রিক্‌শাটা নিয়ে বেল বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে রওনা হলো।

তখন জয়ধ্বজ ডাকল: 'এই মিচ্‌কে!'

'দাঁড়াও না—একটু জিরিয়ে নিই। হাঁপিয়ে গেছি—দেখছ না?'—হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা তেলকালি-মাখা রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগল মিচ্‌কে।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

একটু সময় দিয়ে জয়ধ্বজ বললে, 'এই মিচ্‌কে, পণ্টুমামা কোথায় রে?'

গ্রাম সুবাদে পণ্টু কিরকম মামা হয় জয়ধ্বজের। মিচ্‌কে বললে, 'মেজো কাকা? সে এখানে নেই, তমলুকে গেছে।'

'মিথ্যে কথা।'—জয়ধ্বজ ধমকে উঠল: 'পণ্টুমামা এ-বেলা কখনো তমলুকে যায় না, তার আজকে ছুটির দিন।'

'তবু গেছে।'

'না—যায়নি।'

মিচ্‌কে আবার সন্দেহজনকভাবে তাকাল। তারপর মিনমিন করে বলল, 'তবে তাই—তোমরা যখন বলছ, তা হলে যায়নি।'

'আছে কোথায় এখন?'

'আমি জানিনে।'

'জানিসনে?'—জয়ধ্বজ চেঁচিয়ে উঠল: 'আবার মিথ্যে কথা?'

তখন মিচ্‌কে মুখটাকে অদ্ভুত কাঁচুমাচু করে বললে, 'জানি জয় দা, জানি। কিন্তু বলব না—কক্ষনো বলব না।'

'কেন বলবি না?'—জয়ধ্বজ একটা কড়া ধমক দিল।—'তোকে বলতেই হবে। এই ট্যাঁপা, ধর তো ওকে। কেমন ও না বলে দেখি!'—'জানি কিন্তু বলব না—কক্ষনো বলব না!'—কেমন না বলে আমি দেখছি—'

কিন্তু কথা জয়ধ্বজের মুখেই রইল। দারুণ ঘুঘু ছেলে মিচ্‌কে, সে প্রচণ্ড বেগে একটা দৌড় দিল।

'ধর—ধর' করে ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ তার পেছু পেছু ছুটল।

কিন্তু মিচ্‌কের পায়ে তখন অলিম্পিক স্পীড্‌। খানিকটা ছোটার পর মিচ্‌কে ওদের ছাড়িয়ে জঙ্গল পার হয়ে কোথায় চলে গেল চোখের নিমেষে!

ট্যাঁপা দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।—'আর যাব না। কি হবে গিয়ে? মিচ্‌কেকে কিছুতেই ধরা যাবে না।'

জয়ধ্বজও বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। খানিকটা পর একটু জিরিয়ে নিয়ে বললে, 'চল তো পণ্টু সামন্তের বাড়ী, দেখি গিয়ে তাকে পাওয়া যায় কিনা।'

আট

পণ্টু সামন্তের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ওরা হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে।

পণ্টু সামন্তের বাড়ীতে কেউ নেই, আছে এক বুড়ী বোবা পিসি। সেই ওদের দেখাশোনা করে, রেঁধে-টেঁধে দেয়। পিসি বোবা হলে কি হবে, লোক খুব ভালো।

জয়ধ্বজ আর ট্যাঁপা গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল: 'পণ্টুমামা—ও পণ্টুমামা!'

পিসি বারান্দায় বসে বড়ি দিচ্ছিল, ফিরেও তাকাল না। আবার ডাক ছাড়ল জয়ধ্বজ: 'পণ্টুমামা, বাড়ী আছ?'

পিসির যেন ভ্রূক্ষেপও নেই।

এবার ট্যাঁপা বাজখাই গলায় এক পেল্লায় হাঁক ছাড়ল—'ও পিসি, বলি পণ্টুমামা কোথায়?'

পিসি বড়ি দেবার ছোট টিনটা হাতে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে সেটাকে উঠোনের

www.boiRboi.blogspot.com

রোদে রেখে ইশারায় বললে, 'ভালো তো সব?'

জয়ধ্বজ বললে, 'ভালো, কিন্তু পণ্টুমামা কোথায়?'

পিসি আবার একগাল হেসে ইশারায় বললে, 'তোর মা'র শরীর—'

'ভালো; কিন্তু পণ্টুমামা কোথায়?'

পিসি এবার গম্ভীর হয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

'ও পিসি, কাঁদো কেন? পণ্টুমামা কোথায়?'—ট্যাঁপা এবার চীৎকার করে বললে।

সমস্ত মুখে একটা প্রচণ্ড ভয়ের ছায়া পড়ল পিসির। তারপর হাঁউমাউ করে একটা শব্দ করল খানিকক্ষণ। তারপর চটপট বড়ি দিয়ে চড়চড়ে হাতটা ধোবার জন্যে কুয়োর পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

ট্যাঁপা ধপ্‌ করে বারান্দায় বসে পড়ল।—'জয়, এই বোবা কালা বুড়ীর সঙ্গে এভাবে কতক্ষণ কথা বলব বল তো? ও তো কিছুই বোঝে না! আর বলতেও পারে না!'

জয়ধ্বজ বসে বসে ভাবতে লাগল। বললে, 'বুঝতে যদি পারে, তা হলে ওর কাছেই পণ্টুমামার একটা হদিস মিলতেও পারে।'

কিন্তু পিসিকে বোঝানো যাবে কি করে? ট্যাঁপা বললে, 'বোঝাতেই হবে যেমন করে হোক। পিসি লোক খুব ভালো, কিন্তু ভারি সাদাসিধে মানুষ। বিশেষ ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। এজন্যে পণ্টুমামা ওকে খুব বকাবকি করে।'

'দেখ্‌ না তুই চেষ্টা করে, ওকে বোঝানোই যে শক্ত কাজ। যাক্‌, হাত ধুয়ে আসুক তো আগে!'

পিসি দু'গ্লাস জল হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটা রেকাবীতে দুটো নারকেলের নাড়ু। ইশারায় বললে, 'খাও তোমরা।'

কি বিপদ! পিসি আমাদের হাঁপাতে দেখে ভেবেছে যে, জলতেষ্টায় আমরা মরে যাচ্ছি, এখুনি জল না পেলে আমাদের প্রাণ যাবে। তাই তাড়াতাড়ি জল আর নাড়ু এনে দিয়েছেন।

জয় টপ্‌ করে রেকাবী থেকে একটা নাড়ু তুলে নিয়ে পিসির হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে পিসিকে ইশারায় বললে, 'এখানে বসো—কথা আছে। ট্যাঁপা, তুই নাড়ু আর জলটা খেয়ে ফেল, তারপর পিসিকে নিয়ে আমাদের পড়তে হবে।'

নাড়ু আর জলটা খেয়ে জয় আর ট্যাঁপা কিছুটা সুস্থ হলো। তারপর পিসির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'পিসি, পণ্টুমামা কোথায়?'

পিসি ঘাড় নেড়ে জানাল, 'কি?—বুঝতে পারছি না।'

'পণ্টুমামা—সাইকেলের দোকান করে যে।'—ট্যাঁপা মুখ দিয়ে কিরিং-কিরিং শব্দ করে বারান্দায় খানিকটা দৌড়ে বোঝাতে চাইল—যে গাড়ি বেল বাজায় আর দু'পায়ে গড়গড় করে চলে।

পিসি অবাক হয়ে ওদের দু'জনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চাইল। তারপর খানিকটা কি ভেবে নিয়ে ইশারায় জানাল: 'ঘরেই তো ছিল খাটে ঘুমিয়ে, এখন সে কোথায় গেছে জানি না—' তারপর নিজেই যেন অবাক হয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'যত সব বোবা কালাকে নিয়ে পড়া গেছে!'—ট্যাঁপা বললে।—'আমার মনে হচ্ছে উনি কিছু বুঝতেই পারছেন না।'

'পারছে না আবার! এমনিতে তো ঠোঁট নড়লেই অন্যদিন সব বুঝতে পারে, আজ একেবারে ন্যাকা সেজে গেছে যেন! কিছুতেই কিছু বুঝবে না ঠিক করেছে। ওর

কাছ থেকে যে করেই হোক কথা বের করতেই হবে ট্যাঁপা, ধৈর্য হারালে চলবে না।' —জয় বললে।

পিসি এক-একবার করে ইশারা করে, আবার ঘরের দিকে তাকায়, আবার বারান্দার কোণে কি যেন দেখে।

জয় বললে, 'পিসি, মিচ্‌কে কোথায়?'

পিসি মাথা নাড়ল। বুঝতে পারছে না।

ট্যাঁপা বললে, 'মিচ্‌কে কি এখানেই থাকে?'

জয় বললে, 'হ্যাঁ। ও পিসির খুব আদরের, ওকে পিসি ছেলের মত করে মানুষ করেছে। পিসির কেউ নেই কিনা। কিন্তু পিসি ঘরের মধ্যে বার বার তাকাচ্ছে কেন? ওখানে কি আছে?'

'পিসি, মিচ্‌কে কি পঞ্চুমামার খোঁজে গেছে?'

পিসি শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল, কোনো কথার উত্তর দিল না।

'সব বুঝছে, কিন্তু ন্যাকামির ভান করছে।' জয় বললে।

'কিন্তু উনি যদি কিছু না বলেন এই না বোঝার ভান করে, তা হলে আমরা কি করব? আমাদের তো করবার কিছু নেই। চল, চলে যাই—'

'করবার কিছু নেই? কি করি দেখ তা-হলে!'

নয়

মিচ্‌কে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসছিল।

জয়ধ্বজ বললে: 'তবে রে। যত শয়তানীর মূলে এই ছোঁড়াটা। ও সব জানে কিন্তু বলবে না। ধর তো ট্যাঁপা, ওকে।'

ট্যাঁপা আর জয়ধ্বজ ওর পেছনে ধাওয়া করতেই ও সেই ছড়াটা আওড়াতে আওড়াতে ছুট দিল তীরের মত বেগে—

'চিন্তামণি নেই কো বনে,
আছেন তিনি ঘরের কোণে
গো-মাতা তায় বলেন হেসে,
খড় দেবে যে দুধ খাবে সে।'

দৌড়ে মিচ্‌কের সঙ্গে পারে সাধ্য কার?

খানিকটা ছুটে ট্যাঁপা বসে পড়ল।

'বসলি যে?'—জয় বললে।

'না, বসব না!' চটেমটে ট্যাঁপা উত্তর দিল, 'ওর পেছনে পেছনে ছুটে কি ওকে ধরতে পারা যাবে? শুধু দৌড়োনোই সার হবে। মোহনলাল, মিচ্‌কে, নেপালদা, পঞ্চু সামন্ত—এদের সবার যোগ আছে সাইকেল-চোরের সঙ্গে।'

জয়ধ্বজও হাঁপাচ্ছিল। বললে, 'আমারও মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে যে কোন এক-জনের কাছ থেকেই সব ব্যাপারটা জানা যেতে পারে। ওদের নিজেদের মধ্যে সাঁট আছে। তা ছাড়া আর একটা কথা আমার কেমন মনে হচ্ছে, সবটাই যেন চোখের সামনে রয়েছে অথচ আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। যেন সেইসব প্রশ্নের অঙ্কের মত—পড়লে ধাঁধা লাগে, কিন্তু জিনিসটা ধরতে পারলেই টক্ করে হয়ে যায়।'

'ধরতে পারলে তো টক্ করেই হয়ে যায়, কিন্তু ধরতে পারাটাই তো সমস্যা!'

ট্যাঁপা বলল।

'ওই মিচ্‌কে সব জানে। পঞ্চুমামাকে কোনোমতে যদি ধরা যায়, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আমি মনে করি।'—জয় বললে।—'সে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। ওই মিচ্‌কে সব জানে কিন্তু বলবে না। সে যায়নি, এখানেই কোথাও আছে।'

'কিন্তু কোথায় যে আছে সেই তো কথা।'—ট্যাঁপা বললে— 'এখন আর বসে থেকে লাভ নেই, চল আমরা এগিয়ে চলি। বড্ড খিদে আর তেষ্টা পেয়েছে। একটু দূরেই আমার এক দূর-সম্পর্কের পিসিমা থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে খেয়ে নি, নইলে আর চলতে পারছি না।'

ওরা দু'জনেই এগিয়ে চলতে লাগল। বেলা পড়ে আসছে। দূরে সূর্য মাঠের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। পাখীরা বাসায় ফিরছে ধীরে ধীরে। ওরা এগিয়েই চলতে লাগল। পিসিমার বাড়ী তখন দেখা যাচ্ছে।

পিসিমারা গ্রামের সম্পতিপন্ন গৃহস্থ। অনেক ক্ষেতখামার, পুকুর, বাগান—গোয়াল ভরা গরু—মরাই ভরা ধান।

ওরা এগিয়ে যেতেই লাগল। সন্ধ্যে তখন, পিসিমা তুলসীতলায় আলো দিচ্ছেন। ওরা দু'জন উঠোনে এসে দাঁড়াতেই দেখল, পিসিমা তুলসীতলায় প্রণাম করলেন।

'পিসিমা, আমি আর আমার এক বন্ধু এসেছি। বড্ড খিদে পেয়েছে আমাদের, শিগগির কিছু খেতে দাও—'

ওরা ধপ্ করে বারান্দার ওপর বসে পড়তেই ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল, কে যেন একজন ছায়ার মত টুক করে পাছ-দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে নেমে পড়ল।

'পঞ্চুমামা না?'—জয় চীৎকার করে উঠল।

দশ

ট্যাঁপা চীৎকার করে উঠল, 'পঞ্চুমামা—!' তারপর পটলডাঙ্গার টেনিদাকে 'কোট' করে বললে, 'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস।'

জয় বললে, 'ইয়াক—ইয়াক—ছোট্—ছোট্—'

খাওয়া রইল মাথায়, ওরা পঞ্চু সামন্তের পেছনে ছুটতে লাগল।

খানিকটা সোজা পথে ছুটে লোকটা জঙ্গলের বাঁকা পথ ধরল।

তখন অন্ধকার নেমে গেছে। জঙ্গল-পথ বাঁকা, তার ওপর একটা কালো চাদরে লোকটার মুখ ঢাকা। ওরা কিছু ঠাহর করবার আগেই লোকটা তার পরিচিত পথ ধরে কোথায় কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল। একে অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, তার ওপর অপরিচিত পথ। ওরা অনেকটা ছুটেও লোকটাকে ধরতে পারল না—কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সে।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে ফের একটা বড় গোয়ালঘরের পাশে চলে এল। জয়ধ্বজ বললে, 'আমরা আজ আর বাড়ী যাব না। রাতে এই গোয়ালঘরেই থাকব। পাশেই তো ওই পঞ্চুমামার বিরাট গোয়াল, সকালে ওখানে পঞ্চুমামা আসবেই। তখন—'

একটু অনামনস্কভাবে আবার বলল জয়ধ্বজ, 'মামা সাইকেলটা দেবার সময় আমাকে বলেছিলেন, যত্ন করে রাখিস—কেউ চুরি-টুরি করে না নিয়ে যায়। আমি বলেছিলুম, কোনো চোরের ঘাড়ে তিনটে মাথা নেই যে, জয়ধ্বজ মণ্ডলের সাইকেল

চুরি করে নেবে। মামা বলেছিলেন, বেশ, দেখব, কেমন হুঁশিয়ার ছেলে তুই। সাইকেলটা উদ্ধার না করে মামার কাছে দাঁড়াতে পারব আমি! প্রেস্‌টিজ্‌ থাকবে আমার?'

'তা বটে—তা বটে!' টাঁপা ভাবনায় পড়ল।

'গেজেট সুরেশ হালদার এতক্ষণে খুকখুক করে কাশতে কাশতে গিয়ে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে মামাকে—নেপালের চায়ের দোকান থেকে তোমার ভাগনের সাইকেলটা লোপাট। জানি না মামা আমাকে এসব শোনবার পর কি ভাবছে! না টাঁপা, আমি এই গোয়ালঘরেই বসলাম, সাইকেল উদ্ধার না করে আমি আর কোথাও যাব না। যদি পাই, তখন মুখ করে বলতে পারব—দ্যাখো মামা, এই সাইকেল—জয়ধ্বজ মণ্ডলের জিনিস কেউ হজম করতে পারে না।'

ওরা গোয়ালঘরের ভেতরেই একপাশে বসে পড়ল। কিন্তু গোয়ালটা বড্ড নোংরা, পাঁক আর কাদায় ভরা। বসবার জায়গা নেই। টাঁপা বললে, 'চল না, আমরা পাশের পঞ্চুমামার গোয়ালঘরে গিয়ে বসি, ওটা বরং বেশ পরিষ্কার আছে।'

ওরা পাশের বেড়াটা পার হয়ে পঞ্চু সামন্তের গোয়ালঘরে গিয়ে ঢুকল।

গোয়ালটা পরিষ্কার বটে, তবে মশার হাত থেকে বাঁচা শক্ত। মেঘের মত কালো হয়ে এসে মশারা ওদের ছেঁকে ধরল। দু'হাত দিয়ে সরিয়েও নিষ্কৃতি নেই, সর্বাঙ্গ যেন ফুলিয়ে দিল।

তার ওপর আর এক উৎপাত। একটা গোরু পাশে দাঁড়িয়েছিল, খসখসে জিভ দিয়ে সমানে জয়ের গা চেটে চেটে চামড়া উঠিয়ে দিতে লাগল যেন সে। জয় যত পেছনে সরে যায়, গোরুটাও ততই এগিয়ে আসে। আর সরবে কোথায়? পেছনেও তো গোরুর পাল।

টাঁপা বললে, 'পাশের ঘরে খড় জমা করা আছে। চল, খানিকটা খড় ওদের মুখের সামনে এনে দিতে পারলে আর গা চাটবে না—খড় খাওয়াতেই মন দিয়ে দেবে।'

'তাই চল, খানিকটা খড়ই এনে দিই গোরুটাকে। ও তো চেটে চেটে আমার গায়ের অর্ধেক চামড়া তুলে নিলে।'

'কিন্তু খড় টানতে গেলে তো শব্দ হবে। ওরা যদি চোর মনে করে আমাদের ওপর মারধোর করে!'—টাঁপা হঠাৎ ভেবে বললে।

'তার তো সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু কি করা যায় বল? যেভাবে গোরুগুলো আমাদের চাটতে আরম্ভ করেছে তাতে এখানে যদি আর একটুও বসে থাকি, ওরা আমাদের গায়ের আর একটু চামড়াও রাখবে না। তার ওপর মশা আর ডাঁশ তো আছেই।'

'কি করা যায়? চল দেখি, চুপি চুপি যাই।—টাঁপা, তুই একটুও শব্দ করবি না। আর খড়ও টানবি খুব ধীরে ধীরে, যেন একটুও শব্দ না হয়। ওরা যেন কিছুই জানতে না পারে। তাহলে আমাকে আর তোকে ওরা আস্ত রাখবে না।'

'তা বটে! আগে তো হাতের সুখ করে নেবে চোর বলে; পরে জানতে পারলে হয়তো আপসোস করবে। কিন্তু তাতে তো আমাদের গায়ের জ্বালা কমবে না।'

'আচ্ছা চল, পা টিপে টিপে এগোই আমরা। না এগিয়ে তো কোন উপায়ও নেই।'

ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

'টাঁপা!'—জয় ডাকল। 'মোহনলালের ধাঁধাটার কথা তোর মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কেন থাকবে না? খুব মনে আছে—

চিন্তামণি নেই রে বনে,
থাকেন তিনি ঘরের কোণে।

গো-মাতা তায় বলেন হেসে
খড় দেবে যে দুধ খাবে সে।

কোত্থেকে এল ওই যে কে এক মোহনলাল—ধাঁধা-ফাঁধা নিয়ে কি যে এক পাগলামি করতে লাগল! আর জয়, তোর মাথায়ও সেই পাগলামি ঢুকেছে দেখছি।—কিসের বা চিন্তামণি, আর কিসের বা গো-মাতা! যত সব পাগলামো—'

জয় মাথা নাড়ল, 'চুপ কর—চুপ কর। আমি ভাবছি ধাঁধাটার কথা। আর অত কথা বলিস না, শেষে ধরা পড়ে যেতে হবে। একেই তো সকাল থেকে কার মুখ দেখে যেন আজ উঠেছি। সাইকেলটা চুরি গেল, তারপর থেকে সারা সকাল আমাদের ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে, তার কোনও তুলনা নেই। এরপরেও হয়তো আরো কত কষ্ট আছে কে জানে!'

ওরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

নিশুতি রাত। পঞ্চু সামন্তের বাড়ীর সবাই অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। ওরা ধীরে ধীরে খড়ের গাদার কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু খড় টানতে দ্বিধা করতে লাগল। যদি শব্দ হয়, তাহলে সবাই তো জেগে যাবে। ধরাও পড়ে যাবে, কাজও হবে না।

টাঁপা বললে, 'এখানেই বসি না আমরা! গোয়ালঘরে যাবার আমাদের কী দরকার?'

জয় বললে, 'না। জানলাটা ওদের ঘর বরাবর। ওটা খুললেই আমাদের স্পষ্ট দেখা যাবে। তার ওপর একটু যদি নড়াচড়া করি তারও শব্দ শোনা যাবে। আর গোয়ালঘরে থাকলে গোরুর নড়াচড়ায় ওরা ভাববে যে গোরুই ওরকম করছে। ওখানে যে মানুষ আছে, ওরা তা ভাবতেও পারবে না। তুই ধীরে ধীরে খানিকটা খড় ওপাশ থেকে টেনে নে। গোরুগুলোকে একটু ঠাণ্ডা করতে না পারলে ওরা আমাদের ওখানে কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে দেবে না।'

জয় এগিয়ে গেল পা টিপে টিপে; পেছনে টাঁপা। ঘরের এক কোণে খড়ের গাদার কাছে গিয়ে গোরুকে দেবার জন্য খড়ের গাদায় টান পড়তেই কি যেন লাগল হাতে।

জয় চাপা গলায় 'টাঁপা—!' বলে ডাক দিয়ে জোরে টান দিতেই হুড়মুড় করে একটা চকচকে নতুন সাইকেল মাটিতে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে পঞ্চু সামন্ত 'চোর—চোর! মিচকে, লাঠি নিয়ে আয়, গোয়ালে চোর ঢুকেছে!' বলে এক হাতে ইয়া এক বোম্বাই গদার মত লাঠি আর এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এল।

এগারো

না—না করতে করতেও জয়ধ্বজ আর টাঁপার পিঠে বেশ গোটা কতক জোর রুদ্দা ধাই ধাই করে পড়ে গেল। পঞ্চুমামা যেন কথাগুলো শুনেও শোনেন না। টাঁপা চীৎকার করে বললে, 'এ যেমন রুদ্দা হাঁকড়াচ্ছে—আমার কানটা কানপুরে, নাকটা নাগপুরে পাঠিয়ে আমায় চৌনিদার ভাষায় মুণ্ডবোধ করে ছাড়বে! চীৎকার কর—'

'ও পঞ্চুমামা!—আমরা জয়ধ্বজ আর টাঁপা!'

এতক্ষণে যেন কথাটা পঞ্চুমামার কানে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

উঠোনের ওপরে নতুন সাইকেলটা ভোরের আলোয় চকচক করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে জয়ধ্বজের মনে পড়ছে—সাইকেল নয় তো, যেন রাজত্ব। যেদিন সকালে ব্রাউন পেপারে মোড়া নতুন সাইকেলটা তাকে দেখিয়ে মামা বললেন, 'ওটা তোর, তোকে দিলুম'—সেদিন জয়ধ্বজ প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। একটা সাইকেলের সখ যে তার কতদিনের, সে কথা তার চেয়ে বেশী করে কে জানে! এ যেন না চাইতেই হাতে স্বর্গ পেয়ে যাওয়া!

হঠাৎ চমক ভাঙল। মোহনলাল আসছেন মিটমিট করে তার দিকে তাকাতে তাকাতে—

'চিন্তামণি নেই রে বনে,
থাকেন তিনি ঘরের কোণে।
গো-মাতা তায় বলেন হেসে
খড় দেবে যে দুধ খাবে সে।

—বলি জয়ধ্বজ, ধাঁধার উত্তরটা এবার এল তোমার?—কিছু চিন্তা করে পেলে?'

জয়ধ্বজ মাথা নিচু করল। কোন কথা বলল না।

'তোমার মামা তোমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, যেমন কাজের ছেলে, তেমনি সাবধানী আর সেই রকম দায়িত্বজ্ঞান। তার প্রমাণ পেলাম। কিন্তু পাবার আগে তো পরীক্ষার প্রয়োজন; তাই মোনাকে বলে তোমাদের সাইকেলটা খোঁজার সোজা পথটা একটু বাঁকা করে দিলাম। যাকে তার মামা এত প্রশংসা করছেন, তাকে একটু যাচাই করা প্রয়োজন বৈকি! তুমি কি বলো টাঁপা?'

টাঁপা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'তবে ঘোরানোটা একটু বেশী হয়ে গেছে।'—মোহনলাল দাওয়ার ওপর একটা জলচৌকি নিয়ে বসে পড়লেন।

দরজার কাছে একটা শব্দ হলো। মিচকে ঢুকছে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে হাসতে। সঙ্গে ভীমরাজ পুরকায়েত।

জয়ধ্বজ ছুটে মামার কাছে এগিয়ে গেল।

'জয়!'—মামা ডাকলেন।—'আমার কাছে দাওয়ার ওপরে বসো।'

পণ্টু সামন্ত মিচ্‌কেকে নিয়ে একটু বেরিয়ে গেল—'মামা, এক্ষুনি আসছি।'

ভীমরাজ পুরকায়েত জয় আর টাঁপাকে দাওয়ার ওপর বসিয়ে বললেন, 'দেখ, জয়ধ্বজ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।' লম্বা রোগা চেহারার লোকটি এবার বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি জানো জয়ধ্বজ, আমি নিজের চেষ্টায় এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছি। এত সম্পত্তি করেছি। আমি একটি দিন বিশ্রাম করিনি, কখনো অলস, অসাবধান হইনি।

'দিদি তোমার কথা বলতেই, আমি তোমাকে আমার দোকানে কাজ শেখাবার জন্য নিয়েছিলাম। তুমি কাজে প্রথম বিরক্ত হতে। আমি 'নামা ধনেখালি, আন শান্তিপুরী, দেখা বেগমপুর' বললেই তোমার ভুরু কুঁচকে আসত। আস্তে আস্তে তুমি কাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলে। তোমার সবটাই সয়ে গেল। আস্তে আস্তে কাজটা ভালো লাগতে শুরু করল। আমি আগাগোড়াই নজর রেখে চললাম। ভুলচুক হলে ছোটখাটো ধমক দিতাম—এ ব্যবসার কাজ বাপু, সব সময় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

'আমার উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। জানো, আমার ব্যবসার ভবিষ্যৎ মালিক তুমি। এত বড় ব্যবসা যার হাতে তুলে দিয়ে যাব, তাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে যাওয়া দরকার—

www.boiRboi.blogspot.com

সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত তার ওপর। ত্রিশ বছরের পরিশ্রমে যে দোকান আমি গড়ে তুলেছি, আনাড়ীর হাতে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যাবে—আমি তা কোনোমতেই সইতে পারব না।

'আজ দু বছর তোমার কাজকর্ম দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম। মনে হলো—না, ছেলেটা পারবে ব্যবসা সামলে রাখতে। সব সময় লক্ষ্য করি, খদ্দেরদের সঙ্গে তুমি ভালো ব্যবহার করো—কথা কইতে জানো সব রকম লোকের সঙ্গে। তোমার গুণে ব্যবসার উন্নতিও হয়েছে।

'তাই খুশি হয়ে তোমাকে একটা নতুন সাইকেল দিলাম। তুমি এটা পেয়ে কেমন যত্ন করে রাখো তাই দেখবার জন্যে—অল্প দিয়ে পরীক্ষা করছিলাম—বেশী পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সব নষ্ট করে না ফেলো। কিন্তু দেখলাম, তুমি সাইকেলটাকে চাবি দিয়ে না রেখে চা খেতে নেপালের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লে। তোমার ইচ্ছে চাবি দেবার, কিন্তু আনন্দে ভুলে গেছ। আমিই সাইকেলটা তুলে নিয়ে যাই—পণ্টু সামন্ত সেটা গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে।'

'তাহলে মামা, ও'রা আমাদের এত কষ্ট দিলেন কেন?' টাঁপা বললে।

'কষ্ট দেওয়া হলো কেন? জয়কে পরীক্ষা করছিলাম। যদি কিছু খোয়া যায় ওর, আবার তা ফিরিয়ে আনার ধৈর্য—যত্ন—শক্তি আছে কিনা তাই দেখছিলাম। ও সে পরীক্ষায় পাস করেছে। এখন আমার বিশ্বাস হলো, বিপদে পড়লে শক্ত হাতে হাতল ধরে বিপদকে কাটিয়ে ওঠবার শক্তি ওর আছে। আমি তোমায় আশীর্বাদ করি জয়, তুমি জয়ী হও।'

এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে মিচ্‌কে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে হাসতে এসে ঢুকল বাড়ীর ভেতর। পেছনে পেছনে পণ্টু সামন্ত, নেপালদা, মোনা পাল। মিটমিট করে মোহনলালও রসগোল্লার হাঁড়িটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

ভীমরাজ পুরকায়েত বললেন, 'ওটা তোমার অনার-এ আনিয়েছি জয়, তুমি ওগুলো সবাইকে ভাগ করে দাও।'

'আয় টাঁপা, তুই আমার হেল্‌প্ কর'।—বিজয়ীর হাসি হেসে জয়ধ্বজ টাঁপাকে বললে।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ

॥ এক ॥

নিদারুণ দুঃসংবাদ

শ্রীমান পিলটু চক্রবর্তীর বয়েস বারো। সে মানুষ হচ্ছিল তার পিসেমশাই আনন্দবাবুর কাছে। রাঁচীর নামকুমে।

পিলটু চক্রবর্তী আসলে কলকাতার লোক। কলকাতায় তার মা-বাবা রয়েছেন এবং আরো দুটি ছোট ছোট ভাইবোন আছে। কিন্তু আজ চার বছর ধরে পিসেমশাই তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আর কলকাতার ছোট্ট বাড়ি, ছোট ছোট পার্ক আর অনেক মানুষের ভিড় থেকে পিসেমশাই-এর কাছে এসে তার চমৎকার দিন কাটছে।

বাড়ির সঙ্গে অনেকখানি জুড়ে মস্ত বাগান। কত রকমের গাছ, কত যে ফুল, তার তো কোনও হিসেবই নেই। উত্তর দিকটায় কয়েকটা ঝাউ আর শিরিষ গাছ এমনি অন্ধকার করে রেখেছে যে, বিকেলের ছায়া পড়লে পিলটু তো আগে সেদিকে যেতে সাহসই পেত না। কিন্তু এখন আর তার ভয় নেই।

এই জন্যেই ভয় নেই যে, এবার তার জন্মদিনে পিসেমশাই তাকে একটা ভালো দেখে এয়ার গান কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত যে-সব এয়ার গান তোমরা উপহার পেয়ে থাকো, এ সে জিনিসই নয়। কর্কের মাথায় একটু বারুদ লাগানো থাকে, ঘোড়া টিপলে দুম করে একটু আওয়াজ হয় আর হাত দশেক দূরে কর্কটা ছিটকে যায়—রামো—রামো—তাকে কি আর বন্দুক বলে! তার ঘা খেলে একটা মাছির বড় জোর মিনিট খানেকের জন্যে দাঁতকপাটি লাগতে পারে, অবিশ্যি যদি মাছিদের দাঁত থাকে। (আমি মাছিদের দাঁত কখনও দেখিনি, তবে দুপুরে ঘুমুলেই যে ভাবে ওরা এসে কুটুস করে আমার লম্বা নাকটার ডগায় কামড়ে দেয়, তাতে সন্দেহ হয়, দু-একটা দাঁত ওদের থাকলেও থাকতে পারে।)

কিন্তু মাছিরা এখন থাক, পিলটুর এয়ার গানের কথাই বলি। সেট দস্তুরমতো রাইফেল। তাতে একটা হ্যাণ্ডেলের মতো আছে, তাই দিয়ে হাওয়া পাম্প করে নিতে হয়। তারপর ভরে নাও একটা ছোট্ট সীসের গুলি। (পিলটুকে পিসেমশাই তাও এক বাক্স কিনে দিয়েছেন।) এইবার লক্ষ্য ঠিক করো—ঘোড়া টেনে দাও। একটুখানি শব্দ হলো কেবল—কটাস্! বাস—দেখতে পেলে টিকটিকিটা মারা পড়েছে, কিংবা চড়ুই পাখিটা ভির্মি খেয়েছে, নয়তো কাকটা 'কাকারে কাকা—জোরসে লাগা' বলে উড়ে পালাচ্ছে, আর নইলে কাঠবেড়ালটা একেবারে পাঁই পাঁই করে শিরিষগাছের মগডালে গিয়ে উঠেছে।

এই বন্দুকটা হাতে পাবার পর থেকেই আর কথা নেই। 'ঠিক দুক্কুর বেলা, যখন ভূতে মারে ঢেলা'—চারদিক ঝিম ঝিম করে, বাগানের শিরিষ গাছগুলো ঝির

ঝির আর ঝাউ গাছগুলো শাঁ শাঁ করে, দূরে সুবর্ণরেখার জল সোনার মতো চিকচিক করে আর বাড়িতে পিসেমশাই—পিসিমা—বুড়ো চাকর গোপাল—ঠাকুর রামঅওতার আর দারোয়ান খুবলাল সিং সবাই ঘুমোয় কিংবা ঝিমোয়, তখনও পিলটু উত্তর দিকের বনের ভেতরে একা একা ঘুরে বেড়ায়। পাখি আর কাঠবেড়াল শিকার করতেও চেষ্টা করে। অবিশ্যি সাতদিনেই কারুর শিকারের হাত তৈরি হয় না, তবু এর মধ্যেই একটা কাকের লেজে সে যে গুলি লাগাতে পেরেছিল, সেটাও একেবারে কম কথা নয়।

পুজো সবে শেষ হয়েছে—এখনও সামনে লম্বা ছুটি। পিলটুর মা-বাবা-ভাই-বোন পুজোর ক'দিনের জন্যে রাঁচী বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁরা কাল আবার কলকাতায় ফিরে গেছেন। ক'টা দিন খুব হৈ চৈ করে কাটিয়ে এখন ভারী ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে পিলটুর। শিকারেও আর মন বসছে না। উত্তর দিকের বনের ভিতরে ঢুকে, বন্দুকটা মাটিতে রেখে, একফালি ঘাসের ওপর চুপটি করে শুয়ে ছিল সে। কোথায় ঘুঘু ডাকছিল, এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সোনা রঙের রোদের টুকরো—পিলটুর মনে হচ্ছিল সে যেন আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে আছে। এখনই হয়তো মস্ত কেশরওয়ালা একটা সিংহ এসে হাজির হবে, আর সে তার রাইফেলটা তুলে—

কিন্তু সিংহের গর্জন শোনা গেল না, কানে ভেসে এল পিসেমশাইয়ের ডাক।

—পিলটু—পিলটু-উ-উ—

—আসছি পিসেমশাই—গলা তুলে সাড়া দিল পিলটু। বন্দুকটা কাঁধে তুলে ছুট লাগাল ঘাসের উপর দিয়ে। বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটার চারদিকে ঘিরে পিসেমশাই বসবার জায়গা তৈরি করেছেন একটা। রাতে চাঁদ উঠলে কিংবা দক্ষিণের হাওয়া দিলে কখনও কখনও একটা বালিশে আধশোয়া হয়ে পিসেমশাই ওখানে গড়গড়া টানেন আর পিলটুকে গল্প বলেন। সে কত রকমের গল্প! তরাইয়ের জঙ্গলে কী ভাবে মাচাং বেঁধে বসে বাঘ শিকার করতেন, কিংবা হাজারীবাগের ফানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে কেমন করে ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি লড়েছিলেন—সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনী পিলটু অনেক শুনেছে! বলতে গেলে পিসেমশাইয়ের মতো শিকারী হতে পারাই তার জীবনের সব চাইতে বড় স্বপ্ন। আজও পিসেমশাই যখন সেই বাঁধানো জায়গায় এসেছেন আর তেমনিভাবে গড়গড়া নিয়ে বসেছেন, তখন নিশ্চয় ভালো গল্প শোনবার আশা আছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পিলটু হাজির হলো। ধপাৎ করে বসে পড়ল পিসেমশাইয়ের কোলের কাছে।

—কী শিকার হলো বীরপুরুষ?

—কিচ্ছু না।

—হাতি কিংবা গণ্ডার—কিছুই পাওয়া গেল না? নিদেনপক্ষে একটা গিরগিটি?

—বড়ো হয়ে মারব হাতি আর গণ্ডার। খুব নামজাদা শিকারী হবো তখন—দেখে নিয়ো।

—হুঁ!—আনন্দবাবু প্রসন্ন চোখে একবার পিলটুর দিকে তাকিয়ে মোটা গোঁফজোড়ায় তা দিলেন।

পিলটু আরো ঘেঁষে বসল তাঁর কাছে।

—একটা গল্প বলো না পিসেমশাই!

—কীসের গল্প?

পিলটু বললে—বাঘের।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু তারপরেই তার মনে হলো, দিনের বেলায় বাঘের গল্প শুনতে ভালো লাগবে না। রাত্তিরবেলা বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করে ঝিঁঝি না ডাকলে কিংবা গাছপালায় ঘন অন্ধকার না জমলে, বাঘের গল্পে গা ছমছম করতে চাইবে না।

আনন্দবাবু অল্প অল্প টান দিচ্ছিলেন গড়গড়ায়। পিলটু বলল—না, বাঘ নয়। তোমার ছেলেবেলার গল্প।

—ছেলেবেলার গল্প?

—হুঁ। আচ্ছা পিসেমশাই, তোমার এয়ার গান ছিল?

সগর্বে আনন্দবাবু বললেন—আলবত। ছেলেবেলায় কার বা এয়ার গান না থাকে?

—তুমি শিকার করেছ তাই দিয়ে?

—নিশ্চয়। কে বলবে করিনি? তবে আরো অনেক করতে পারতুম, যদি না বাবা সেটা কেড়ে নিতেন।

পিলুটার কৌতূহল বাড়তে লাগল।

—তোমার বাবা বুঝি বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছিলেন? কী করেছিলে?

—বিশেষ কিছু নয়। মানে পাড়ার হাড়কৃপণ আর বেজায় খিটখিটে লোক হারু-বাবুর চকচকে টাকে একদিন—

বলতে বলতে সামলে নিলেন পিসেমশাই—না, না, সে সব কিছু নয়। ও কথা এখন থাক। আমি বরং বাঘের গল্পই বলি।

হারুবাবুর চকচকে টাকের প্রসঙ্গে বেশ উৎসাহিত হচ্ছিল পিলটু। প্রতিবাদ করে বলল—না পিসেমশাই, বাঘ নয়। সেই যে কৃপণ আর খিটখিটে হারুবাবু—

—পিলটু!

একটা খনখনে গলা বেজে উঠল কানের কাছেই। দুজনেরই চমক লাগল। পিসিমা এসে হাজির হয়েছেন।

পিসেমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন, পিলটু একবার ভয়ে ভয়ে পিসিমার দিকে তাকাল। পিসিমা মোটেই পিসেমশাইয়ের মতো নন। দারুণ রাশভারী, বেশ চড়া মেজাজ। পিলটুকে ভালোবাসেন না, তা নয়—খুব ভালোবাসেন। কিন্তু সময় মতো পড়তে না বসলে কিংবা একটু গণ্ডগোল করলেই—সঙ্গে সঙ্গে রামবকুনি!

পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়েই পিলটুর বুঝতে বাকী রইল না, পিসিমার মেজাজ এখন ঠিক নেই। পিসিমা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন তাকে।

—পিলটু, একবার বাড়ির ভিতরে যাও। তোমার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমার কথা আছে।

পিলটু আর দেরি করল না। তক্ষুনি বন্দুকটা নিয়ে সুড়ুৎ করে বাড়ির ভিতরে হাওয়া হয়ে গেল।

কাঠগড়ার আসামীর দিকে জজসাহেব যেমন করে তাকিয়ে থাকেন, তেমনি করে পিসেমশাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পিসিমা। তারপর—

—তুমি ওকে এয়ার গান কিনে দিয়েছ কেন?

—ছেলেমানুষ বলে। নিজে তো আর কিনতে পারি না—লোকে পাগল বলবে।

পিসিমা কড়া গলায় বললেন—থামো। ঠাট্টা করতে হবে না। একে তো দুষ্টু ছেলে—তায় বন্দুক হাতে পেয়ে রাতদিন হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে। জোর করে কাছে এনে রেখেছ, যদি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে না পারো, তা হলে রমেনের কাছে কী কৈফিয়ত দেবে শুনি?

www.boiRboi.blogspot.com

রমেন পিলটুর বাবার নাম।

—ও ঠিক মানুষ হবে, তুমি ভেবো না—আনন্দবাবু গড়গড়ায় টান দিলেন।

—ছাই হবে!—পিসিমা ঠোঁট ওলটালেন—একেবারে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। ও-সব চলবে না। আমি খগেনকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে কালই আসছে।

—খগেন!—পিসেমশাই চমকে সোজা উঠে বসলেন।

—হ্যাঁ, খগেন।—পিসিমার স্বর আরো কঠোর।

পিসেমশাই একবার খাবি খেলেন—খগেন কেন আসবে?

—সব ম্যানেজ করবার জন্যে। আমার মামাতো ভাইয়ের শালার বন্ধু বলেই বলছি না—ছেলেটি সব দিক থেকেই খাসা। বিলেত থেকে ফিরে এসেও কেমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ—

—ধার্মিক হয়েছে তিন বার ব্যারিস্টারী ফেল করেছে বলে, আর বাপ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল, সেই জন্যে।

পিসিমা ধমক দিয়ে বললেন—চুপ করো। আমি খগেনকে চিঠি লিখেছিলুম। কালই সে আসছে। আর শুধু যে আসছে তা-ই নয়। এখন থেকে এখানেই সে থাকবে।

এখানেই থাকবে!—পিসেমশাই আবার খাবি খেলেন—খগেন থাকবে? সেই যে শেষরাতে উঠে বেসুরো কালীকীর্তন গায়, চারবার স্নান করে, গঙ্গাজল দিয়ে মুরগী খায় আর রাতদিন বলে—ব্যায়াম করুন? সকালে ব্যায়াম, দুপুরে ব্যায়াম, বিকেলে ব্যায়াম, সন্ধেয় ব্যায়াম, মাঝরাত্তিরেও ব্যায়াম। একবার দিল্লীতে সাতদিন আমার বাসায় ছিল, ব্যায়ামের উপদেশে শক্ত ব্যারামে পড়বার জো হয়েছিল আমার!

—ভয় নেই, তোমাকে ব্যায়াম শেখাবে না। পিলটুর জন্যেই সে আসছে।

—বেচারা!

পিসিমা ভ্রূকুটি করে বললেন—তুমি তো ছেলেটার মাথা খাচ্ছ, দেখি খগেন এসে ওকে বাঁচাতে পারে কি না!

—বাঁচাবে? মেরে ফেলবে!

পিসিমা গর্জন করে বললেন—হয়েছে, আর দরকার নেই। আমি যা বলছি তা-ই শোনো। খগেন আসবেই—কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

বলে, পিসিমা চলে গেলেন।

হা হতোস্মি! মানে—গেলুম! পিসেমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন সেখানেই।

॥ দুই ॥

দুবলাল সিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার

খুবলাল সিং আনন্দবাবুর দারোয়ান।

ভালো মেজাজের লোক। খায়-দায়, লাঠি কাঁধে এদিক ওদিক চক্কর দেয়, ফাই-ফরমাস খাটে। ভালো মনিব, সুখের চাকরি। কিন্তু সম্প্রতি সে খুব মুশকিলে পড়েছে।

মুশকিল আর কিছু নয়—দেশ থেকে তার ভাইপো দুবলাল সিং এসে হাজির

হয়েছে। নামের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। খুবলাল বেশ লম্বাচওড়া জোয়ান, কিন্তু খাস হিন্দুস্থানী হয়েও দুবলাল একেবারে প্যাঁকাটির মত রোগা। গুণের মধ্যে কেবল ঘুমুতে পারে আর ছ্যারা—র‍্যা—র‍্যা বলে হোলির ছড়া কাটতে পারে।

খুবলালকে দুবলাল চেপে ধরেছে। একটা চাকরি তাকে পাইয়ে দিতে হবে।

শুনে, গোঁফে চাড়া দিয়েছে খুবলাল। —চাকরি আছে, বেশ ভালো চাকরি। সম্প্রতি মাইল কয়েক দূরে একটা বড় ফলের বাগান কিনেছেন আনন্দবাবু। কলা, আমরুদ (পেয়ারা), পিচফল, আর আনারস সেখানে বিস্তর ফলে। কিন্তু বাঁদরেই খায় আর চুরিও যায়। সেই বাগান পাহারা দেবার জন্যেই লোক দরকার। আরামে থাকতে পারবে, পেট ভরে ফলও খেতে পারবে।

দুবলালের চোখ চকচকিয়ে উঠেছে।

—তা হলে ওটা আমারই চাই। পাইয়ে দাও চাচা।

—তোকে?—চোখ বাঁকা করে তাকিয়েছে খুবলাল।

—কেন? আমি পারব না?

—পারবি না কেন? খেতে তুই ভালোই পারবি। তোর মতো একটা খেড়ে বাঁদর থাকতে ছোটখাটো বাঁদরেরা গাছের একটা ফলও ছুঁতে পারবে না সে আমার বেশ মালুম আছে। কিন্তু বাবু তোকে নেবে না।

—কেন নেবে না?—দুবলাল ব্যথা পেয়েছে মনে। বলেছে—তামাম হাজারীবাগ জিলায় আমার মতো হোলির ছড়া কে কাটতে পারে, শুনি?—এই বলে কানে হাত দিয়ে সুর ধরেছে—ছ্যা-রা-রা-রা। আরে, বৃন্দাবন কি বনমে ডোলে—ডোলে বনো-য়ারী—হাঁ—ছ্যা রা—

—বাস্, খামোশ!—হাউমাউ করে উঠেছে খুবলাল—আর চেঁচালে বাবু এখুনি তোকে-আমাকে বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বার করে দেবে। আরে, ওতে চিঁড়ে ভিজবে না। খুব একটা জোয়ান কি—মানে জব্বর কোনো পালোয়ানী দেখাতে পারলে—তবেই। কিন্তু এই তো একটা মুসা ভি মারতে পারিস না। কে চাকরি দেবে তোকে?

—তা হলে অত আমরুদ, কলা, পিচফল আর অমন একটা খাসা চাকরি ফসকে যাবে চাচা?—বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছে দুবলাল।

তখন গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভেবেছে খুবলাল। চারবার গোঁফে তা দিয়েছে, তিনবার টিকিতে গিঁঠ দিয়েছে আর খুলেছে। তারপর বলেছে—হাঁ, মতলব এসেছে একটা।

—কী মতলব?

—গিন্নীমা আর বাবুর খুব চোরের ভয়। আজ রাতে তুই বাগানে ঢুকে নীচের জানলার একটা কাচ ভেঙে ফেলবি।

—খামোকা শিসা টুটিয়ে দিব?

—খামোকা কেন রে বুদ্ধু? তুই শিসা ভাঙলেই ঝনঝন করে আওয়াজ উঠবে। তখন আমি 'কাঁহা চোট্টা—কাঁহা চোট্টা' বলে দৌড়ে বেরুব। আর তুই একটা লাঠি হাতে করে এসে বলবি, আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম, তাইতেই চোট্টা 'হায় বাপ' বলে ভাগলপুরমে ভাগ গিয়া। বাস, কাজ হাসিল!

খানিকক্ষণ ভেবেছে দুবলাল। শেষে ঘাড়-টাড় চুলকে বলেছে—তব ঠিক হ্যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

সেদিন রাত্রে আনন্দবাবু বিষণ্ণ হয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে আছেন। খগেন আসবে—এই চিন্তাই তাঁর মাথার ভিতরে একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মতো ঘুরছে। আর হয়তো এসেই কালীকীর্তন জুড়ে দেবে। বলবে—এখন হাফপ্যান্ট পরুন, তখন মাথা নীচু করে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকুন পা তুলে। আর, শেষরাতে উঠে পাকা এক পো ছোলা খান!

তা হলে আনন্দবাবু আর নেই!

আর পিলটু? সে তো নেহাত বেঘোরেই মারা যাবে!

কিন্তু গিন্নীকে কিছু বলবার জো নেই। আনন্দবাবু তাঁকে যমের মতো ভয় পান।

গিন্নী এখনও ঘরে আসেননি, নীচের ঘরে কী নিয়ে যেন চেঁচামেচি করছেন। খগেনের হাত থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় এই দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর মাথা ঘুরছে, সেই সময় বাড়ির পুরোনো চাকর গোপাল তাঁর রোজগার বরাদ্দ দুধের গ্লাস নিয়ে এসে হাজির হলো।

আনন্দবাবু একবার আড়চোখে তাকালেন। দুধ খেতে তাঁর একেবারে ভালো লাগে না, কিন্তু গিন্নীর শাসনে মুখ ফুটে সে কথা বলবার জো নেই।

—আজ দুধটা না-ই খেলুম গোপাল।

—তা হলে গিন্নীমাকে গিয়ে বলি সে কথা।—গোপালের স্বর গম্ভীর।

—থাক, থাক, দে—

যেমন করে লোকে কুইনিন মিকশ্চার খায়, তেমনি ভাবেই দুধটা খেতে হলো আনন্দবাবুকে। তারপর কাতরদৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকালেন তিনি।

—শুনেছিস?

গোপাল কম কথা বলে। সংক্ষেপে জবাব দিল—শুনেছি।

—কী শুনেছিস?

—খগেনবাবু আসছেন।

—তাকে মনে আছে তোর?

—তেনাকে কে ভুলবে বাবু? রাত্তির পোয়াতে না পোয়াতে সেই বাজখাই গলার গান, কানে তালা ধরে যেত। তার ওপর পেস্তার সরবৎ বানাতে বানাতে আমার হাড় কালিয়ে যেত।

—হুঁ!—গোপালের মুখের দিকে চেয়ে আনন্দবাবু বললেন—কী করা যায় বল তো?

—এজ্ঞে ভগবানকে ডাকুন, তিনিই ভরসা।

আনন্দবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—সবাই বলে, ভগবান ভরসা। কিন্তু ভগবানও খগেনকে ভয় পান।

গোপাল বলল—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে। এখন শুয়ে পড়ুন।

হতাশ হয়ে আনন্দবাবু বললেন—তাই যাই, শুয়েই পড়ি। কিন্তু ঘুম কি আর আসবে?

ঘুম কিন্তু এল। শোবার দশ মিনিটের মধ্যেই আনন্দবাবুর নাক ডাকতে লাগল।

সেই নাকের ডাক অনুসরণ করেই বাগানের ভিতর গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছিল দুবলাল সিং। আর একটু এগোলেই জানলা। একখানা কাচ ভেঙে ফেলবার ওয়াস্তা। তারপরেই কেল্লা ফতে! পেয়ারা, কলা, আনারস আর পিচফলের কথা ভাবতে

গিয়েই জিভের ডগায় তার জল আসছে।

আর ঠিক সেই সময় শ্রীমান পিলটু চক্রবর্তীর ঘুম ভাঙল।

পিলটু স্বপ্ন দেখছিল। এয়ার গান নয়, রাইফেল হাতে নিয়ে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়েছে। দূরে গরিলার হাঁক শোনা যাচ্ছে, মাথার উপর অন্ধকার বাওবাব গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে মাথা ঝুলিয়ে শিকারের অপেক্ষা করছে পাইথন, আওয়াজ তুলছে শোঁ শোঁ। হায়নারা হেঁকে উঠছে থেকে থেকে, গরগর শব্দে কোথায় ঝগড়া করছে চিতা বাঘ। এমন সময় কোত্থেকে হুম্ করে একটা সিংহ একেবারে সামনে এসে হাজির।

সিংহটাকে রাইফেল দিয়ে গুলি করতে যাবে, হঠাৎ দেখে হাতে রাইফেল তো নেই, রয়েছে একটা চকোলেট। সর্বনাশ!

আর তখনি সিংহ পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল—দাও না হে, চকোলেটটা খাই!

বলতে বলতেই সিংহের মুখটা সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল-এর ব্যাকরণ সিংয়ের মতো হয়ে গেল। দারুণ চমকে জেগে উঠল পিলটু। জেগে উঠল আফ্রিকার জঙ্গলে নয়, নিজের ঘরে, বিছানার উপর। দেখল, ঘরে নীল বালবের আলো জ্বলছে আর টেবিলে পড়ে রয়েছে তার এয়ার গানটা।

কিন্তু বাইরে কেমন একটা খস খস শব্দ হচ্ছে না? মনে হচ্ছে বাগানের ভিতর কে যেন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে! টুপ করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল পিলটু। চলে এল জানলার কাছে।

পরিষ্কার দেখতে পেল, একটা টর্চের আলো বাগানের মধ্যে জ্বলেই নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর চোখে পড়ল, ঝোপের আড়ে আড়ে কে যেন এগোচ্ছে ছায়ার মতো।

নিশ্চয় চোর! বাগানে চোর ঢুকেছে।

চট করে টেবিল থেকে এয়ার গানটা তুলে নিল পিলটু।

দুবলাল সিং চুপি চুপি এগোচ্ছিল। আর একটু—আরো একটু—হাঁ, এইবার। কাচের ওপর একটা ঘা বসিয়ে দিতে পারলেই—

—খটাস—

জানলায় পিলটুর এয়ার গানের শব্দ হলো।

—আরে দাদা—মর গইরে—

নাকে এসে লেগেছে এয়ার গানের গুলিটা। টর্চ আর লাঠি ফেলে দুই লাফে দুবলাল সিং হাওয়া হয়ে গেল।

—চোর-চোর-চোর—

আর ওদিকে দুবলালের কান ধরে ঠাঁই ঠাঁই করে দুটো চাঁটি বসিয়ে তাকে খাটিয়ার তলায় চালান করে দিল খুবলাল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—সব গড়বড় কর দিয়া—বুদ্ধু কাঁহাকা!

www.boiRboi.blogspot.com

॥ তিন ॥

খগেনের আগমন

"কালী গো, কেন ন্যাংটা ফেরো,
শ্মশানে মশানে ফেরো—"

সকাল বেলায় বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন আনন্দবাবু। সবে চা খেয়েছেন, মুখে গড়গড়ার নল—মেজাজটা বেশ খুশিই আছে আপাতত। এমন কি, একটু আগেই বাড়ির সামনে ঘটঘট আওয়াজ করে যে একটা মোটর সাইকেল এসে থেমেছে, সেটা পর্যন্ত শুনতে পাননি। কিন্তু বিকট ওই গানের শব্দটা তাঁর কানের কাছে বোমার আওয়াজের মতো ফেটে পড়ল।

তাকিয়ে দেখলেন—খগেন!

একেবারে নির্ভুলভাবে খগেন—আদি এবং অকৃত্রিম! গায়ে ধুসো একটা গলা-বন্ধ কোট, মুখভর্তি গোঁফদাড়ি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, ষাঁড়ের মতো এক বিরাট জোয়ান। তারই গলা থেকে বেরুচ্ছে এই রাসভ-রাগিণী—"কালী গো, কেন ন্যাংটা ফেরো—"

যেন ভূত দেখেছেন, এমনি ভাবে চেয়ে রইলেন বেচারী আনন্দবাবু।

—আমাকে চিনলেন না?—ঝাঁটা গোঁফের ভেতর থেকে সারি সারি লাউয়ের বিচির মতো দাঁত বের করল খগেন—আমি খগেন। খগেন বটব্যাল।

—বিলক্ষণ! তোমাকে না চিনে উপায় আছে?—আনন্দবাবুর মুখখানা হাঁড়ির মতো দেখাল।

—আমি আসাতে আপনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন?

—খুশি হওয়ার কারণ দেখছি না।

—দেখছেন না?—খগেন কিছুমাত্রও দমে গেল না—তা আপনি খুশি না হলেও কিছু আসে যায় না। কাকীমাই আমায় চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি খুশি হবেন।

—অঃ!

খগেন ঘড়ঘড় করে একটা চেয়ার টেনে এনে ধপাৎ করে বসে পড়ল—কাকীমার চিঠিতেই জানলুম, এখানে আমাকে নাকি দারুণ দরকার। আমি অবশ্য আজকাল কালী সাধনায় মন দিয়েছি, বিষয়-আশয়ের দিকে ফিরে তাকাইনে। তবু কাকীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ভাবলুম, মায়ের ইচ্ছে, তাই এলুম।

—তা বেশ!

খগেন এবার খবরের কাগজটার দিকে তাকাল।

—কী পড়ছেন ওটা? কাগজ? ছোঃ! কেন যে ও-সব বাজে জিনিস পড়ে সময় নষ্ট করেন। বরং সকালে উঠে এক মনে 'মোহ-মুদ্গর' পড়বেন, দেখবেন, চিত্ত পবিত্র হয়ে যাবে। শুনুন—'নলিনী দলগত জলমতি তরলং, তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয় চপলং'—অর্থাৎ বুঝলেন কিনা, পদ্মপাতায় যেমন জল, এই জীবনও তেমনি অত্যন্ত—কী বলে—

আনন্দবাবু বললেন—কিছুই বলে না।

—বলে না? মানে?—খগেন চটে উঠল—আলবত বলে!

—তা হলে বলে!—আনন্দবাবু কাতর হয়ে উঠলেন—কিন্তু তুমি আর কিছু বোলো না। যেটুকু বলেছ, তাতেই আমার মাথা ঘুরছে।

—ঘুরছে নাকি? খগেন খুশি হলো—তা হলে আপনার হবে।

—কী হবে?—আনন্দবাবু চমকে গেলেন।

—জ্ঞান। জ্ঞান যত বাড়তে থাকবে, ততই মাথা ঘুরবে, কান কটকট করবে, দাঁত কনকন করবে, গাঁটে গাঁটে বাত দেখা দেবে—বলতে বলতে আনন্দে খগেনের গোঁফদাড়ি সব যেন নাচতে শুরু করে দিল।

উঠে ছুটে পালাবেন কিনা ভাবছিলেন আনন্দবাবু, এমন সময় পিলটুর পিসিমা এসে গেলেন।

—এই যে খগেন। কখন এলি?

—এইমাত্র। কাকাবাবুর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করছিলুম।

—আচ্ছা, সে পরে হবে। এখন হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খাবি আয়।

—জলখাবার? 'দি হোলি মাদার'-এর উপাসনা—মানে কালীকীর্তন না করে তো জলস্পর্শ করিনে কাকীমা!

—তবে কালীকীর্তন সেরে নে। আমি তোর খাবারের ব্যবস্থা করি।

—চলো তবে।—খগেন উঠে পড়ল—তবে আমি সামান্যই জলখাবার খেয়ে থাকি। মানে, সকালে ছ'টা মুরগীর ডিম, বারো খানা টোস্ট, চারটে আপেল আর ছ'টা সন্দেশ হলেই আমার চলবে, কাকীমা।

আনন্দবাবু একটা বিষম খেলেন।

—তুমি কালীভক্ত হয়ে মুরগী খাও?

ঝাঁকড়া দাড়িগোঁফের আড়ালে আবার লাউয়ের বিচি বেরিয়ে এল। মানে, খগেন হাসল।

—আপনি দেখছি শাস্ত্র কিছুই জানেন না, কাকা! সংসারের কোনো জীবকেই ঘৃণা করতে নেই। সব সমান।

—অঃ!

গিন্নী একবার কটমট করে কর্তার দিকে তাকালেন।

—খগেনের সঙ্গে শাস্তর নিয়ে তুমি আর তক্কো করো না বাপু। সারাটা জীবন তো চাকরি করলে আর ইংরেজি বই পড়লে। শাস্তরের তুমি কী জানো?

—কিছু না! কিছু না!—বলে আনন্দবাবুকে নস্যাৎ করে দিয়ে খগেন তার কাকীমার সঙ্গে কালীকীর্তন গাইতে চলে গেল।

আনন্দবাবু সেই ভাবেই বসে রইলেন। খগেন এসেই তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ছ'টা ডিম, বারোটা টোস্ট, চারটে আপেল আর ছ'টা সন্দেশ দিয়ে যার প্রাতরাশ শুরু হয়, রাতের বেলা সে মানুষ ধরে খেতে চাইবে এমনি একটা গভীর আশংকা দেখা দিল তাঁর মনে।

কিছুক্ষণ পরেই বন্দুক হাতে পিলটুর প্রবেশ।

—পিসেমশাই?

—কী খবর পিলটু?

—ও লোকটা কে পিসেমশাই? ওই যে মুখভরা দাড়িগোঁফ আর বিকট গলায় গান গাইছে?

আনন্দবাবু চিঁচিঁ করে বললেন—খগেন।

—কে খগেন?

—ও তোমার পিসিমার মামার শালার মাসতুতো ভাইয়ের কীসের যেন কী হয়। কিন্তু আসলে ও হলো খগেন। ভয়ঙ্কর খগেন।

www.boiRboi.blogspot.com

—খগেন কী করে পিসেমশাই?

—তিনবার ব্যারিস্টারী ফেল করে। ক্যাশিয়ার হয়ে দুটো ব্যাংক ফেল করায়। কালীকীর্তনের নামে বেসুরো গলায় গাঁক গাঁক করে চেঁচায়। গঙ্গাজল দিয়ে মুরগী রাঁধে। আর পিলটুকে পড়ায় আর ব্যায়াম করায়।

শুনে পিলটু দারুণ চমকে উঠল।

—কী বললে? আমাকে পড়াবে আর ব্যায়াম করাবে? এই পুজোর ছুটিতে?

—সেই জন্যেই এসেছেন।

—কক্ষনো না!—পিলটুর গলায় জ্বালাময় প্রতিবাদ—কী অন্যায়! ছুটির মধ্যে পড়তে আমার বয়ে গেছে!

—পড়তেই হবে। তুমি না পড়লেও দেখবে ও তোমায় পড়িয়ে ছাড়বে।

—দেখি, কেমন করে পড়ায়। ভারী বিচ্ছিরি কিন্তু ওই খগেন।

—খুব সম্ভব।

—আর কী বাজে ওর গোঁফ। "এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা—"

আনন্দবাবু বললেন—ছিঃ, মাস্টারকে বলতে নেই ও-সব।

—মাস্টার না হাতি!

—পিলটু!

পিসিমা এসে ঢুকলেন। আনন্দবাবু তক্ষুনি কাগজটা তুলে নিলেন—পড়তে লাগলেন একমনে। আর পিলটু দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

চশমাটা নাক থেকে একটু নামিয়ে কড়া চোখে পিসিমা কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পিলটুর দিকে।

—সকাল থেকেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছে? পড়াশুনো তোমার কিছু হবে?

—হবে পিসিমা। রাত্তির হলে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি ক'দিন ধরে। চলো এখন।

—কোথায়?

—তোমার মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করবে।

করুণ চোখে পিলটু একবার পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল। পিসেমশাই একবার তাকালেন মাত্র। তারপর কাঁচপোকা যেমন করে তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়—তেমনি করে পিসিমার পিছন পিছন প্রস্থান করল পিলটু।

আনন্দবাবু কেবল বলতে পারলেন—বেচারা!

কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটল ঘন্টা দেড়েক পরেই।

পিলটু তখন খগেনের পাল্লায় পড়েছে। আর খগেন তাকে জ্ঞান দান করছে প্রাণপণে।

—বিদ্যেটা পরে, আগে আত্মার উন্নতি। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার আত্মা অত্যন্ত ছটফটে। তা হলে তো চলবে না। অশান্ত আত্মা হচ্ছে জলের মতো তরল, তাকে আগে আইসক্রীমের মতো জমিয়ে ফেলা দরকার। আর আইস্ক্রীম... ও কি? কি দেখছ ওদিকে?

—একটা হলদে পাখি।

—না, হলদে পাখি নয়। আত্মা হচ্ছে তা হলে আইস্ক্রীম। আর—

—আমি আইসক্রীম খাবো।

—শাট্ আপ!—খগেন চটে গিয়ে পিলটুর কান ধরে মোচড় দিল একটা—

খাওয়ার কথা পরে। এখন শোনো। আইসক্রীম করে কী দিয়ে? বরফ। আত্মাকে জমাতেও বরফ চাই। সে বরফ কী? আধ্যাত্মিক ব্যায়াম। বুঝেছ?

রাগে পিলটুর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। পিসেমশাইয়ের কাছে আসবার পর থেকে কেউ তার গায়ে কখনও হাত দেয়নি। খগেনের কানমলা খেয়ে চোখ ফেটে জল আসছিল তার।

খগেন বলল—বোঝোনি? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে কাঁকড়া বিছের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দিলুম একে বলে বৃশ্চিকাসন।—বলতে বলতে নীচু হয়ে পিছনের একটা পা লেজের মতো উপরে তুলে থ্যাক্ করে লাফ দিল খগেন—এর নাম মর্কটাসন—

কিন্তু পিলটু চক্রবর্তী আর অপেক্ষা করল না। এয়ার গান তুলে খগেনের পিঠের দিকে তাকালে।

থ্যাক্ থ্যাক্ করে আর একবার মর্কটের মতো লাফাল খগেন। বলতে লাগল—এই আসন যদি ঠিকমতো করা যায়—

—খটাস—

এয়ার গানের গুলি এসে লাগল খগেনের পিঠে।

—বাপ্‌রে—

এবার আর মর্কট লাফ নয়—একেবারে সমুদ্র-লঙ্ঘন লম্ফ দিল খগেন। আর সেই সুযোগে তীরবেগে বন্দুক কাঁধে করে বনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল পিলটু।

॥ চার ॥

ঝড়ের কালো মেঘ

আনন্দবাবুর একটু ঝিমুনি এসেছিল।

স্বপ্ন দেখছিলেন, খগেন রক্তবস্ত্র পরে একটা খাঁড়া হাতে করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। বলছে—হুঁ—হুঁ—মুরগীতে কুলোবে না, নরমাংস খাব!

—দোহাই বাপু, আমাকে খেয়ো না—চেঁচিয়ে আনন্দবাবু এই কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কে যেন ডাকল: বাবু! চোখ মেলে আনন্দবাবু দেখলেন, গোপাল।

—এগুলো সব আপনার ঘরে থাকবে। পিলটুবাবুর বন্দুক আর টোটা।

—এখানে থাকবে কেন?—আনন্দবাবু আশ্চর্য হলেন।

—গিন্নীমা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন—আহা-হা, ছেলেমানুষ! ওরটা অমন করে কেড়ে নেওয়া কেন! ভারী অন্যায়!

—সে-সব গিন্নীমা জানেন।

বলতে বলতেই পিলটুর পিসিমা এসে ঢুকলেন। গোপাল এক পাশে সরে দাঁড়াল।

আনন্দবাবু বললেন—তুমি পিলটুর বন্দুক—

পিলটুর পিসিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সেই কথাই বলতে এসেছি। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা তুমি খেয়ে দিয়েছ একেবারে। একদম গোল্লায় পাঠিয়েছ।

www.boiRboi.blogspot.com

—কাকে? খগেনকে?

—খগেন গোল্লায় যাবে কেন? খাসা ছেলে। তার মাথা খাবারই বা তুমি কে? আমি পিলটুর কথা বলছি।

—অঃ!

—জানো, পিলটু কী করেছে?

—কী?

—এয়ার গান দিয়ে খগেনের পিঠে গুলি করেছে।

—কী সর্বনাশ!—আনন্দবাবু আঁতকে উঠলেন।

ধিক্কার ভরা গলায় পিলটুর পিসিমা বলে চললেন—খগেন ওকে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম শেখাচ্ছিল, সেই ফাঁকে এই কাণ্ড। খগেনের সঙ্গে যখন ওর আলাপ করিয়ে দিই, তখনই ওর চোখমুখের চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। একেবারে বাঁদর হয়ে গেছে ছেলেটা। রমেনকে কী বলবে শুনি?

আনন্দবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

—যাই হোক, পিলটুর ব্যবস্থা আমি করছি। আপাতত এই টোটা আর বন্দুক জমা রইল তোমার কাছে। খবরদার, পিলটুর হাতে যেন না যায়। খেয়াল থাকবে?

—থাকবে।

গিন্নী ঘর কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বন্দুকটার দিকে কিছুক্ষণ করুণ চোখে চেয়ে রইলেন আনন্দবাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। বেচারী পিলটু।

গোপাল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে আনন্দবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেবেলায় কখনো এয়ার গান ছুঁড়েছিস গোপাল?

—এজ্ঞে ছুঁড়িছি।

—পেলি কোথায়?

—এজ্ঞে, গাঁয়ের জমিদারের ছেলের একটা ছেলো। তা তিনি মোটে তাক করতে পারত না। আমি তেনার বন্দুক নিয়ে দনাদন শালিক পাখি, কাঠবেড়ালী এই সব মেরে দেতাম।

—আমারও বন্দুক ছিল। নিখুঁত তাক ছিল আমার। কুড়ি হাত দূর থেকে আরশোলা মারতে পারতুম। সবাই বলত, হ্যাঁ, হাত বটে খোকনের।

—আমারও খুব তাক ছিল এজ্ঞে। গোপাল জবাব দিল।

—আমার মতো নয়।

গোপাল কী বলতে যাচ্ছিল, দূর থেকে গিন্নীর ডাক এল—গোপাল—গোপাল—

—যাই এজ্ঞে, মা-ঠান ডাকছেন।

বন্দুকটা কোলে করে আনন্দবাবু বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখে পড়ল, দরজার বাইরে কাতরভাবে পিলটু দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

—পিলটু! এসো এখানে।

চোরের মতো পিলটু এসে ঘরে ঢুকল।

—খগেনকে গুলি করেছ?

পিলটু চুপ।

—খুব অন্যায় করেছ।

—ও মিছিমিছি আমার কান মলে দিলে কেন?

—গুরুজনেরা ও রকম মিছিমিছিই কান মুচড়ে দেয়।

—গুরুজন না ঘোড়ার ডিম!—পিলটু ঠোঁট ওলটাল।

—ছিঃ, বলতে নেই ও-সব।

পিলটু গোঁজ হয়ে রইল।

আনন্দবাবুর কৌতূহল বাড়তে লাগল।

—ঠিক পিঠে মেরেছ খগেনের?

—হুঁ, পিসেমশাই।

—কত দূর থেকে?

—এই হাত পাঁচেক।

—মোটে? আমি কুড়ি হাত দূর থেকেও সোজা ওর নাকে মারতে পারতুম। কথাটা বলেই আনন্দবাবু লজ্জা পেলেন, ঘুরিয়ে নিলেন কথাটা তাড়াতাড়ি।

—খুবই অন্যায় করেছ পিলটু।

—হুঁ।

—তোমার বন্দুক তো বাজেয়াপ্ত। এখন কী করছ?

পিলটু গোঁ গোঁ করে বললে—পিসিমা ত্রিশের প্রশ্নমালা থেকে আঠারোটা শক্ত শক্ত প্রশ্নের অঙ্ক কষতে দিয়েছে।

—কপাল!—সহানুভূতিভরা গলায় আনন্দবাবু বললেন—করো গে যাও।

—ওই খগেনটা কেন এল পিসেমশাই?—পিলটু আবার গজগজ করতে লাগল—ও না এলে তো কোনো গণ্ডগোল হত না।

—চুপ—চুপ!—সভয়ে আনন্দবাবু পিলটুকে থামিয়ে দিলেন—তোমার পিসিমা শুনতে পেলে আঠারোর জায়গায় আটান্নটা অঙ্ক চাপিয়ে দেবেন তোমার ঘাড়ে। এখন যাও, লক্ষ্মীছেলের মতো আঠারোটাই কষে ফেলো।

পিলটু চলে গেল।

আনন্দবাবু বন্দুকটা হাতে করলেন। তাঁর চোখ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। স্মৃতির সামনে ময়মনসিংহের সেই ছেলেবেলার দিনগুলো ভাসছে। একটা মস্ত মাঠের ভিতর বড় বড় সবুজ ঘাস চামরের মতো দুলছে। সেই ঘাসবনে আনন্দবাবু ঘুরছেন বন্দুক হাতে। ওই তো একটা মেটে রঙের মস্ত খরগোশ! তাক করলেন, ঘোড়া টিপলেন, তারপর—

মনটা ফিরে এল বর্তমানের ভেতর।

হাতের তাক তাঁর তো যায়নি। বড় হয়ে শিকার করেছেন সুন্দরবনে, হাজারী-বাগের জঙ্গলে। এয়ার গানের লক্ষ্যও কি তাঁর ব্যর্থ হবে?

ঘরের কোণে টেবিলের উপর মাটির তৈরী একটা বুড়োর মূর্তি। আনন্দবাবু বসা অবস্থাতেই সেটাকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলেন।

—খটাস!

মূর্তিটার বাঁ কান উড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

—ইউরেকা! পেয়েছি!—উল্লাসে দাঁড়িয়ে উঠলেন আনন্দবাবু—সেই ছেলেবেলার নিখুঁত তাক এখনো আছে। কিন্তু আরো ভালো করে যাচাই করতে হচ্ছে। কী করি? কী মারব?

বন্দুক হাতে করে ছেলেমানুষের মতো এগিয়ে গেলেন তিনি জানলার কাছে।

বাগানের ভিতরে বসে পরমানন্দে তখন মুরগী ছাড়াচ্ছিল খগেন। গলা দিয়ে তার উৎকট রাগিণী বেরিয়ে আসছে—এবার কালী তোমায় খাব—

তার থেকে প্রায় পনেরো গজ দূরে জানলা দিয়ে আনন্দবাবু মুখ বার করলেন।

—কী করি? কী মারব?

কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। কেবল খগেনকে ছাড়া।

আনন্দবাবুর মাথার ভিতরে দুষ্টু সরস্বতী ভর করল। পিলটু খগেনের পিঠে গুলি করেছিল পাঁচ হাত দূর থেকে। আমি পারব না পনেরো গজ দূর থেকে? এতই কি অসম্ভব?

কী করছেন বোঝবার আগেই শব্দ হলো—খটাস!

—ওরেঃ বাবা!—

শূন্যে একটা লাফ মারল খগেন। আর তৎক্ষণাৎ টুপ করে জানলার নীচে ডুবে গেলেন আনন্দবাবু।

শুধু একজন লোক ব্যাপারটা দেখতে পেল। বাগানের ভিতর ছাগল বাঁধতে এসে স্তম্ভিত চোখে সে দেখেছিল আনন্দবাবুর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

সে ওই বাড়ির দারোয়ান—দুবলাল সিংয়ের চাচা খুবলাল সিং।

॥ পাঁচ ॥

এক একটি দুর্ঘটনা

ঝড়ের মতো খগেনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দবাবুর ঘরে ঢুকলেন পিলটুর পিসিমা। ভয়ে, লজ্জায় আনন্দবাবু তাঁর ডেক-চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে রইলেন। এইবারেই বুঝি তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা!

ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল খগেন।

—প্রতিকার চাই—অবিলম্বে চাই! ওই ছেলেটার গা থেকে যদি ছাল-চামড়া তুলে না নিয়েছি, তা হলে আমার নাম খগেন বটব্যালই নয়!

আনন্দবাবু বললেন—অত চেঁচিয়ো না খগেন, আমার ব্লাড্‌প্রেশার বেড়ে যাবে।

—চেঁচাব না, মানে? জানেন আপনি? ওই বাঁদর ছেলেটা আবার আমার পিঠে গুলি করেছে।

—অসম্ভব!—আনন্দবাবু সজোরে মাথা নাড়লেন—অসম্ভব! এ কিছুতেই হতে পারে না।

—হতে পারে না মানে? আপনি কি বলতে চান আমার পিঠে শুধু শুধু মার্বেলের মতো ফুলে উঠেছে?

—তা আমি কী করে বলব? তোমার পিঠ ফুটবলের মতো ফুলে উঠলেই বা কী আসে যায়? বন্দুক রয়েছে আমার ঘরে, পিলটু কী করে গুলি ছুঁড়বে? কথাটা কী জানো খগেন? দিনরাত কালীকীর্তন গাইতে গাইতে মাথাটা বেশ একটু গরম হয়ে গেছে তোমার। তাই সব সময় ভাবছ তোমার পিঠে কে যেন গুলি করছে।

খগেন ঘোঁত ঘোঁত করে বলল—আর ফোলাটা?

—বাত।

—বাত?—খগেন প্রতিবাদ করল—আমার বাত নেই। আমার বাত কখনো হয়নি।

—কিন্তু হতে কতক্ষণ?—আনন্দবাবু বললেন—ছেলেবেলাতে নিশ্চয় তোমার

www.boiRboi.blogspot.com

দাড়িগোঁফ ছিল না, কিন্তু এখন তো মুখভর্তি গজিয়েছে!

পিলটুর পিসিমা এবার আনন্দবাবুকে একটা ধমক দিলেন।

—আঃ, কী বকবক করছ তুমি?

—বকবক মানে? সত্যি কথাই বলছি। অত ডিম, মুরগী কখনো সহজে হজম হয়? কোনদিন হয়তো বা খগেনের মনে হবে, ও একটা খাজা কাঁঠাল, আর পৃথিবীর যেখানে যত কাক আছে, সবাই এসে ওকে ঠোকরাচ্ছে। কালীসাধকদের অসাধ্য কিছুই নেই!

পিসিমা চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আনন্দবাবুর দিকে। একটা কুটিল সন্দেহ হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছে তাঁর মনে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্বামীর কৈশোরের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে যে-সব গল্প শুনতেন, তারই দুটো-একটা ভেসে উঠছিল স্মৃতির উপর।

—আমি কথা বলছি। খগেন, তুমি এখন বাইরে যাও।

গোঁ গোঁ করতে করতে কালীসাধক বেরিয়ে গেল।

পিসিমা আনন্দবাবুর আরো কাছে এগিয়ে এলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বললেন—বন্দুক এ-ঘরের বাইরে যায়নি। গুলি তাহলে করল কে? শুনেছি, ছেলেবেলায় তোমার এয়ার গানের দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোককে তুমি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে। এ তোমারই কাণ্ড নয় তো?

—আমার? কী বলছ তুমি?—আনন্দবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—সেইরকমই তো সন্দেহ হচ্ছে।

তারস্বরে প্রতিবাদ তুললেন আনন্দবাবু।

—এ অন্যায় সন্দেহ। অত্যন্ত অন্যায়। আমি খগেনকে গুলি করব কেন? ও কি গুলি করবার যোগ্য? ও খরগোশ নয়, পাখি নয়—এমন কি, নেংটি ইঁদুরও নয়। ও সকলের চাইতে অখাদ্য। ওকে গুলি করব কোন দুঃখে? বুড়ো বয়েসে আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

—তুমিই জানো।—সন্দিগ্ধ চোখে আর একবার কর্তার দিকে তাকিয়ে গিন্নী বন্দুক আর গুলির বাক্স তুলে নিলেন—যাই হোক, এটা দেখছি তোমার কাছেও নিরাপদ নয়। আমার ঘরেই আমি নিয়ে চললুম।

গিন্নী বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল আনন্দবাবুর। যাক—ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু পিলটুর জন্যে এখন দুঃখ হচ্ছে। ওকে ডেকে আঠারোটো অঙ্ক থেকে অন্তত ন'টা তাঁর কষে দেওয়া উচিত। তাদের দুজনের দোষের ভাগ তো এখন সমান।

পিলটুকে ডাকতে যাচ্ছেন, হঠাৎ শুনলেন—হুজুর!

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দারোয়ান খুবলাল সিং।

—কী খবর খুবলাল?

—একঠো আরজি আছে হুজুর।

—কী আরজি? চটপট বলে ফেলো।

—হিন্দুর ওধারে যে বাগানটা কিনিয়েছেন হুজুর, তার একজন দারোয়ান চাই বলছিলেন না?

—তা লোক পেয়েছ?

—লোক তো আছেই হুজুর। হামার ভাতিজা দুবলাল সিং।

আনন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—দুবলাল? ওই চিংড়ি মাছের মতো ছোকরাটা?

ওটা তো অকর্মার গোঁসাই। না—না—ওকে দিয়ে কাজ চলবে না।

খুবলাল বলল—ওকে লিবেন না হুজুর?

—পাগল নাকি?

—তোবে হামি গিন্নীমার কাছে যাচ্ছে। গিয়ে বোলছে, হামি দেখলাম কি, বাবু বন্দুক নিয়ে খগেনবাবুর পিঠ বরাবর গোলী মারিয়ে দিল।—খুবলাল বিনীত হাসি হাসল।

—আঁ?—আনন্দবাবু চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে পড়লেন।

—আর দুবলালকে নোকরিটা দিলে হামি কুছু জানে না। কুছু দেখেনি।

—আলবত—আলবত!—আনন্দবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—চমৎকার লোক দুবলাল। বাগানের জন্যে আমি এখনি ওকে নিয়ে নেবো। কিন্তু জানোই তো খুবলাল, গিন্নীমাকে রাজী করাতে না পারলে—

—হুঁ।—এইবারে খুবলালও চিন্তিত হলো।

—গিন্নীমা বললে আমি সংগে সংগেই দুবলালকে চাকরি দেবো। কিন্তু গুলি করবার কথাটা—

—হামি কুছু জানে না হুজুর, হামি কুছু দেখেনি।

সেলাম করে খুবলাল বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সন্ধে হয়ে গেছে। শরতের জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে চারদিকে। আনন্দবাবু নিজের ঘরে টেবিল ল্যাম্প জেলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ সম্বন্ধে কী একটা ইংরেজী বই পড়ছেন। পিলটু আঠারোটা অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, এখন পর্যন্ত তার ছ'টার বেশি কষা হয়নি। পিলটুর পিসিমা খগেনের জন্যে মুরগীর রোস্টের তত্ত্বাবধান নিয়ে রান্নাঘরে ব্যতিব্যস্ত।

আর বাগানে সেই বাঁধানো পাথরের বেদীটার উপরে বসে খগেন গান ধরেছে—

ডুব দে রে মন কালী বলে—

সেই সময় রান্নাঘরের সামনে এসে খুবলাল সিং ডাক দিল—মাঈজী!

গিন্নী বেরিয়ে এলেন।

—কী হয়েছে দারোয়ান?

—বাবুর নতুন বাগানটার জন্যে হামার ভাতিজা দুবলালকে যদি দারোয়ানী দেন—

—দুবলালকে?—গিন্নী চটে উঠলেন—ওকে দিয়ে কী হবে? ওই তো প্যাকাটির মতো শরীর। বাগানের বাঁদর তাড়ানো দূরে থাক, বাঁদররাই ওকে তাড়িয়ে দেবে। না-না—ও-সব লোকে কাজ চলবে না।

—ওকে লিবেন না মাঈজী।

—উঁহু, অসম্ভব।

—আদমি বহুৎ ভালো ছিল মাঈজী।

গিন্নী কড়া গলায় বললেন—ভালো আদমিতে আমার দরকার নেই। আমি চাই ভালো দারোয়ান। ও সব হবে না।

—হোবে না?

—না। গিন্নী ব্যাপারটা ওইখানেই মিটিয়ে দিয়ে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বিমর্ষ হয়ে খুবলাল চলে গেল। মাঈজীকে রাজী করানো যাবে বলে মনে হচ্ছে

www.boiRboi.blogspot.com

না। এই বুম্বু ভাইপোটাকে নিয়ে বিপদেই পড়া গেল! ঘাড় থেকে না নামাতে পারলে তার যথাসর্বস্ব খেয়ে শেষ করে দেবে! কী করা যায়!

আনন্দবাবুর বাগানে জ্যোৎস্নায় পাখি ডাকছিল। আর গিন্নীমার ঘরে তাঁর বড়ো আয়নাটা পরিষ্কার করতে করতে গোপালের মন উদাস হয়ে গেল।

সেই ছেলেবেলার দিনগুলো। নদীতে সাঁতার কেটে, গাছে উঠে, মাঠে চরে-খাওয়া ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে তাকে ছুটিয়ে দেওয়া—সে কতকাল আগেকার কথা!

ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পিলটুর এয়ার গানটা রয়েছে। মনে পড়ল, সে আর জমিদারের ছেলে কান্তিবাবু বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পেটমোটা শেয়াল সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর কান্তিবাবু বলছেন—এই গোপলা, মার তো মার তো ওই শেয়ালটাকে—

অন্যমনস্ক হয়ে বন্দুকটা তুলে নিল গোপাল। একটা গুলিও ভরল।

বাগানের সেই বেদীতে বসে সমানে গান গেয়ে চলেছে খগেন। একটু দূরেই রান্নাঘর। সেখান থেকে মুরগীর রোস্ট আর খাঁটি ঘিয়ের প্রাণ-মাতানো গন্ধ আসছে। গন্ধটা যত নাকে লাগছে—ততই খগেনের গলা চড়ছে—

"ডুব দে রে মন কালী বলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কালী-কুণ্ডলিনীর কূলে—"

গোপাল জানলার কাছে এগিয়ে এল। জোৎস্নায় খগেনের পিঠটা চকচক করছে। হঠাৎ গোপালের মনে হলো, ও খগেন নয়—যেন একটা ভুঁড়ো শেয়াল বসে আছে ওখানে। আর কান্তিবাবু যেন পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন—মার গোপাল—মেরে দে ওকে—

বন্দুকে আওয়াজ উঠল—খটাস!

আর সঙ্গে সঙ্গে ছটাস করে বাগদা চিংড়ির মতো লাফিয়ে উঠল খগেন। হেঁড়ে গলার আর্তনাদ উঠল কাঁপিয়ে—বাপ্‌রে—গেলুম!

গিন্নীর ড্রেসিং টেবিলের উপর বন্দুকটা নামিয়ে রেখে গোপাল তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে উধাও হলো।

॥ ছয় ॥

শেষ মার

—কাকীমা—কাকীমা—কাকীমা—

রাঁচী নামকুম, হিনু—ডুরাণ্ডা সব একসঙ্গে কাঁপিয়ে খগেন গগনভেদী চিৎকার করতে লাগল।

রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন গিন্নী।

—কী হয়েছে! অত চেঁচামেচি কেন?

—চেঁচাব না? দক্ষযজ্ঞ করব এইবারে। আবার কে আমায় গুলি করেছে!

www.boiRboi.blogspot.com

পিলটুর পিসিমা অবাক হয়ে গেলেন।

—পাগল নাকি? বন্দুক তো আমার ঘরে। কে গুলি করবে তোকে?

—তা জানি না, কিন্তু এই দ্যাখো, পিঠটা প্রায় ফুটো করে দিয়েছে এবার।

—অসম্ভব। পিলটু কখনো আমার ঘরে ঢুকবে না। তুই খেয়াল দেখেছিস খগেন।

—খেয়াল!—খগেন হাঁই-মাই করে উঠল—পিঠটা টোম্যাটোর মতো ফুলে উঠেছে, আর তুমি বলছ খেয়াল! ও সব বদখেয়াল আমার নেই।

গিন্নী চিন্তায় পড়লেন। তারপর খগেনকে নিয়ে এগোলেন কর্তার ঘরে।

—শুনছ? আবার কে খগেনকে বন্দুক মেরেছে।

আনন্দবাবু এবার সত্যি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—কিন্তু বন্দুক তো তোমার ঘরে—গুলি করবে কে? যত সব আজগুবি কথা! আমি তো আগেই বলেছি, অতগুলো মুরগীর ডিম খেয়ে খগেনের পেট গরম হয়ে গেছে। তাই আবোল-তাবোল বকছে।

খগেন জোরালো গলায় প্রতিবাদ করল।

—না, আমি মোটেই আবোল-তাবোল বকছি না।

—নিশ্চয় বকছ! রাঁচীতে যখন এসেছ তখন আর একটু এগোলেই তুমি কাঁকেতে পৌঁছবে। সেইখানেই যাও, সেইটিই তোমার পক্ষে আদত জায়গা।

গিন্নী বললেন—থামো। খগেন, তা হলে তুমি বলতে চাও ভূতেই তোমাকে গুলি করেছে?

—ভূত-ফুত জানি না। আমার পিঠটাকে যেন ঝাঁঝরা করে দিল। কাকীমা, তুমি যদি এর ব্যবস্থা না করো, তা হলে এখানে আমি আর থাকব না। এখান থেকে সোজা বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করতে চলে যাব।

আনন্দবাবু বললেন—আঃ, থামো না তুমি। শোনো খগেন, এখন এ-ভাবে আর দাপাদাপি কোরো না। আজ রাতে ভালো করে খেয়েদেয়ে গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে আমি যা হয় এর একটা ব্যবস্থা করব।

—বেশ, একটা রাত আপনাদের সময় দিচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে যদি এর প্রতিকার না নয়—তা হলে আমি কিন্তু কেলেঙ্কারী করে ছাড়ব।

দাপাদাপি করতে করতে কাকীমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেল খগেন।

খগেন মিথ্যে নালিশ করেনি, আনন্দবাবু তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু গুলিটা সত্যিই করল কে? পিলটু নয়—তিনিও নন। তবে কি ভূতের কাণ্ড?

ভাবতেই আনন্দবাবুর গা ছমছম করে উঠল, ভূতকে দারুণ ভয় পান তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, খগেনকে ভগবানও ভয় পান—ভূতের সাধ্য কি ওকে গুলি করে?

—বাবু?

ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল গোপাল।

—কি রে গোপাল, কাঁদছিস কেন?

গোপাল এসে আনন্দবাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

—আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—সে কি রে? হঠাৎ কি হলো তোর?—আনন্দবাবু আকাশ থেকে পড়লেন—কুড়ি বছর চাকরি করে তুই হঠাৎ চলে যাবি মানে? তোর গিন্নীমা বকেছে বুঝি?

—কেউ বকেনি বাবু। আমি ভারী অন্যায় করেছি।—গোপাল ফোঁস ফোঁস করতে

লাগল সমানে।

—কী অন্যায় করেছিস?

—আমি—আমি—খগেনবাবুর পিঠে গুলি করে দিয়েছি বাবু। হঠাৎ বন্দুকটা দেখে-মাথাটা কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, ছেলেবেলায় অমন তাক ছেলো—একেবারেই ভুলে গিয়েছি নাকি? তারপর—তারপর কী যে করে ফ্যাললাম—

আনন্দবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন।

—তা হলে ওটা তোর কান্ড! যাক—চেপে যা। বেমালুম চেপে যা। কিছু অন্যায় করিসনি। খগেনের পিঠে তাক করার রাইট সকলেরই আছে। কোনো দোষ করিসনি তুই।

—কিন্তু গিন্নীমা যদি সন্দেহ করেন—

—কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজল। পিঠের ব্যথা ভোলবার জন্যে একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট একাই সাবাড় করল খগেন। তারপর বাগানে এসে বসল।

ওদিকে কাজকর্ম সেরে পিলটুর পিসিমা তাঁর জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে, ঝাউয়ের পাতায় শব্দ উঠছে শোঁ শোঁ। পিলটুর পিসিমার মনে পড়ল, ছোটবেলায় তাঁর দিনগুলো আসামে কেটেছে।

যে শহরে তাঁরা থাকতেন, সেখান থেকে দূরে বর্মা সীমান্তের নীল পাহাড়-গুলোকে দেখা যেত। মেঘ ঘনিয়ে আসত সেগুলোর উপর দিয়ে। গাছপালায় ভিজে হাওয়া মর্মর তুলত। কত ফুল ফুটত—আর কত প্রজাপতি! কী আনন্দে বনের ভিতর খেলা করে বেড়াতেন তিনি।

আর, কী দুরন্ত ছিলেন নিজেও!

তাঁর দাদার এয়ার গান ছিল একটা। তিনিও সুযোগ পেলেই দখল করতেন সেটা।

বেশ টিপও হয়ে গিয়েছিল হাতের। চড়ুই মেরেছেন, দেওয়াল থেকে টিকটিকি নামিয়ে এনেছেন কতবার! সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরেরও আগেকার কথা। এখনও কি সে হাতের টিপ তাঁর আছে?

ভাবতে ভাবতে একসময় পিলটুর বন্দুকটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন তিনি।

দাদার বন্দুকটা এত সুন্দর ছিল না। কিন্তু বড় ছিল এর চাইতে। পিলটুর পিসিমা বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলেন। ঠিক এইভাবেই গুলি ভরতে হত। সবই প্রায় এক রকম।

তারপর কী খেয়াল হতে বন্দুকে গুলি ভরে দেওয়ালের দিকে চাইলেন একবার।

না—একটা টিকটিকিও কোথাও নেই। হাতে তখনও বন্দুকটা রয়েছে।

বাবা কত ভালবাসতেন। বলতেন, ইয়োরোপের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যায়। সিংহ, হিপো, আরো কত কী শিকার করে। আমার মেয়েকেও বিদেশী মেয়েদের মতো গড়ে তুলব। বাঙালীর মেয়েরা কেবল ঘরের কোণে বসে থাকে—আমার কল্যাণী বাঙালী মেয়েদের অপবাদ দূর করে দেবে।

পিলটুর পিসিমা—অর্থাৎ কল্যাণীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কিছুই হলো না। কেবল আনন্দবাবুর ঘর-সংসার করেই তাঁর জীবনের এত-

www.boiRboi.blogspot.com

গুলো বছর কেটে গেল।

বন্দুকটা হাতে নেবার পর থেকেই ক্রমাগত হাতটা যেন তাঁর নিশপিশ করছে।

একটা কিছু করা চাই—যে কোনও একটা লক্ষ্যভেদ। দেওয়ালে টিকটিকি নেই—এত রাতে চড়ুই পাখিই বা তিনি পাবেন কোথায়? মনে পড়ল, একবার দাদার বন্দুকটা নিয়ে গাছে কী একটা পাখির দিকে তাক করছেন, হঠাৎ একটা মস্ত বড়ো গরু শিং নেড়ে ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে এসেছিল তাঁর দিকে। কল্যাণী ছোট হলেও তাঁর সাহস কম ছিল না। পাখি ছেড়ে গরুটার দুটো শিংয়ের ঠিক মাঝখানে খটাস করে গুলি করে বসলেন।

গরুটা থমকে দাঁড়াল। তারপরেই লেজ তুলে উলটো দিকে ভোঁ দৌড়!

কল্যাণীর চোখে যেন স্বপ্ন ঘনিয়ে এল।

বাগানের মধ্যে কে যেন বসে আছে। জ্যোৎস্নায় চওড়া পিঠটা দেখা যাচ্ছে তার। কল্যাণীর মনে হলো, ও সেই শিং-ওলা গরুটা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকেই গুলি করব? করি, করে দেখি না—কী হয়!

কল্যাণী বন্দুক তুললেন, নিশানা ঠিক করলেন।

তার একটু আগেই চাপাটি খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল খুবলাল সিংয়ের। সকালে যে ছাগলটাকে সে বাগানে বেঁধে রেখেছিল, সেটাকে ঘরে আনা হয়নি। যদি শেয়ালের পেটে যায়?

চটপট বাগানে চলে এল খুবলাল।

আর খুঁটি থেকে ছাগলটার দড়ি খুলে দিতে গিয়েই দেখল—জানলায় গিন্নীমা দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোতে যেন ফ্রেমের ভিতর একখানা ছবি। আর তাঁর হাতে বন্দুক।

কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়ে ও কী করছেন গিন্নীমা? আরে আরে—সোজা খগেন-বাবুর পিঠ বরাবর তাক করছেন যে!

খুবলাল চোখ কচলাল। স্বপ্ন দেখছে না তো সে?

—খটাস—

—বাবা গো, গেছি—

প্রাণপণে লাফ মারল খগেন। আর গিন্নীমা টুপ করে জানলার নীচে বসে পড়লেন!

পিলটুর পিসিমা সোজা এসে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। ততক্ষণে চটকা ভেঙেছে তাঁর।

ছিঃ ছিঃ—করেছেন কী তিনি! শেষকালে তিনিও কিনা খগেনের পিঠে—

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কে এসে যেন ঘা দিল তাঁর দরজায়।

কল্যাণী উঠে দরজা খুললেন। বাইরে আনন্দবাবু আর খুবলাল সিং দাঁড়িয়ে।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার কাশলেন আনন্দবাবু। তারপর বললেন—এই খুবলাল সিং বলছিল, ওর ভাইপো দুবলালকে যদি আমাদের হিন্দুর বাগানটায়—

কল্যাণী চটে উঠলেন।

—সেইজন্যে তুমি এত রাতে ওকে নিয়ে আমায় বিরক্ত করতে এলে? আমি তো বলেই দিয়েছি, ওসব লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না?

—তা না হয় না-ই চলল। কিন্তু এই খুবলাল বলছিল, তুমি নাকি একটু আগেই বন্দুক দিয়ে খগেনের পিঠে—

কল্যাণী মেঝেয় বসে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন। সামলে খাবি খেলেন বার কয়েক।

ভক্তিভাবে একটা সেলাম ঠুকল খুবলাল।

—তাই হামি বোলছি মাঈজী, দুবলালের নোকরিটা যদি মিলে যায়, তব হামি খুবলাল সিং কুছু দেখেনি, কুছু জানে না, কুছু বোলে না। নেহি তো—

কল্যাণী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—না-না, তুমি কিছু দেখোনি, কিছু জেনেও তোমার কাজ নেই। বাবুর যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে কালই তোমার ভাইপো হিন্দুর বাগানের কাজে বাহাল হয়ে যাবে।

—মাঈজীর বহুৎ দয়া!

আর একটা জোর সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল খুবলাল। আর বাইরে গিয়ে ছাগলটাকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে চলল নিজের ঘরের দিকে। এই ছাগলটাই তার লক্ষ্মী—এরই গুণে তার অকর্মার ঢিবি ভাইপোটার গতি হয়ে গেল!

সেই সময় গগনভেদী রোল তুলে গিন্নীর ঘরে এসে প্রবেশ করল খগেন।

—কাকীমা—আবার!

কল্যাণী ভুরু কুঁচকে বললেন—কী আবার?

—আমার পিঠে গুলি মেরেছে।

শুনে চটে চেঁচিয়ে উঠলেন এবার কল্যাণী।

—তোর মাথাই খারাপ হয়েছে খগেন। রাতদিন কে তোর পিঠে গুলি মারতে যাবে, শুনি?

—কে মেরেছে কেমন করে বলব? তবে একেবারে কমলানেবুর মতো ফুলে উঠেছে এবার।

আনন্দবাবু বললেন—বাত।

খগেন তারস্বরে বললে—না, বাত নয়।

—তবে আমবাত।

—আমবাতও নয়।

—ওহো, তা-ও বটে।—আনন্দবাবু মাথা নেড়ে বললেন—কমলানেবুর মতো ফুলে উঠেছে বলছ যখন, তখন ওটা বোধহয় নেবুবাত।

—না, নেবুবাতও নয়।—খগেনের আবার প্রবল প্রতিবাদ শোনা গেল।

—এজ্ঞে, বাত না হলে বাতিক। বাতের বাড়াবাড়ি হলেই বাতিক।—ইতিমধ্যে গোপাল এসে আসরে পোঁচেছিল, শেষ কথাটা সেই ঘোষণা করল।

—বাতিকই বটে!—পিলটুর পিসিমা এবার একমত হলেন গোপালের সঙ্গে।

খগেন এবার নিদারুণভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

—ও সব বাজে কথা বুঝি না। এ বাড়ি হচ্ছে স্রেফ মানুষ-মারা কল। এখানে আর আমি একদিনও থাকব না। আমার সমস্ত পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কালই আমি বদরিকা আশ্রমে কালীসাধনা করতে চলে যাব।

কল্যাণী ঝামটা দিয়ে বললেন—তাই কর গে যা। আমার হাড় জুড়োয়।

আনন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। নইলে কাঁকের পাগলা গারদেই পাঠাতে হবে তোমাকে।

—হুঁম!—

ঝাঁকড়া দাড়িগোঁফের ভিতর থেকে এক বিকট হুঙ্কার ছেড়ে দাপাতে দাপাতে চলে গেল খগেন।

পরদিন সকাল।

গেটের বাইরে নিজের মোটর সাইকেলটাকে ঠিক করছিল খগেন। এ-বাড়িতে আর সে থাকবে না। মুরগী, সন্দেশ, আপেল আর দুশো টাকা মাইনের আশাতেও নয়।

একটু দূরে বাগানের ভিতর পিলটুর বন্দুক হাতে আনন্দবাবু আর গোপালের প্রবেশ।

আনন্দবাবু গোপালকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই কদ্দুর থেকে মেরেছিলি খগেনকে?

—এজ্ঞে বাবু, বারো গজ হবে।

—আর তোর গিন্নীমা?

—এজ্ঞে, সাত-আট গজ হবে।

—শেম! ও তো টার্গেটে মারা নয়, পাহাড় শিকার করা। আচ্ছা, খগেন এখন কতদূরে আছে?

—অন্তত কুড়ি গজ হবে।

—তবে এই দ্যাখ—

খটাস করে বন্দুক ছুঁড়লেন আনন্দবাবু।

—বাপ্‌রে গেছি—

খগেন লাফিয়ে উঠল শূন্যে। তারপর মাটিতে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় লাফে চড়ে বসল মোটর সাইকেলে আর প্রাণপণে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

আনন্দবাবু বললেন—ভাবছিস হঠাৎ লাগল? তা নয়। তোদের সকলের চাইতে আমার হাতের টিপ যে কত ভালো, দ্যাখ আবার সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি।

আবার বন্দুক ছুঁড়লেন—খটাস।

—ওরেঃ বাবা!

এবার সীটের উপরেই দেড় হাত নেচে উঠল খগেন—আর তারপরেই ভট ভট আওয়াজ উঠল মোটর সাইকেলে। দেখতে দেখতে দাড়িগোঁফ আর সেই ধুসো-কোট সুদ্ধু খগেনকে নিয়ে মোটর সাইকেল নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে গেল।

আনন্দবাবু বললেন কালীসাধনা করতে চলে গেল।

গোপাল মাথা নেড়ে বললে—এজ্ঞে, হ্যাঁ। মায়ের ডাক কিনা—বড্ড তাড়া!

(একটি বিদেশী গল্পের প্রভাবে)

www.boiRboi.blogspot.com

রাঘবের জয়যাত্রা

॥ এক ॥

রামগর্জনবাবু দোকানে প্রথমে সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করলেন। তারপর চারদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মন্ত্র-তন্ত্র আউড়ে, নিজের ক্যাশবাক্সটির সামনে এসে ভাবুকের মতো বসে পড়লেন।

এখনও ভোর হয়নি। মফঃস্বল শহরের ইলেকট্রিক আলোগুলো সবে নিবতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গার দিকটায় আকাশে ফিকে লালচে রং। কাকেরা সবে বেরুতে আরম্ভ করেছে, রামগর্জনবাবুর টিনের চালে গোটাকতক শালিক পাখি ঘুম থেকে উঠেই ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে—ওই ওদের স্বভাব।

রামগর্জনের কর্মচারী বনোয়ারী একটা মস্ত গামলায় জিলিপির গোলা তৈরি করছে, ছট্টুলাল কচুরির ময়দা মাখছে। মস্ত মস্ত দুটো উনুন এখনও অল্প অল্প বেগুনে ধোঁয়া ছাড়ছে, একটু পরেই কয়লা গন্-গন্ করে উঠবে, কচুরি আর জিলিপি ভাজা আরম্ভ হয়ে যাবে। রসগোল্লা, লেডিকেনি, চমচম আর সন্দেশ কাল রাতেই তৈরি হয়ে রয়েছে। ছ-টা বাজতে না বাজতেই খদ্দেরের আনাগোনা শুরু হবে। সকাল সাড়ে ছ-টার ট্রেনে যে-সব যাত্রী নামবে তাদেরও অনেকেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে রামগর্জনের দোকানে এসে বসবে। তারপর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সমানে বেচা-কেনা।

রামগর্জনবাবুর 'জয়গুরু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' শহরের সব চেয়ে বড় মেঠাইয়ের দোকান। তাঁর মিঠাই লোকের আরো মিঠে লাগে তাঁর মধুর ব্যবহারে। বাপের আমলের ছোট ব্যবসাটিকে নিজের চেষ্টায় তিনি এত বড় করতে পেরেছেন, চমৎকার একটি দোতলা বাড়ি করেছেন। জমিজমা কিছু হয়েছে। তিনপুরুষ আগে তাঁরা উত্তর প্রদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। এখন আচার-ব্যবহার চাল-চলন আর কথাবার্তায় পুরো বাঙালী হয়ে গেছেন।

বাইরে থেকে দেখলে রামগর্জনের মতো সুখী আর কেউ নেই। নামে গর্জন থাকলে কি হয়—নেহাত গোবেচারি ভাল মানুষ তিনি। সবাই তাঁকে পছন্দ করে—তাঁর মিঠাইকেও। এমন কি তাঁর চমচমে কামড় বসিয়ে কেউ যদি জিভের ওপর ডেঁয়ো পিঁপড়ের কামড় খায়, সেও তাঁর ওপর রাগ করে না। অথচ—

অথচ রামগর্জনবাবুর মনে সুখ নেই। একবিন্দুও নয়। তার কারণ তাঁর ছেলে রঘু। যার ভালো নাম রাঘবলাল—রামগর্জন যাকে বলেন রাঘববোয়াল। একমাত্র ছেলে—একমাত্র সন্তান। তাকে নিয়েই তাঁর যত অশান্তি।

ছেলেটার চাল-চলন যে নেহাত খারাপ, তা নয়। বরং নিতান্তই গোবেচারা। এত বেশি গোবেচারা যে ক্লাসে পড়া জিজ্ঞেস করলে পর্যন্ত মুখ নিচু করে বসে থাকে।

এক-আধজন মাস্টার আছেন—তাঁরা কিছুতেই হাল ছাড়বার বান্দা নন। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন গোপেশবাবু। তিনি রঘুর নীরবতা ভাঙবার পণ করে বসলেন। বার-বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, এই রোঘো শিগ্‌গির বল্—বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রীর

নাম কী?

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।

রঘু এর আগে একমনে একটা গুবরে পোকা লক্ষ্য করছিল। সেটা মিনিট কয়েক পরে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে আর গুর্-র্-র্ করে আওয়াজ ছাড়ছে। কতক্ষণে ওটা উবুর হতে পারবে এবং তারপর জানালা দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে যাবে—রাঘবের সমস্ত মনোযোগটা সেদিকেই ছিল। এমন সময়ে বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী আচমকা তার ঘাড়ের ওপরে পড়ে সব গোলমাল করে দিলে।

এর মধ্যে গোপেশবাবু অক্লান্তভাবে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন এবং স্থির লক্ষ্যে এগোচ্ছেন লাস্ট বেঞ্চের দিকে। এবং তাঁর হাতে যে ছড়িটি আছে, তারও হাবভাব অত্যন্ত সন্দেহজনক।

অগত্যা রঘুকে উঠে দাঁড়াতে হলো।

শিগ্‌গির বল্, বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী? গুবরে পোকার আশা ছেড়ে দিয়ে রঘু ফস করে বলে ফেলল: রাঘবলাল সিং।

ক্লাসে হাসির বোমা ফাটল, কিন্তু গোপেশবাবু হাসতে পারলেন না; তাঁর মুখের চেহারা দেখে একবার সন্দেহ হলো, এক্ষুনি বুঝি কেঁদে ফেলবেন; কিন্তু তাও করলেন না, যেখানে ছিলেন সেইখানেই জমে রইলেন কিছুক্ষণ, হাত থেকে বেতটা পাশের ছেলেটার নাকের ওপর খটাস করে খসে পড়ল। সে কাঁউকাঁউ করে উঠতে গোপেশবাবু তাকে দুটো থাবড়া মেরে বসিয়ে দিলেন, তারপর করজোড়ে রঘুকে বললেন, আপনি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সে তো জানতুম না স্যার! না জেনে কত বেয়াদবি করে ফেলেছি। নিজগুণে মার্জনা করবেন! সেই থেকে রঘু বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

আর মুখ্যমন্ত্রীকে পেলে কেউ কি ছাড়তে চায়, স্কুলও তাকে ছাড়েনি। পরপর দু-বছর ক্লাস এইটেই রেখে দিয়েছে। ক্লাস টেন-এর ছেলেরা একবার টেবিলের ওপর তাকে বসিয়ে তার গলায় এক ছড়া মালা পরিয়েছিল, মানপত্রও দিয়েছিল একখানা। মানপত্রে একটা কাঁচকলা আঁকা ছিল আর মালার ভেতরে ছিল গোটা কয়েক বিছুটির পাতা—সেটা অবশ্য রঘু টের পেয়েছিল একটু পরেই।

তা এ-সবের জন্য রামগর্জনবাবুর মন খারাপ হয় না। ছেলেটা একটু সাদাসিধে, পড়াশোনাতে মাথা নেই—কিন্তু তাতে আসে যায় না কিছু। তাঁর মস্ত কারবার, বিশ্বাসী কর্মচারীও আছে—দুদিন সকালে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে চালাক-চতুর হয়ে উঠবে। গোলমালটা সেখানে নয়। চলতি কথায় আছে, 'ময়রা সন্দেশ খায় না'। ময়রা হয়ত খায় না, কিন্তু তাঁর ছেলে খায় কিনা, প্রবাদে এ-কথা বলা হয়নি। রঘু সন্দেশ খেয়ে থাকে। এবং প্রচুর পরিমাণে।

রামগর্জন কৃপণ নয়। মিঠাই মণ্ডা-দই ক্ষীর রঘু যথেষ্ট খেতে পায়। কিন্তু তার কিছুতেই তৃপ্তি নেই। এক সের রসগোল্লা খেয়ে সে আর-এক সের খাবার জন্যে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। একেই বলে আসলে 'গোল্লায় যাওয়া'; শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প না পড়েও রামগর্জনবাবু সে কথা বুঝতে পারেন। কিন্তু এ কথাই বুঝতে পারেন না যে অতটুকু পেটে অত খাবার সে রাখে কোথায়!

আরে—দোকানের খাবার যদি সব তুই-ই খাবি তা হলে ব্যবসা করবি কী করে? সব যদি তোরই পেটে যায়—খদ্দেররা কি কেবল শালপাতার ঠোঙা নিয়ে তোকে পয়সা দিয়ে যাবে? একটু রয়ে-সয়ে খা না বাপু! জীবনভোরই তো খেতে পাবি তাহলে! এ-সব কথা রঘুকে বুঝিয়েছেন তিনি অনেকবার। রঘুও বুঝেছে। মাথা নেড়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। ভাব দেখে মনে হয়েছে যে এরপর থেকে সে প্রত্যেকদিনই একাদশী করতে থাকবে। তারপরেই হয়তো রামগর্জন কোন কাজে একটু উঠে গেছেন,

www.boiRboi.blogspot.com

আর তাঁর দোকানের কর্মচারীরাও একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, সেই ফাঁকে—বিশেষ কিছু করেনি রঘু—ডজনখানেক চমচম কিংবা গোটা ষোলো পান্তুয়া দেখতে দেখতে সাবাড় করে বসেছে।

একমাত্র ছেলের গায়ে হাত তুলতে মায়া হয় রামগর্জনের। তবু কান শক্ত করে ধরে কড়া মোচড় লাগিয়েছেন একটা।

—এতক্ষণ ধরে কি বোঝালুম—অ্যাঁ! গন্ডার কাঁহাকা—হতচ্ছাড়া পেটুক দাস।

—কী করবো বড্ডো খিদে পেয়েছিল যে!

—খিদে! তোর হয়েছে সেই গাঁয়ের গো-বকের দশা!—বাপের মুখ থেকে শোনা একটা হিন্দি বচন আওড়ান রামগর্জন 'যেৎনা খায়—ওৎনা লালায়!' বলি পেটে কি আছে? জালা না সিন্দুক?

রঘু জবাব দেয় না, ক্লাসে পড়া জিজ্ঞেস করলে যেমন, তেমনি পরমহংস হয়েই বসে থাকে।

—এরপরে তুই আমাকে খাবি, বুঝেছিস? তুই তো রাঘব নোস—রাঘব বোয়াল! আমাকে খেয়েই তোর লালচ শান্ত হবে।

রঘু একবার বাপের দিকে তাকিয়ে দেখে। খুব সম্ভব ভাবে, তার বাবা যদি একটা প্রকাণ্ড পান্তুয়া হতো, তা হলে এ অনুরোধ করবার একেবারেই দরকার হতো না। অনেক আগেই সে—

রামগর্জনবাবু কপাল থাবড়ে বললেন, বরাত, বরাত! নইলে এমন পেটুক এসেও মিঠাইওলার ঘরে জন্মায়!

আজও রামগর্জন দোকানে বসে নিজের দুঃখের কথাই চিন্তা করছিলেন। ছেলেটার এই খাই-খাই রোগ কী করে বন্ধ করা যায়? আর চুরি করে খাওয়া? ছানার সঙ্গে খানিকটা বাঘা ওল মিশিয়ে সন্দেশ খাইয়ে দেখবেন নাকি? উহুঁ, ওতে সুবিধে হবে না। যে রাক্ষস—বাঘা ওল-টোল সব হয়তো অম্লান মুখে হজম করে বসবে। আর তা না হলে ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হবে এবং তাঁকেই ছুটতে হবে।

একটু একটু করে সকাল হলো। রাশি রাশি গরম গরম জিলিপি পড়ল রসের ভিতর, জমল কচুরি আর নিমকির স্তূপ। রোদে চড়ল। দোকানে খদ্দেরের ভিড় শুরু হয়ে গেল।

মনটা শান্ত করে রামগর্জন পয়সা গুণতে আরম্ভ করলেন। আপাততঃ ছেলের চিন্তাটা ধামাচাপা পড়ল।

এমন সময় ভঁক্ ভঁক্ করে একখানা মোটর গাড়ি এসে থামলো তাঁর দোকানের সামনে। নেমে এলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান গৌরহরিবাবু। গায়ে গরদের পাঞ্জাবি—গলায় সিল্কের চাদর। একখানা ঝানদার লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দোকানে এসে ঢুকলেন।

রামগর্জন দাঁড়িয়ে উঠলেন: আসুন স্যার আসুন! বসুন।

গৌরহরি বললেন, বসবার সময় নেই। আমার মেয়ে জামাই এসেছে সাড়ে ছ-টার ট্রেনে, গাড়িতে বসে আছে তারা। তোমাকে যে আড়াই সের স্পেশ্যাল ছানার জিলিপি তৈরি করতে বলেছিলুম, সেটা—

—হ্যাঁ স্যার কাল রাতেই রেডি করে রেখেছি। দিচ্ছি এখুনি।

স্পেশ্যাল অর্ডারের আলমারিটা খুললেন রামগর্জন!

এর চাবি তাঁর ঘুনসিতেই থাকে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু খুলে যা দেখলেন—তাতে তাঁরই চোখ ছানাবড়া নয়, একেবারে ছানার জিলিপি হয়ে গেল।

অত বড় হাঁড়িটা প্রায় সাফ। তলায় খানতিনেক পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষের মতো!

—কী হল হে?

তিনটে খাবি খেয়ে রামগর্জন বললেন, আপনি যান স্যার একটু পরেই আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌরহরি চলে গেলেন। আর সেইখানে কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রামগর্জন। ব্যাপারটা চক্ষের নিমেষে বুঝতে পেরেছেন। কাল রাত্রে যখন ঘুমিয়েছেন, তখন তাঁর কোমর থেকে চাবি খুলে এনে বন্ধ দোকানের ভেতরে বসে নিঃশব্দে ওগুলো সাবাড় করেছে রঘু। রাতের বেলা ছানার জিলিপির পাশে সে অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরঘুর করছিল বটে।

অনেক হয়েছে—আর নয়। আর ছেলেকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এইবার একটা এস্‌পার—ওস্‌পার হয়ে যাবে।

দোকানের পেছনেই বাড়ি। এক লাফে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। কুড়িয়ে নিলেন একটা বাঁশের লাঠি। এতদিন পরে সত্যিকারের রাম গর্জন ছাড়লেন একখানা।

—কোথায় রঘুয়া? কোথায় সেই রাক্ষস—সে রাঘব বোয়াল? আমি আজ ওকে খুন করবো—জরুর উস্‌কো জান লে লেগা!

রামগর্জনের স্ত্রী ছুটে এলেন। ক্যা হুয়া-ক্যা হুয়া?

—হুয়া আমার মাথামুণ্ডু! আজ তোমার ছেলের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে না দিই তো আমি রামগর্জন সিং-ই না। কোথায় সেই বদমাস—বেল্লিক পেটুক দাস।

গৌরহরিবাবুর মোটর দোকানের সামনে থামতে দেখেই দু' একটা কিল-থাপ্পড়ের জন্যে তৈরি হচ্ছিল রাঘবলাল। কিন্তু বাপের এই রুদ্রমূর্তি সে কল্পনাও করেনি। অতএব বাপের লাঠি ঘাড়ে পড়বার আগেই 'যঃ পলায়তে সঃ জীবতি!' তড়াক করে সে বড় রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো, তারপর টেনে দৌড়।

—কাঁহা ভাগবি? আজ তোমার মুণ্ডু ছাতু করে তবে আমি—বলে রামগর্জন ছেলেকে তাড়া করলেন। প্রায় ধরেই ফেলেছেন এবং লাঠির একটা ঘা বসিয়ে দিতে যাচ্ছেন ছেলের পিঠে—এমন সময় কোত্থেকে দুটো ষাঁড় গুঁতোগুঁতি করতে করতে দুজনের মাঝখানে এসে পড়ল। রামগর্জন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর—

আর এক জোড়া যুযুৎসু ষাঁড়ের ভেতর দিয়ে অসহায় ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, রঘুর মাথার টিকিটি বাতাসে নাচতে নাচতে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল তাঁর লাঠির আওতার বাইরে—অনেক দূরে।

॥ দুই ॥

ইস্, কয়েকটা ছানার জিলিপির লোভে শেষ পর্যন্ত কী ল্যাঠাতেই পড়া গেল। বাবা যে এমন খেপে যাবে সে-কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল রঘু!

চিরকালই সে আদুরে ছেলে। চড়-চাপড় কখনো-সখনো দুটো চারটে না খেয়েছে তা নয়, মিঠাই খেয়েছে অনেক বেশি। ছানার জিলিপি খাওয়ার সময় জানত দু-এক ঘা পিঠে পড়বেই, আর পিঠে এক-আধটু না সইলে পেটের তোয়াজই বা করা যায় কী করে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাঠি! আর ওই রকম গাঁটেগাঁটে পাকানো রাম-লাঠি! ওর

এক এক ঘা জুত-মতো পড়লেই আর দেখতে হবে না,—রঘু স্রেফ ছাতু—না না, হালুয়া হয়ে যাবে! হালুয়া খেতে ভালোই কিন্তু হালুয়া হওয়া যে মোটেই ভালো নয়, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি রঘুর আছে।

না হয় খেয়েইছে ডজন-দুই ছানার জিলিপি। পরের তো নয়, বাপের দোকানেরই তো জিনিস। তারই জন্যে তার এত লাঞ্ছনা? বাপ রামগর্জনের এমনি রামগর্জন? আর এই পিলে চমকানো পেল্লায় কোঁৎকা নিয়ে তাড়া করা? তার গোলগাল ভালোমানুষ চেহারার বাপের প্রাণ যে এমন পাষাণের মতো কঠিন—সে কথা কে কবে চিন্তা করেছিল!

কিন্তু আপাততঃ রঘুকেই চিন্তা করতে হচ্ছে। আর সেটা চলছে স্টেশনের সাইডিঙে একটা মালগাড়ির তলায় ঘাপটি মেরে বসে। বাপের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য আপাততঃ এ ছাড়া ভালো জায়গা আর সে খুঁজে পায়নি।

সেই পালিয়ে এসেছে সকালবেলা, এখন রোদ হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিকে। এর মধ্যে বার-পাঁচেক খাওয়া হয়ে যায়, কিন্তু রঘুর মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি। একে পেটুক মানুষ, তায় দারুণ খিদে পেয়েছে—পেটের নাড়িগুলো ত্রাহি-ত্রাহি করে ডাক ছাড়ছে। কিন্তু রঘুর বেরুবার সাহস নেই। স্টেশনের সবাই তাকে চেনে, এতক্ষণে তার খোঁজও পড়েছে নিশ্চয়। বেরুলেই কেউ না কেউ ক্যাঁক করে গলাটা প্যাকড়ে বাপের কাছে নিয়ে যাবে তাকে। আর তারপর—তারপর—সেই লাঠি! রামলাঠি!

না, রঘু যাবে না। তারও মনে দারুণ ধিক্কার এসে গেছে। ছি-ছি কয়েকটা ছানার জিলিপির জন্যে কেন এত লাঞ্ছনা! ভাই নেই, বোন নেই—একমাত্র ছেলে সে, তার সঙ্গে এমন নৃশংস ব্যবহার! বেশ, সেও আর বাড়ি ফিরবে না। কলকাতায় চলে যাবে, সেখানে রোজগার করবে, তারপর সেও একটা মিঠাইয়ের দোকান দেবে। যত ইচ্ছে খাবে, যা খুশি বিক্রি করবে। তখন হায় হায় করতে থাকবেন রামগর্জন, বুঝবেন রাঘবলালও নেহাত তুচ্ছ করবার ছেলে নয়।

রঘু সেই মালগাড়ির তলায় বসে সারা দুপুর এইসব কঠিন প্রতিজ্ঞা করছিল আর দেখছিল একটু দূরে পাথরের ভেতর থেকে ড্যাব্‌ডেবে চোখ মেলে একটা কটকটে ব্যাঙ তারই দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকটা ঢিল মেরে ব্যাঙটাকে তাড়িয়ে দিয়ে রঘুর মনটা শান্ত হলো। তারপর গাড়ির তলায় ঠাণ্ডা ছায়ায় বেশ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এলোমেলো ভাবনায় দুপুর গড়িয়ে গেল, সামনে দিয়ে কুলি আর পয়েন্টস্‌-ম্যানরা আসা-যাওয়া করল, ঝমঝম করে অনেকগুলি ট্রেন এল আর গেল! তারপরেই দেখা দিল প্রচণ্ড খিদে।

কলকাতায় যাওয়ার প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেকে না; মা'র কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ধোঁয়ানো গরম ভাতের ওপর খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ, ঘন অড়হড়ের ডাল, ভাজা-ভুজি, আলুর দম, চাটনি, ক্ষীরের বাটি—তার সঙ্গে চারটি টাটকা মিষ্টি। বুকের ভেতর আঁকুপাঁকু করে, পেটটা চোঁ চোঁ করতে থাকে। রঘু ভাবে, বাবার রাগ নিশ্চয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মা বসে বসে তার জন্যে চোখের জল ফেলছেন। বেরুবে? দেখবে নাকি একটুখানি এগিয়ে?

কিন্তু—বাবার হাতের সেই লাঠি! সেই বাঘা হুঙ্কার! সে যাত্রা নয় ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্যে প্রাণ বেঁচেছে, কিন্তু এবার যদি বাবা টিকিটা একবার চেপে ধরতে পারে—

ভাবতেই প্রাণ শুকিয়ে এল।

এদিকে কী খিদেই যে পেয়েছে! সেই কটকটে ব্যাঙটাকে ধরতে পারলেও চিবিয়ে

খায় এমন মনের অবস্থা! আর তো সহ্য করা যায় না!

বাইরে রোদ লাল হয়ে এসেছে—রঘুর চোখের সামনে সার বাঁধা রেল লাইনের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা ছায়া নামছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। তারপর—রাত আটটার সময় কলকাতা যাওয়ার গাড়িটা এলে টুক করে বেরিয়ে রঘু চেপে বসবে তাতে। কিংবা রঘু ভাবতে লাগল, সেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গুটিগুটি পায়ে বাড়ির দিকেও এগোনো যেতে পারে। খিড়কির দরজা দিয়ে যদি একবার ভেতরে ঢোকা যায়, একবার যদি মা-র আঁচলের তলায় আশ্রয় নেওয়া যায়,—তা হলে—

কিন্তু তারও তো দেরী আছে। এতক্ষণ থাকা যায় কী করে? রঘু কি এই মারাত্মক খিদেতেই মারা পড়বে নাকি শেষপর্যন্ত।

যা হওয়ার হোক—বাড়ির দিকেই যাই—এমনি একটা প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল রঘু। ঠিক সেই সময়—

যে মালগাড়ির তলায় সে শুয়েছিল, তার থেকে হাত চারেক দূরে দুটো লম্বা কালো পা দেখা গেল। একবারের জন্যে রঘুর বুক ধড়-ফড় করে উঠল। বাবা নাকি? খোঁজ পেয়ে ধরতে এসেছে তাকে? পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে সটকান দিতে যাবে, এমন সময় পায়ের মালিক ঝুপ্‌ করে সেখানে বসে পড়ল। আর বেশ দরাজ গলায় গান ধরলে:

আরে ভজো ভেইয়া কৌশল্যানন্দনকো
ভজো সিয়া রামকো—

না—বাবা নয়। লোকটাকে রঘু চেনে। এই স্টেশনেরই বুড়ো কুলি চম্পাতিয়া।

চম্পাতিয়া তাকে দেখতে পায়নি বলেই মনে হল। মালগাড়ির তলায় কালো ছায়ার ভেতর লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল রাঘবলাল। তার আরো মনে পড়লো চম্পাতিয়া ডান চোখে দেখতে পায় না। দিনের আলোতেই হাত চার-পাঁচের বেশি তার নজরে আসে না। সুতরাং রঘুকে সে যে দেখতে পাবে এমন সম্ভাবনা বিশেষ নেই।

আরে ভজো ভেইয়া রাবণসূদন,
ভজো রঘু রাইকো—

রঘু রাইকে ভজন না-হয় করুক, কিন্তু এখানে বসে-বসে কী করছে চম্পাতিয়া? এতক্ষণে সব দেখতে পেল রঘু। তাকেই ভজন করুক আর শ্রীরামচন্দ্রজীকেই করুক, সামনে যা করছে তা ভোজনের আয়োজন। একটা পেতলের থালায় ছাতু ঢেলেছে, লোটা থেকে জল দিয়ে পাকাচ্ছে মস্ত এক গোলা। কাঁচা লঙ্কা আছে, লবণ আছে, দুটো বড়-বড় কলাও রেখেছে পাশে।

ছাতু অবশ্য রাঘবলালকে বিশেষ খেতে হয় না, কিন্তু চম্পাতিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তার জিভে জল এসে গেল! ইস্‌! ও থেকে একটুখানি ছাতু যদি সে পেত। পেটের ভেতরে আগুন জ্বলছে, আর মাত্র হাত-কয়েক দূরেই এমন জবরদস্ত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন! কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতুর গন্ধও এত মিষ্টি লাগে।

একটা দম্‌কা হাওয়া এল সেই সময়। বোধহয় ভগবানই পাঠালেন।

—আরে হাঁ—হাঁ—হাঁ—

চম্পাতিয়া চেপে ধরবার আগেই তার কাঁধের গামছাটা হাওয়ায় হাত-দশেক উড়ে গেল। আর চম্পাতিয়া ছুটল সেই পলাতক গামছার সন্ধানে। 'নাউ অর নেভার'—ক্লাস এইটে তিন বছর আটকে থাকা রঘুর এই ইংরেজি বচনটা জানা। সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে গেল থালাটার দিকে, মালগাড়ির তলা থেকে হাত বাড়ালো তারপর সেই আধসের ছাতুর তাল পেতলের থালাটা থেকে অদৃশ্য হল। বিলীন হল চোখের

www.boiRboi.blogspot.com

পলকেই।

গামছা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এসেই মুখ হাঁ হলো চম্পাতিয়ার।

—আরে ই ক্যা হো? ছাতুয়া কিধর গৈল বাবু? কুত্তা লে গৈল ক্যা?

কিন্তু কাছাকাছি কোন কুকুরের চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর চোখের দৃষ্টি কম বলেই চম্পাতিয়া দেখতে পেল না, রাঘবলাল ততক্ষণে সেই ছাতুর তাল নিয়ে পেছনের একটা মালগাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

—রাম রাম! ইয়ে তো জিন মালুম হোতা। ব্যস্—চম্পাতিয়া আর দাঁড়ালো না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালো স্টেশনের দিকে।

আর তখন আধখোলা বিচালিতে অর্ধেক বোঝাই একটা মালগাড়িতে চেপে বসেছে রাঘবলাল। আর বিচালির মধ্যে লুকিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে ছাতুর তালটা সে সাবাড় করছে!

যাক—এতক্ষণে পেটটা একটু ঠাণ্ডা হলো।

পেট কেবল ঠাণ্ডাই হলো না, পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠলো। রঘু আর বসতে পারলো না—বিচালির মধ্যেই দিব্যি আরাম করে শুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ।

আবার যখন ঘুম ভাঙল—

মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে। হু-হু করে হাওয়া লাগছে গায়ে, কালো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটা ছুটন্ত ট্রেনের খোলা গাড়িতে সে কাত হয়ে শুয়ে আছে। দু-পাশে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে অন্ধকার বন জঙ্গল, মাথার ওপর রাশি রাশি তারার দিকে এঞ্জিনটা মুঠো-মুঠো আগুনের ফুল্‌কি ছুঁড়ে দিচ্ছে, ঝড়াং ঝড়াং করে বিকট আওয়াজ উঠছে ট্রেনের লোহা-লক্কড়ে আর—

আর কে যেন একটা কড়কড়ে লম্বা জিভ দিয়ে এক মনে তার পিঠটা চেটে চলেছে।

॥ তিন ॥

আতঙ্কে হাউ-মাউ করে উঠল রাঘব। কালো অন্ধকারে ছিটকে চলেছে বন-জঙ্গল, হাওয়ায় উড়ছে অসংখ্য আগুনের ফুল্‌কি, শব্দ হচ্ছে ঝড়াং ঝড়াং ঝনাৎ ঝনাৎ। এ যেন ট্রেনের আওয়াজ! রঘু কি তবে রেলগাড়িতে বসে আছে নাকি? আর বসে আছে একটা খোলা কামরায়—বাতাস তাকে যখন খুশি উড়িয়ে নিতে পারে?

এ কী সর্বনাশ! রাঘব কি স্বপ্ন দেখছে নাকি?

কোথায় তাদের বাড়ি—দোতলার ঘরের নরম বিছানাটি! মা যে পরিপাটি করে মশারি গুঁজে দেন, কোন কোন দিন মাথায় হাত দিয়ে ঘুম পাড়ান, গরম লাগলে পাখার বাতাস করেন। তার বদলে এ কী কাণ্ড! জিন-পরীর খেল্ নাকি? তখন সব মনে পড়ল। সেই কালান্তক ছানার জিলিপি, রামগর্জনের হাতের সেই রাম-লাঠি, মালগাড়ির তলায় লুকিয়ে থাকা, চম্পাতিয়ার ছাতুর তাল লোপাট করা। আর তারপর—ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ফাঁকে মালগাড়িটা টেনে নিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে? কাশী—কনৌজ—এলাহাবাদ—কলকাতা যেখানে খুশি চলে যেতে পারে এ গাড়ি। তখন কী করবে রাঘব? বাবা নেই, মা নেই, বাবার দোকানের মেঠাই নেই—একেবারে যে বেঘোরে মারা যাবে রাঘবলাল!

www.boiRboi.blogspot.com

আমায় মাপ করো বাবা, আর কোনদিন আমি চুরি করে খাব না—রঘু ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল। আর ঠিক তখন তার কানের কাছে ভোঁস ভোঁস করে কে যেন গরম গরম নিঃশ্বাস ফেলল—আর লম্বা একটা খরখরে জিভ দিয়ে চকাৎ চকাৎ করে ঘাড়ের উপর চেটে দিলে।

—ওরে বাবা! পেত্নিতে চেটে চেটে রক্ত খাচ্ছে নাকি? রাঘবলাল চেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো আর সেই সময় ট্রেন ঝড়াং ঝাং করে একটা বাঁক নিতেই আবার উল্টে পড়ল সেই গাদা-করা খড়ের ভেতর।

আর পড়েই দেখতে পেলে—

পেত্নি নয়—আট-দশটা গোরু। এতক্ষণে রাঘবলাল বুঝল, নেহাত একটা গোরুর মতোই সে গোরুদের গাড়িতে উঠে পড়েছে—এই বিচালিগুলো তাদেরই খাদ্য। আর বিচালির মধ্যে রাঘবলাল আবিষ্কার করে অপত্য স্নেহে তারা তার গা চেটে দিচ্ছে।

হায় ভগবান, এ কী ল্যাঠা!

রাঘবলাল একটু সরে বসল। বেশিদূর সরতে ভরসা হয় না—তা হলে সোজা গাড়ি থেকে একেবারে চাকার তলায়। তার ওপর যা হাওয়া! আশ্বিনের রাত—দস্তুরমতো শীত করছে তার। গায়ে একটা গেঞ্জি ছাড়া কিছুই নেই। রাঘব কোঁচার খুঁট জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল বিচালির ভেতর।

কিন্তু পৃথিবীর সব জিনিসকে ঠেকানো যায়—একমাত্র গোরুকে ছাড়া। গোরুরা যে কী ভয়ানক দুরন্ত আর দুর্ধর্ষ হতে পারে, রাঘব তা আগেও অনেকবার দেখেছে। একবার বাজারে ঢুকে পড়েছে তো এক খাবলায় এক ঝুড়ি লাউডগা মুখে তুলে নেবে, দোকানে গলা বাড়িয়ে চালে ডালে যাতেই মুখ দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সের-তিনেক সাফ! যতই লাঠি-পেটা করো, চোখ বুজে ঠায় চিবুতে থাকবে—যেন বিয়েবাড়ির ভোজ পেয়ে পরম আরামে নেমন্তন্ন খাচ্ছে। আর যখন শিং নেড়ে তাড়া করে আসে তখন তো কথাই নেই—কাউকে না কাউকে গুঁতিয়ে তবে তার গোঁ থামবে। এই গোঁয়ের জন্যেই বোধহয় গোরুকে গো বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং রাঘবও পালাতে পারল না।

একটা বড়-বড় শিংওলা গোরু সমানে তার কান চাটতে লাগল। রাঘব দু-এক-বার ভাঙা গলায় বললে, হেই-হেই। জোরে বলতে সাহস হল না পাছে এক গুঁতোয় তাকে সোজা গাড়ির তলায় ফেলে দেয়।

অবশ্য তাকে গুঁতোবার রাইট গোরুদের আছে—ষোল আনাই আছে। কারণ মানুষের রিজার্ভ কামরার মতো এ গাড়িও গোরুদের রিজার্ভ করা। রাঘবলাল নিতান্তই অনধিকার প্রবেশ করেছে এখানে। তারা যদি হটো—হটো—রিজার্ভ হ্যায়, দুসরা ডিব্বামে চল যাও'—বলে চাঁদা করে তাকে গুঁতিয়ে দেয়, তা হলে সে তো আর কোথাও নেই! তার ওপর রাঘবলাল স্রেফ বিনা টিকিটের যাত্রী। সুতরাং গোরুকে কর্ণগোচর করে, অর্থাৎ কর্ণে গোরুকে চরতে দিয়ে সে ঝিম মেরে বসে রইল।

কিন্তু এ গাড়ি কি আর থামবে না? সেই যে তখন থেকে? সেই যে তখন থেকে চলছে—সে চলার যেন আর বিরাম নেই। অন্ধকার ছুটছে, গাছপালা ছুটছে, আগুনের ফুলকির ঝড় উঠছে, গুমগুম করে পেরিয়ে যাচ্ছে রেলের পুল, দু-একটা ছোট-ছোট আলো দেখা দিয়েই ঘুরপাক খেয়ে কোথাও মিলিয়ে যাচ্ছে। পর-পর তিন-চারটি স্টেশন চলেও গেল—কিন্তু মালগাড়ি একটানা ছুটছেই আর ছুটছেই। তার থামবার কোন লক্ষণ নেই—কোথাও যে আদৌ থামবে এমনও মনে হচ্ছে না।

যদি না থামে? যদি একটানা চলতে চলতে দিল্লী-আগ্রা-মোরাদাবাদ-বোম্বাই

সব পেরিয়ে যেখানে খুশি চলে যায়? তা হ'লে? তাহলে কেমন করে দেশে ফিরবে রাঘবলাল? বাবার দোকানের রসগোল্লা—চমচম—বোঁদে—জিলিপি—সন্দেশ—মনোহরা—খাস্তা কচুরি—গরম সিঙারা—মতিচুর সে কি আর খেতে পাবে কোনদিন? আর কি কোন আশা আছে?

রাঘবলাল অঝোরে কাঁদতে লাগলো :

বাবা, তোমার কাছে মাফ চাইছি। তুমি এসে এখান থেকে আমায় নিয়ে যাও। যত খুশি লাঠিপেটা কর, আমার কোন আপত্তি নেই। এই গোরুদের গাড়ি থেকে—এই চলতি ট্রেন থেকে আমায় উদ্ধার করো।

এদিকে গোরুর জিভ ঘাড় থেকে গলায় নামল। প্রথম-প্রথম যত বিশ্রী বোধ হচ্ছিল এখন আর তেমন লাগছে না। বরং বেশ একটুখানি আমেজ হচ্ছে তার। কাঁদতে কাঁদতেই কখন তার চোখ বুজে এল, তারপর এক ফাঁকে বিচালির গাদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখল, ট্রেন থেমেছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে, পাশে বন-জঙ্গলের মাথার ওপর রোদের লাল আভা একটুখানি লেগেছে কেবল। রেল-লাইনের দু-ধারে গাছপালার ওপর পাখিরা কিচির-মিচির করছে।

রাঘব তাকিয়ে দেখল, স্টেশন নেই। বুঝল, সিগন্যাল ডাউন হয়নি, গাড়ি কোন স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাঘবের মনে হলো এই সব চাইতে ভাল সুযোগ। স্টেশনে নামলেই তো টিকেট চাইবে, গোরুদের রিজার্ভ গাড়িতে চেপে এসেছে বলে ডবল ভাড়াই চাইবে কিনা কে জানে? তার চাইতে এই বেলাই সোজা চম্পট দেওয়া ভাল। যা ভাবা সেই কাজ। চারদিকে বেশ করে দেখে নিয়ে সে টুপ্ করে একটা লাফ দিয়ে নিচে পড়ল। নুড়িগুলোতে একটু চোট লাগল বটে, কিন্তু সেটা এমন কিছু বেশি নয়। তারপরেই টেনে দৌড়। চোখের পলকে তারের বেড়া টপ্‌কে একেবারে রেল লাইনের বিপজ্জনক সীমানার বাইরে।

গাড়ি থেকে একটা গোরু ডাকল: 'হাম্বা!' যেন বললে, কোথা যাস বাবা, ফিরে আয়।

কিন্তু রাঘব আর ফিরল না। চক্ষের পলকে কাঁটাগাছের ঝোপ, রেলের শুকনো নয়নাজুলি, টেলিগ্রাফের পোস্ট—সব পার হয়ে একটা পায়ে চলা সরু পথ ধরে সে ছুটতে লাগলো। গাড়ির এঞ্জিনের ভোঁ শুনল, একবার দেখল ট্রেনটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, দু-তিনটে গোরু যেন কান তুলে এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। থাকুক তাকিয়ে—রাঘব আর ওদের গ্রাহ্য করে না।

রাঘব ছুটল—প্রায় মাইলখানেক দমবন্ধ করে ছুটল। তারপর থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়।

এ সে কোথায় এল!

গ্রাম নেই—মানুষজনের চিহ্ন নেই—এ যে অথৈ জঙ্গল! দু' ধারে সারি-সারি ঝাঁকড়া গাছ, প্রথম ভোরের আলো এখনো ঢুকতে পারেনি তাদের ভেতরে। পায়ে-চলা পথটা ভিজে ভিজে মাটির ভেতর মুছে গেছে, চারদিকে থম্‌থমে ছায়া। শুধু মাথার ওপরে অসংখ্য পাখির চিৎকার। এ কোথায় এল রাঘব! এখানে যে তাকে বাঘে-ভাল্লুকে ধরে খাবে!

এর চাইতে যে রেলগাড়িও ভাল ছিল!

যে-পথ দিয়ে এসেছে, ভাবল সে পথেই ফিরে যায়। কিন্তু কোথায় পথ? চার-

দিকেই যে ঘন কালো জঙ্গল!

এখন—এখন কী হবে?

রাঘবলাল আবার ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

—তু কোন্ হো?

নিদারুণ চম্‌কে রাঘব একটা লাফ মারল।

আর সেই সময় কার একটা লোহার থাবার মতো হাত শক্ত করে কাঁধটা চেপে ধরল তার।

আর একবার হাঁড়িচাচার গলার মতো কর্কশ আওয়াজ তুলে কে জিজ্ঞেস করলে, আরে রোতা কেঁউ (কাঁদছিস কেন?) তু কোন হো? (তুই কে?)

রাঘব তাকিয়ে দেখল, মানুষই বটে, কিন্তু কী রকম মানুষ! প্রকাণ্ড মাথায় আরো প্রকাণ্ড পাগড়ি, কান পর্যন্ত মোটা গোঁফ—দুটো লাল টকটকে বিকট চোখ মেলে ঠিক বাঘের মতোই তাকিয়ে আছে তার দিকে।

॥ চার ॥

দারুণ ভয়ে রঘু মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, সেই ভয়ঙ্কর লোকটা লোহার মতো শক্ত হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে বললে, এই, খাড়া রহো!

খাড়া দাঁড়িয়ে থাকার জো রঘুর ছিল না। মনে হচ্ছিল তার পা দুটো স্রেফ শোলার মতো হালকা হয়ে হাওয়ায় ভাসছে। আসলে রঘু হাওয়াতেই ভাসছিল। সেই ভয়ঙ্কর লোকটা তাকে মাটি থেকে তুলে ধরে বেড়াল ছানার মতো শূন্যে দোলাচ্ছিল।

রঘু কেবল বলতে পারল: আঁ—আঁ—আঁ—

আঁ—আঁ? আচ্ছা চল আমার সঙ্গে। পিছে বোঝা যাবে।

লোকটা রঘুর ঘাড় ছেড়ে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গেই একটা কাটা কুমড়োর মতো ধপাৎ করে স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল রঘু।

সেই লোকটা তখন লাল-লাল চোখ দুটো পাকিয়ে, করাত কলে কাঠ চেরাইয়ের মতো বিকট আওয়াজ তুলে হা হা করে হেসে উঠল। আর সেই হাসির আওয়াজে রঘুর সামনে বিশ্বসংসার লুপ্ত হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হলো, তখন রঘুর মাথার ভেতরটা ঠিক চরকির মতো ঘুরছে। কিছুক্ষণ ধরে একরাশ সর্ষের ফুলের মতো কি কতগুলো তার সামনে নাচতে থাকল, মনে হলো একটা মাকড়সার জাল হাওয়ায় দুলছে আর তার ভেতর থেকে কয়েক জোড়া পাকানো চোখ কট্‌কট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রঘু উঠে বসল।

একটা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে সে পড়ে ছিল এতক্ষণ। দেখল, কেমন করে যেন একটা পুরোনো পোড়ো বাড়িতে এসে পড়েছে সে। সামনে একটা জানালা দিয়ে রোদ আসছে, সেই রোদ পড়ে একটা মাকড়সার জাল জ্বলজ্বল করছে, তার মধ্যে মস্ত কালো মাকড়সাটা কদাকার পা নেড়ে নেড়ে চলে বেড়াচ্ছে। ইট-বের-করা দেওয়ালগুলোতে কোথাও চুনের আস্তর নেই—একটা ভ্যাপসা ভিজে গন্ধ উঠছে, হাওয়ার ধাক্কায় জানলার আধভাঙা পাল্লা ক্যাঁচ ক্যাচ করে শব্দ তুলছে। ঘরটা বেশ বড়। তারই একটা দিকে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে সে। একটু দূরে গোটাতিনেক খাটিয়ার ওপর ময়লা বিছানা গোটানো রয়েছে, লোটা আছে গোটা চারেক, দেওয়ালে

হেলান দেওয়ানো রয়েছে মোটামোটা বাঁশের লাঠি আর শড়কি বল্লম। দুটো দরজা—একটা সামনের দেওয়ালের গায়ে, সেটা বন্ধ আছে। বোধ হয় পাশের ঘরের দরজা। আর একটা দরজা তার ডানদিকে, সেটা খোলা,—জানালা দিয়ে বাতাস এসে সেই পথে হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাছপালার শব্দ আসছে, শোনা যাচ্ছে পাখির ডাক।

রঘুর ইচ্ছে করল, খোলা দরজাটা দিয়ে এক ছুটে বাইরে পালিয়ে যায় সে। তার মন বলছিল, বাবু রাঘবলাল, এ জায়গাটা একদম ভাল নয়। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, তা হলে তিন লাফে উধাও হও এখান থেকে। কিন্তু ইচ্ছে সত্ত্বেও সে পালাতে পারল না। একে তো ভয়ে, ক্লান্তিতে সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে, তার ওপর সেই প্রচণ্ড খিদে। চম্পাতিয়ার ছাতুর তাল কখন যে হোমিওপ্যাথিক বড়ি হয়ে তার পেটের অতলে অদৃশ্য হয়েছে, তা সে নিজেও জানে না। রাঘব বুঝতে পারল, সেই লাল-লাল চোখওলা বিকট চেহারার লোকটাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। লোকটার কথা মনে পড়তেই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। কিন্তু তখুনি পেটের আগুন-জ্বলা খিদেটা চাঁই চাঁই করে বলে উঠল: পাহাড় খাই, গাছ খাই, লোহা-লক্কড় যা পাই তা-ই খাই।

এনেছে যখন, তখন ভূত হোক, যা-ই হোক, কিছু নিশ্চয় তাকে খেতে দেবেই। আর, কিছু না খেতে পেলে এমনিতেই যখন সে মারা যাবে, তখন খেয়ে-দেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু যদি সত্যিই লোকটা রাক্ষস হয়? যদি তাকে একটা কাঁচা নরমুণ্ড এনে খেতে দেয়? কিংবা যদি সত্যিই তার মুণ্ডুটাই কচমচ করে—খোলা দরজার একটা পাটি বাতাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল সেটা। আর বিষম ভয়ে 'ওরে বাবা' বলে রঘু একটা লাফ মারল।

এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বুদ্ধু কাঁহাকা।

রাঘবলাল দেখল, এবার যে ঘরে ঢুকেছে তাকে দেখে ঠিক রাক্ষস বলে বোধ হচ্ছে না। তার চাইতে বয়সে একটু বড়, কালো মিশমিশে একটি ছেলে। অসম্ভব জোয়ান, চওড়া বুক, লোহার শাবলের মতো দুখানা লম্বা লম্বা হাত। ইচ্ছে হলে এ-ও এক আছাড়ে তাকে চাপাটি বানিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ছেলেটা হাসছে, কালো মুখের ভেতর চক-চক করছে সাদা দাঁতের সারি।

—আরে, এত ডর খাচ্ছিস কেন? আমি তোর সঙ্গে গল্প করতে এলুম।

রঘু এবার ভয় পেল না বটে কিন্তু বেশি ভরসাও পেল না। টুক করে আবার নিজের জায়গাতে বসে পড়ল, আর ছেলেটা তার মুখোমুখি বসল একটা খাটিয়ার ওপর।

—আমি কোথায় এসেছি?—এতক্ষণে সাহস করে জিজ্ঞেস করল রাঘবলাল।

—কোথায় এসেছিস? ছেলেটা আবার হাসল, তা ভাল জায়গাতেই ভিড়েছিস এসে। এর নাম বলরামপুরের শালবন। সহজে কেউ এ-বনের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

—তবে তোমরা কেন এখানে থাকো?

—কেন থাকি? জানতে পারবি একটু পরেই। তারপর আগে তোর কথা শুনি। কে তুই?

আমি রাঘবলাল সিং। সবাই রঘু বলে ডাকে।

—আমিও রঘুই বলব। তোর কে কে আছে?

—বাবা-মা সবাই। আমি আবার তাদের কাছে ফিরে যাব।

—বলতে বলতে রঘুর চোখে জল এসে গেল।

আমি 'কিরিয়া' করে বলছি, আর কখনো আমি ছানার জিলিপি চুরি করে খাব না।

www.boiRboi.blogspot.com

—চুরি করে খেয়েছিলি?

—সেজন্যেই তো! বাবা মস্ত একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। তারপর—

ছেলেটা বললে, হুঁ, বলে যা।

চোখের জল মুছতে মুছতে রঘু নিজের করুণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলে।

শুনতে শুনতে ছেলেটা হাসছিল, শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললে, কাজ ভাল করিসনি। বাপ-মাকে ছেড়ে পালিয়ে আসা খুব খারাপ। আমিও তাই করেছিলুম, তারপর—

—তুমিও পালিয়েছিলে! রঘু কৌতূহলে সোজা হয়ে উঠে বসল।

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, এখন থাক এ-সব কথা। তুই তো কাল থেকে ভুখা আছিস্ দেখছি। কিছু খাবি?

—খিদেয় মরে যাচ্ছি ভাই!

—তবে বোস, আমি খাবার নিয়ে আসি। কিন্তু খবর্দার, ঘর থেকে বেরুবি না। ভারী মুশকিলে পড়বি তা হলে।

ছেলেটা বেরিয়ে গেল।

হাঁ করে বসে রইল রঘু। মুশকিল? সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কে? গেলই বা কোথায়? বলরামপুরের শালবনের মানে কী? কেন লোকে এর ত্রিসীমানায় পা দেয় না? এই ছেলেটাকে দেখে তো ভয়ের কিছু মনে হল না। তার, তবে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করছে কেন? কী আছে বাইরে? জিন-পরী? বাঘ-ভাল্লুক?

রঘু দেখতে লাগলো, সামনে মাকড়সার জালে রোদ পড়ে রুপোর তারের মতো ঝিলমিল করছে। আর সেই বিকট কালো মাকড়সাটা যেন কুতকুতে চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকেই। হাওয়ার ধাক্কায় জানালার ভাঙা পাল্লাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে শব্দ করছে সমানে।

মনের মধ্যে কে যেন ডেকে বললে, এখন পালাও রাঘবলাল, এখনো সময় আছে। কিন্তু পালাবার সাধ্য কী? ছেলেটা খাবার আনতে গেছে, না-খেয়ে এক পা-ও সে নড়তে পারবে না। তারপর ঘরের বাইরে ভূতপেত্নী, সাপ-বাঘ কী যে থাবা পেতে বসে আছে কে জানে? রঘু ঘামতে লাগল।

ছেলেটা ফিরে এল। একটা কলাই-করা থালায় কয়েকটা লাড্ডু, গোটা চারেক কলা আর পেতলের গ্লাসে এক গ্লাস দুধ।

বললে—খা লে। আমার খাবারটা তোকে দিচ্ছি।

—সে কি! তুমি কী খাবে—লাড্ডুতে হাত দিয়েও রাঘবলাল হাত গুটিয়ে নিলে।

—আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না; আমার দুসরা ব্যবস্থা আছে। তুই খা!

আর বলতে হল না। রাঘব বাঘের মতো খাবারগুলোর ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। খাওয়া শেষ করে দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে, এমন সময়—

আরে বাঃ বাঃ চিড়িয়া যে দানাপানি খাচ্ছে দেখছি।

বিষম চমকে উঠে রঘু দরজার দিকে তাকালো। তিনটে গুণ্ডা জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সকলের সামনে সেই লোকটা—যে ঘরের ভেতরে রঘুর টুঁটি চেপে ধরেছিল।

লোকটা সেই করাত-চেরা আওয়াজে আবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বললে, লে—লে শেষ খাওয়াটা খা লে! তারপর তোকে সাবাড় করবো।

রঘু ভয়ে পাথর হয়ে গেল।

ছেলেটা বললে, কেন মিছে ছোট বাচ্চাটাকে ভয় দেখাচ্ছ চাচা?

—মিছে ভয় দেখাচ্ছি?—লোকটার অট্টহাসিতে রঘুর মাথা ঘুরে গেল, ওটা বাচ্চা ছেলে নয়, কেউটের বাচ্চা। খুদে গোয়েন্দা! নইলে এই বলরামপুরের শালবনে এসে ঢোকে?

আজই সন্ধেয় ওকে কালীর পায়ে বলি দেব; তবে আমার নাম বুন্দা সিং—হাঁ।

রঘুর হাত থেকে ঠকাৎ করে গ্লাসটা খসে পড়ল, দুধের ঢেউ বয়ে চলল মেঝেতে।

॥ পাঁচ ॥

রঘু হাউমাউ করে কান্না জুড়েছিল, ঘর্-ঘরে গলায় বুন্দা সিং জোরালো ধমক দিলে একটা।

—এই রোও মৎ!

রঘুর কান্নাটা গলায় এসে কোঁৎ করে থেমে গেল।

—খাড়া হো যাও।

রঘু দাঁড়ালো। কেমন করে দাঁড়ালো জানে না, শুধু চোখের সামনে সেই মাকড়সার জালটা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

—নাম কী? ঘর কাঁহা?

রঘু জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বললে, কেউ তা বুঝতে পারল না। বুন্দা সিং চোখ পাকিয়ে আবার বিকট গলায় ধমক দিলে: সাফ সাফ বলো, নেহি তো—বিরাশী সিক্কা নয়, একশো চৌষট্টি সিক্কার একটি চড় আকাশে উঠল। সেটা গালে পড়লে রঘু সেই চম্পাতিয়ার ছাতুর গোলার মতো তাল পাকিয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে।

রঘুর গলা দিয়ে কেবল ক্যাঁ করে একটা আওয়াজ বেরুল। আর তক্ষুনি আড়াল করে দাঁড়ালো সেই কালো ছেলেটা—যার নাম মুরলী।

মুরলী বললে, কেন ঝুট্‌মুট ওকে ভেবড়ে দিচ্ছ চাচা? আমি সব বলছি।

ছানার জিলিপি চুরি করে খাওয়া, তারপর বাপের ঠ্যাঙার ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো—ট্রেনে উঠে ভোর বেলা লাফিয়ে নেমে পড়া—রাঘবের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সব বলে গেল মুরলী। আর তাই শুনে হা-হা করে হাসতে হাসতে পেটে হাত চেপে বসে পড়লো বুন্দা সিং। সঙ্গের বাকি তিনটে জোয়ানও সে হাসিতে যোগ দিলে আর মনে হলো বলরামপুরের জঙ্গলে যেন হাজার খানেক করাত একসঙ্গে কাঠ চিরছে।

হাসি থামলে বুন্দা সিং বললে, অ্যাঁ এইসা বাত? ওরে বুদ্ধু রঘুয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচতে নেই—বাঁচার জন্যেই খেতে হয়। যাই হোক, আমার পাল্লায় যখন এসে পড়েছিস, তখন তোকে শিখিয়ে দেব সত্যিকারের বাঁচা কাকে বলে। কুস্তি লড়বি, লাঠি খেলবি, বন্দুক ছুঁড়বি। ঘি আর মেঠাই খেয়ে পেটে যে থলথলে চর্বি জমেছে—এক মাসের মধ্যে লোপাট হয়ে যাবে ওসব। ছাতি চওড়া হবে—সত্যিকারের জোয়ান করে তুলব। এই মুরলী তোর দেখাশোনা করবে—আর এই কিষণলাল তোকে মানুষ করবার ভার নেবে। কিন্তু খবদ্দার! পালাবার চেষ্টা করেছিস তো মরেছিস! কালী মাইজীর কাছে নিয়ে তোকে বলি দেব—মনে থাকে যেন।

কথাগুলো রঘু যে সব শুনতে পেল তা নয়। কিন্তু যা শুনল তা-ই যথেষ্ট। আর-একবার কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুন্দা সিং ওর চোখের দিকে তাকাতেই সে কান্নাটা কোঁৎ করে গলা বেয়ে পেটের ভিতরে নেমে গেল তার।

বুন্দা সিং বললে, আমি এখন যাচ্ছি, বিকেলে ফিরে আসব। কিষণলাল, তুমি এক্ষুনি একে তালিম লাগাও, আমি এসে খবর নেব, কতদূর এগোলো।

এই বলে বাকি দু-জন সঙ্গীকে নিয়ে নাগরা জুতো মচ্‌মচিয়ে বেরিয়ে গেল বুন্দা সিং। সামনে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে?

রঘু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আশা মরীচিকা। সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা লম্বা জোয়ান এগিয়ে এল তার দিকে। গায়ের রংটা ফর্সার দিকে। মাথায় ছোট-ছোট লালচে চুল—রোদ পড়ে তামার কুচির মতো জ্বলছে, বাঁ দিকের ভুরুর নিচ থেকে একটা পুরনো কাটা দাগ ধনুকের মতো বেঁকে নেমে এসেছে ঠোঁট পর্যন্ত। চোখ দুটো ট্যারা। মালকোঁচা করে পরা কাপড়, গায়ে ফতুয়া, দু-হাতে দুটো লোহার বালা। সব মিলে ভয়ঙ্কর লোকটাকে আরো বিকট দেখাচ্ছে। এ-ই কিষণলাল।

কিষণলাল ট্যারা চোখে খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল—অর্থাৎ বেশ করে লক্ষ্য করল রঘুকে। তারপর বললে, আও।

রঘু মুরলীর পেছনে কাঠ হয়ে রইল, এক পা নড়ল না। কিষণলাল আবার মোটা গলায় বললে, এই রঘুয়া, চলা আও।

মুরলী কানে কানে বললে, চলা যাও—ডরো মৎ।

বলির পাঁঠার মতো মুরলীর আড়াল থেকে বেরুল রাঘবলাল। কিষণলাল খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরল। আঙুল তো নয়—যেন লোহার আংটা! রঘুর হাতের হাড় মড়-মড় করে উঠল।

কিষণলাল তাকে টানতে টানতে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল।

কিষণলালের সঙ্গে যেতে যেতে রঘু দেখল, একটা মস্ত পুরোনো বাড়ির অর্ধেকটা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—তৈরি হয়েছে কতগুলো মাটির পাঁজা, তার ওপর ঘাস আর বনতুলসীর জঙ্গল গজিয়েছে। মাত্র খান-তিন-চার ঘর কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে, একটু-আধটু সারিয়ে-সুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেইটেই এদের আস্তানা। পুরোনো চুন-সুরকি আর গাছপালার গন্ধে ভরে আছে বাতাস। বাড়িটার সামনে আর দু ধারে একটু ফাঁকা জায়গা—কেটে সাফ করা হয়েছে মনে হয়। তাছাড়া চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। শালগাছ তো আছেই, কয়েকটা শিমুল গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। আরো কি কি গাছ রয়েছে রঘু চিনতে পারল না। বনের ভেতর দিয়ে কয়েকটা ছোট-ছোট পায়ে-চলা রাস্তা কোথায় যে চলে গেছে কে জানে?

সেই ফাঁকা জায়গার খানিকটা অংশ বেশ করে কোপানো—রঘু বুঝল এখানে কুস্তি হয়। তারই কাছাকাছি একটা গাছতলায় কিষণলাল রঘুকে এনে দাঁড় করালো। বললে, খাড়া রহো।

রঘু দাঁড়িয়ে রইল।

—ইধার উধার ভাগো মৎ।

রঘু মাথা নেড়ে জানালো, না,—সে ভাগবে না।

—আমি এখুনি আসছি—বলে চট্ করে কিষণলাল আবার সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। রঘু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিক। চোখে পড়ল, খানিক দূরে একটা শালগাছের ওপর থেকে তিনটে বানর একমনে তাকে দেখছে। একটা আবার চোখ পিটপিট করে তাকে ভেংচে দিলে।

ভ্যাংচাক যত খুশি। অন্য জায়গা হলে রঘু এতক্ষণে দু-চারটে ঢিল ছুঁড়ে দিত, কিন্তু বিপাকে পড়লে সবই সইতে হয়। রঘু মুখ হাঁড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিষণলাল ফিরে এল। তার দু'হাতে দুটো লাঠি। একটা প্রকাণ্ড, আর-একটা

www.boiRboi.blogspot.com

তার চাইতে একটু ছোট। মতলব কী? ওই লাঠি দুটো দিয়ে ঠ্যাঙাবে নাকি তাকে? কিন্তু দুটোর দরকার কী, একটার এক ঘা খেলেই তো রঘু চিরকালের মতো ঠাণ্ডা।

কিন্তু কিষণলাল তাকে ঠ্যাঙালো না। সামনে এসে ছোট লাঠিটা তার দিকে এগিয়ে ধরল।

—নে।

রঘুকে নিতে হলো।

—লাঠি খেলেছিস কোনদিন?

—না।

—কুস্তি করেছিস?

—না।

—হুঁ! তাই এই বয়সেই পেটে অমন করে চর্বি গজিয়েছে, বুকটা হয়েছে পায়রার মতো। তিনদিনে আমি তোকে ঠিক করে দিচ্ছি। এবার লাঠিটা ধর্।

রঘু লাঠির গোড়াটা ধরল।

—বেকুব কাঁহাকা! ও-ভাবে নয়। দেড় হাত বাদ দিয়ে তারপর দু'-পাশে মুঠো করে ধর্। ধরেছিস? এইবারে লাঠি তোল্!—তোল বললেই তোলা যায় নাকি? একটা বাঁশের লাঠির যে এমন নিদারুণ ওজন হতে পারে, রঘু সেটা এই প্রথম বুঝতে পারল। যেন ভীমের গদা তুলেছে এমনি মনে হলো, টনটনিয়ে উঠল হাতের কবজি।

—ঠিক হ্যায়! এইবার লাগা আমার লাঠির সঙ্গে। আওর জোরসে! খালি ঘি-মিঠাই খাস, একটু তাগদ নেই শরীরে? হুঁ—ঠিক হয়েছে। কারুর মাথায় মারতে হলে কিংবা কেউ মাথায় মারতে এলে—এমনি করে মারবি। এইভাবে আটকে দিবি। একেই বলে শির্—সমঝা?

আর সমঝা! এক শিরের ধাক্কাতেই রঘুর শির ঝন-ঝন করছে তখন! আর কী ভারি এই লাঠিটা। রঘুর কাঁধ থেকে হাত দুটো ছিঁড়ে পড়বার জো হল।

কিষণলাল বললে, লাঠি ফেক্—

'লাঠি ফেক্' কথাটার মানে হল লাঠিটা এগিয়ে নিয়ে ধরে ছোঁড়বার ভঙ্গিতে জোরে তার মাথাটা মাটিতে ঠেকানো। কিন্তু 'ফেক্' কথাটার অর্থ রঘু সোজাসুজি বুঝে নিল। তৎক্ষণাৎ হাত থেকে ছুঁড়ে দিলে লাঠিটা, আর সেটা সোজা গিয়ে ধাই করে কিষণলালের হাঁটুর ওপর পড়ল।

—আরে বাপ্, মার দিয়া! বলে হাহাকার করে উঠল কিষণলাল। হাঁটু চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল কিছুক্ষণ, বিশ্রী মুখ করে চোট-খাওয়া জায়গাটা ডলাই-মলাই করল, তারপর উঠে দাঁড়ালো। তখন তার দাঁত কড়-কড় করছে, তার কটা চুলে রোদ পড়ে তামার কুচির মতো জ্বলছে আর দুটো ট্যারা চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

—উল্লু—ভাল্লু—গন্ডর—খড়র কাঁহাকা—

উল্লু, ভাল্লু—গন্ডর এ-সবের মানে বোঝা যায়, কিন্তু খড়র যে কী ব্যাপার সেইটেই বুঝতে চেষ্টা করছিল রঘু। তার আগেই বাঘের মতো তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিষণলাল। দুটো লম্বা লম্বা হাতে স্রেফ একটা বেড়াল-ছানার মতো মাটি থেকে তুলে নিলে, তারপর সোজা ছুঁড়ে দিলে ওপর দিকে।

কাঁউ কাঁউ করে একটা আওয়াজ বেরুল রঘুর গলা দিয়ে। আর পরক্ষণেই টের পেল মাটি থেকে হাত-সাতেক ওপরে একটা গাছের ডালে সে সওয়ার হয়েছে। তখুনি নিচে পড়ে যাচ্ছিল, প্রাণপণে ডালটাকে চেপে ধরে তার ওপর সে শুয়ে পড়ল।

নিচে থেকে হা-হা করে হেসে উঠল কিষণলাল। বললে, আব্ রহো, হুঁয়াই রহো।

তা ছাড়া আর কী করতে পারে রঘু? জীবনে সে কোনদিন গাছে চড়েনি—এমনকি ঘুড়ি ধরবার লোভেও নয়। চিরকালই সে বাপ-মায়ের আদরের দুলাল, ননীর পুতুল। এই ডাল থেকে কেমন করে যে মাটিতে নামবে সেটা ভাবতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল তার।

আর তখন—

পাতার আড়াল থেকে হাজারখানেক লাল পিঁপড়ে বেরিয়ে সবেগে তাকে আক্রমণ করল। তাদের নিজস্ব দুর্গে এই অনধিকারীর প্রবেশ তারা কোন মতেই সহ্য করতে রাজী নয়।

॥ ছয় ॥

কিষণলাল আবার গলা ফাটিয়ে হাসল কিছুক্ষণ।

—হো—হো, দেখো দেখো। পের্‌কা উপর বান্দর কেইসে বৈঠা হ্যায়।

'পের্' অর্থাৎ গাছের ওপর বাঁদর বসে আছে। কিন্তু রাঘবলাল আর সত্যিই কিছু বানর নয়। তা হ'লে লাফে লাফে এ-ডাল থেকে ও-ডালে সে হাওয়া হয়ে যেতে পারত। তার বদলে চোখ কপালে তুলে সে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে রইল, আর দলে-দলে লাল পিঁপড়ে এসে—বাবা রে—মা রে গেলুম রে—

গোলমাল শুনে মুরলী বেরিয়ে এসেছিল।। এই ছেলেটাকে রঘুর ভাল মনে হয়েছিল, ভেবেছিল বিপদে-আপদে অন্ততঃ মুরলীর কাছে আশ্রয় পাবে সে। কিন্তু এ কী বিশ্বাসঘাতকতা! সংসারে কাউকে যে চেনবার জো নেই! মুরলীও হাসছে। কালো মুখের ভেতর থেকে শাদা-শাদা দাঁত বের করে সমানে হেসে চলেছে। রঘু আর্তনাদ করে উঠল: এই ভাই মুরলী, চুট্টি (পিঁপড়ে) আমাকে খেয়ে ফেললে!

—তো উতরো না। নেমে এস।

—কেমন করে নামব?

—কোশিস্ কর।

কী করে কোশিস্ করে রঘু? একেবারে ননীর পুতুল। খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, মোটা হয়েছে, আর পনেরো বছর বয়সেও প্যাঁচার ডাকে ভয় পেয়ে মা-কে জড়িয়ে ধরেছে। গাছ থেকে নামা কি তার কাজ?

—উতরো—উতরো বলে কিষণলাল তার লম্বা লাঠিটা দিয়ে একটা খোঁচা লাগিয়ে দিল রঘুর পেটে। রঘু গোঁ গোঁ করে উঠল।

একেবারে দুমুখো আক্রমণ! গাছে লাল পিঁপড়ের ব্যাটেলিয়ান, তলা থেকে লাঠির গুঁতো। আর ঠিক সেই সময় চোখে পড়ল, মাথার একটু ওপরে গোটা-চারেক বাঁদর তাকে ভেংচি কাটছে। তাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক। ওই চারটিতে মিলে যদি খাচখ্যাঁচিয়ে তাকে আঁচড়ে দেয়, তা হলে গায়ের ছাল-চামড়া বলে কিছু আর থাকবে না।

হে মা কালী! হে বাবা হনুমানজী! এই দুঃসময়ে রাঘবলালকে বাঁচাও।

এর মধ্যে একটা লাল পিঁপড়ে কুটুস করে রাঘবের কানের গোড়ায় কামড়ে দিয়েছে আর কিষণলাল আবার ক্যাঁক করে লাগিয়েছে লাঠির গুঁতো। আর তো পারা যায় না!

—উতরো না! একটু নিচে নামো—ডাল ধরে ঝুলে পড়!—মুরলী উপদেশ দিতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

তা ছাড়া আর উপায় নেই। চেষ্টা তাকে করতেই হবে। প্রাণ দিয়ে টানাটানি পড়েছে এখন।

প্রায় দশমিনিট ধস্তাধস্তির পর—ঝপাং।

রঘু ঠিক মাটিতে নামল না—পড়ল। তারপরে আরো মিনিট দশেক নাচানাচি করতে হলো প্রাণপণে। মানে, ইচ্ছে করেই নাচল না, ওই পিঁপড়েরাই নাচিয়ে ছাড়ল তাকে। মুরলী এগিয়ে এসে কিছু পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দিলে গা থেকে। তখন বে-দম হয়ে রাঘবলাল বসে পড়ল গাছতলায়, গায়ের চামড়া ছড়ে গেছে এখানে ওখানে, পিঁপড়ের কামড়ে চাকা-চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে আর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কামারশালার হাপরের মতো ওঠাপড়া করছে। হায়রে ছানার জিলিপি! তোর জন্যে এত দুর্ভোগ সইতে হবে সে-কথা কি রাঘবলাল স্বপ্নেও ভেবেছিল। কিন্তু বসে বসে দুঃখ করবার জো নেই। কিষণলাল এক হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে ফেললে।

—আও, লাঠি ধরো।

কিছুতেই নিস্তার নেই। আবার সেই কালান্তক লাঠি খেলা। ওঃ।

দেখতে দেখতে কুড়ি-বাইশটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে রাঘবলাল অনেক দেখেছে, ঠেকেছে, অনেক শিখেছে। বুঝেছে এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে মা নেই, বাবা নেই, দোকানের চাকর ছোট্টু—যে লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকে এটা-ওটা মিঠাই খাওয়াতো, সেও নেই। এমন কি স্কুলের সেই বন্ধুরাও নয়—যারা ঠাট্টা করে মানপত্র দিলেও নিরীহ, শান্ত রাঘবলালকে বেশ ভালোইবাসত। ননী, ছানা ঘি-ভাত এ-সবের কোন পাটই নেই এখানে।

বুন্দা সিং তো আছেই, তা ছাড়া আছে আরো দশ-বারোজন মানুষ—সকলেই যেন বাঘের দোসর!

ভোরে উঠে কাঁচা ছোলা খেতে হয়, কুস্তি লড়তে হয়, লাঠি-শড়কি-তলোয়ারের খেলা শিখতে হয়। বন্দুক ছোঁড়াও শিখতে হবে এর পর। আর খাওয়া শুকনো শুকনো বড়-বড় রুটি, কিছু ডাল-তরকারি আর দুধ। টাঁ-ফোঁ করবার জো নেই—যে-কেউ এসে ধাঁ করে এমন এক-একটি পেল্লায় চড় কষিয়ে দেয় যে আধঘণ্টা ধরে মাথা-ফাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে। প্রথম দিনে ছোলা খেতে রাজি হয়নি বলে এক-জন তো তাকে ঠ্যাং ধরে গদার মতো শূন্যে তুলেছিল, একটা আছাড় দিলেই একদম ঠাণ্ডা! ভাগিস মুরলী হাঁ হাঁ করে এসে পড়েছিল, নইলে সেই দিনই রাঘব-লালের হয়ে যেত।

এই বাইশ দিনে অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে। ছোলা চিবুতে ভালো না লাগলেও খুব যে খারাপ লাগে তা-ও নয়। রুটি আর তরকারি এখন গোগ্রাসেই খায়—তবে গরম ঘি-ঢালা ভাতের মতো অত বেশি খেতে পারে না। খাওয়ার পরেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে না, চোখে ঝিমুনি ধরে না। মনে হয় অনেকখানি সে দৌড়ে আসতে পারে, লাফালাফি করতে পারে অনেক দূর পর্যন্ত।

শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। ভুঁড়ি-টুঁড়িগুলো এর মধ্যে যেন চুপসে কোথায় চলে গেছে। এখন লাঠির ভারে কবজি আর ছিঁড়ে আসতে চায় না। রাঘব মাথার ওপর বনবনিয়ে ঘুরোতে পারে সেটাকে। প্যাঁচার ডাকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, রাত্রে যখন ঘরের আশপাশ থেকে 'উ কা হু—উ কা হু' বলে শেয়ালরা গলা ছেড়ে কি যেন জিজ্ঞেস করতে থাকে, তখন রাঘবলাল অঘোরে ঘুমোয়।

আগের সেই ভীতু, বোকা আর পেটুক রাঘবলাল অনেকটাই বদলে গেছে। এমন

www.boiRboi.blogspot.com

কি বাবা-মা বাড়ির জন্যে মধ্যে-মধ্যে খুব কান্না পেলেও এখানে সে যে খুব খারাপ আছে তা নয়। মুরলী তাকে খুব ভালোবাসে, কিষণলাল কখনো কখনো পিঠ চাপড়ে দেয়, বুন্দা সিং-ও আর তেমন কটমট করে তার দিকে তাকায় না। আসল ভয় সেখানে নয়। রাঘবলাল জেনেছে, এরা ডাকাত। নানা জায়গায় ডাকাতি করে পুলিশের তাড়া খেতে খেতে এখন কিছুদিনের জন্য এই বলরামপুরের জঙ্গলে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। কী একটা মতলব নিয়ে কিছুদিন চুপচাপ করে রয়েছে—কোন একটা বড়গোছের কাণ্ড ঘটিয়ে এখান থেকে পালাবে। দিনের বেলা ওদের কেউ-কেউ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর গেরুয়া পরে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরোয়—দূরের গঞ্জে যায়, দরকারি জিনিসপত্র কিনে-কেটে আনে। আর মাঝরাতে বুন্দা সিংয়ের ঘরে বসে ফিসফিস করে কী সব আলোচনা করে। সে আলোচনা, রাঘবলাল তো দূরে থাক, মুরলীরও শোনবার জো নেই।

আর এই জন্যেই রাঘবলালের ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, শেষ পর্যন্ত সে কিনা ডাকাতের দলে গিয়ে ভিড়ল! যে ডাকাতরা মানুষ খুন করে, লুটতরাজ করে, ধরা পড়লে ফাঁসিতে কিংবা জেলে যায়—তাদের সঙ্গে মিশে তাকে কাটাতে হচ্ছে! পারলে এই মুহূর্তে সে ছুটে পালাতো। কিন্তু মুরলী তাকে বলেছে বুন্দা সিং মিথ্যেই শাসায়নি। তার চোখ চারদিকে খোলা। পালাবার চেষ্টা করলেই টুঁটি চেপে ধরবে, তারপর গভীর বনের ভেতর কোথায় একটা পোড়ো পুরোনো কালী-মন্দির আছে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবে!

কী হবে রাঘবলালের? কী করবে সে?

সেদিন বিকেলে বসে বসে এইসব কথাই সে ভাবছে, এমন সময় মুরলী এল। দুটো কুড়ুল তার দু-হাতে।

বললে, চল রঘুয়া।

—কোথায় যেতে হবে?

—সর্দার বলেছে, রান্নার কাঠ নেই। বন থেকে কেটে আনতে হবে।

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল।

এর আগে এত গভীর বনের ভেতরে রঘু কোনদিন ঢোকেনি। বড় বড় গাছের ছায়ায় কী অন্ধকার হয়ে আছে এখানে ওখানে! পায়ের নিচে কী স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা মাটি! কত লতা, কত ঝোপঝাড়, কত রকমের ফুল ফুটেছে। তার ভেতরে ক'টি ফুলগুলোকে রাঘবলাল চেনে, তাদের গন্ধে বন যেন ভরে রয়েছে। কোথাও বা কালো ভিজে মাটি ছেয়ে শিমুলের ফুল ঝরেছে—যেন বনের মধ্যে কে একখানা লাল কার্পেট পেতে রেখেছে। টুই-টুই করে মিষ্টি গলায় কি একটা পাখি ডেকে চলেছে একটানা।

মুরলী বললে, আমার বনে বনে ঘুরতে বেশ লাগে। তোর ভালো লাগে না?

একেবারেই নয়। কিন্তু সে কথা রাঘবলাল মুখ ফুটে বলতে পারল না।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শুকনো মরা গাছ পাওয়া গেল। মুরলী বললে, এইটেকেই কাটা যাক—কী বলিস?

আচ্ছা।

মুরলী কুড়ুল তুলে জোরে গাছটায় কোপ বসালো। কিন্তু কুড়ুলটা তখুনি টেনে তুলতে পারলে না—অনেকখানি বসে গিয়েছিল। মুরলী কুড়ুল ধরে টানাটানি করছে, আর সেই তখন—

গর্—র্—র্—

শুধু একবার একটা আওয়াজ, ঝোপ নড়বার শব্দ, তারপরেই যেন একরাশ

সোনালি আগুন ঠিকরে উঠলো বনের ভেতর থেকে। পরক্ষণেই যা দেখল তাতে মাথার চুল একেবারে খাড়া হয়ে গেল রঘুর। দেখলে, আর্তনাদ করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে মুরলী, আর তার পিঠের ওপর চেপে বসেছে বিরাট এক চিতাবাঘ। এক সারি ছোরার মতো তীক্ষ্ন দাঁত মেলে গর্জন করছে: গর্—র্—র্—

॥ সাত ॥

রঘুর চুল খাড়া হলো—টিকিটাও যেন সোজা দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিতেই যাচ্ছিল—হঠাৎ তার কানে এল মুরলীর চিৎকার: বাঁচাও—বাঁচাও—

সংসারে কোন মানুষ ভীরু—কেউ সাহসী, রাত্তিরে গায়ে আরশোলা পড়লে কারুর দাঁতকপাটি লাগে, কেউ বা অমাবস্যার মাঝরাতে একা শ্মশানে যেতে ভয় পায় না—হাতে লাঠি বাগিয়ে দশজন ডাকাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুধু কি গায়ের জোরের জন্যেই? আরে না—না। মনের জোর থাকলে শরীরে শক্তি আপনি এসে যায়। মানুষ ভীরু হয় কেন? আঁচল-চাপা হয়ে থাকে বলে, জুজুবুড়ির ভয়ে ছমছমানি লাগে—সেইজন্যে।

রাঘবেরও তাই হয়েছিল। কিন্তু তেমন অবস্থায় পড়লে ভীরুর বুকেও তিনটে হাতির বল আসে। রাঘবলাল পালাতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো।

ওদিকে মুরলী ডাকছে: বাঁচাও—বাঁচাও—

একমিনিট কি দু-মিনিট—কিংবা তাও নয়। রাঘব নিজেও জানে না কী করে অত বড় কুড়ুলটাকে সে মাথার ওপর তুলে ধরল। তারপরেই ঝপাং কুড়ুলের কোপ পড়ল সোজা বাঘটার ঘাড়ের ওপর। খ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ খ্যাঁক্ একটা আওয়াজ করল বাঘটা, মুরলীকে ছেড়ে ছিটকে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল। রাঘবের মতো ছোট ছেলের হাতের ঘায়ে তার শক্ত গায়ে মারাত্মক চোট হয়ত লাগেনি, কিন্তু যেটুকু লেগেছিল তাই যথেষ্ট। ঘা-খাওয়া বাঘ প্রায়ই রুখে দাঁড়ায়—কিন্তু এই বাঘটার বোধহয় এতেই আক্কেল দাঁত গজিয়ে গিয়েছিল। আর-একবার সে ঘ্যাঁও বলে আওয়াজ তুলল, তারপর বনের ভিজে ভিজে কালো মাটি আর শুকনো পাতার ওপর রক্ত ছড়াতে ছড়াতে চক্ষের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

রাঘবের কপাল বলতে হবে। মুরলীকে ছেড়ে বাঘটা তারই ওপর চড়াও হলে কী যে ঘটত সে-কথা জোর করে বলা শক্ত।

—তুই আমায় বাঁচালি রঘু! একথা আমি কোনদিনই ভুলব না।

কিন্তু কাকে বলছে মুরলী? হাতে কুড়ুলটা ধরাই আছে—সেই মরা গাছটায় ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছে রঘু। তার চোখ দুটো বোজা—শরীর নিঃসাড়। এতক্ষণে সে সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে।

মুরলী আস্তে আস্তে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল: রঘুয়া—রঘুয়া—এ রাঘবলাল—বনের ভেতর ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছিল, দূরে কাছে তিতিরেরা এ-ওর সঙ্গে কথা কইছিল, ঘুঘু ডাকছিল ঘুম্ ঘুম্ শব্দে। ভির্মির ভাবটা কেটে গিয়ে রঘু চোখ মেলল।

তারপরই কাতর গলায় বললে, মুরলী।

মুরলী রাঘবের কাঁধে হাত বুলিয়ে বললে, ভাইয়া, এই তো আমি!

—বাঘটা কোথায়?

—তোমার চোট খেয়েই তো পালিয়েছে।

—আমার?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল রাঘব—যেন তখনো কিছু বুঝতে পারছে না।

—আরে, বাঘটা তো হাঁ করে আমায় কামড়াতে যাচ্ছিল—একটু হলেই গলায় দাঁত বসিয়ে দিত! ঠিক সেই সময় তুই কুড়ুল দিয়ে জব্বর ঘা মেরে দিলি ওকে। মনে নেই! তাইতেই ল্যাজ তুলে ছুটে পালালো।

রাঘব উঠে দাঁড়ালো—চোখ কচলালো বার-কয়েক। তখন তার মুরলীর কথা মনে পড়ল।

—ভাই তোমার লাগে নি তো?

—না—না, সামান্য আঁচড়ে দিয়েছে। ও কিছু নয়।

রাঘব হঠাৎ মুরলীকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। এই ক-দিনেই মুরলীকে সে যে কতখানি ভালবেসে ফেলেছে, যেন এইবার বুঝতে পারল সেটা! আর তার কান্নায় মুরলীরও চোখ ছলছল করে উঠল।

মুরলী বলল, চল ভাইয়া ফিরে চল্। চোট-লাগা বাঘকে বিশ্বাস নেই—বিশেষ করে চিতা। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আবার কখন এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। তখন আর সামলানো যাবে না। এই বেলা পালাই।

বুন্দা সিংয়ের আড্ডায় রাতারাতি নিদারুণ খাতির বেড়ে গেল রাঘবলালের।

বুন্দা সিং তার মস্ত গোঁফজোড়ায় তা দিয়ে, হঠাৎ কোন কথা না বলে, রাঘবকে একেবারে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে। রঘু আঁৎকে উঠে আঁই আঁই করে উঠল! তার মনে হল আবার বোধহয় সে-দিনের মতো তাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে গাছের ডালে। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও গাছ ছিল না, আর পড়তে-না-পড়তেই আবার তাকে লুফে নিল বুন্দা সিং। আর ধরাম ধরাম করে গোটা কয়েক পেল্লায় চাঁটি পড়ল রাঘবের পিঠে। যেন 'রামা হো—রামা হো' গাইবার তালে বেশ করে ঢোলক বাজিয়ে নিলে বার-কয়েক।

কিন্তু রাঘবের পিঠটা ঢোলক নয়—লাগলও বিলক্ষণ। তবু রাঘব কেঁদে উঠতে পারল না। সে বুঝতে পারছিল, তাকে আদর করা হচ্ছে।

বুন্দা সিং বললে, সাবাস—সাবাস এই তো চাই! ডর-পোক হয়ে ননীর পুতুলা হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয়? চর্বির ঢিবি ছিলি, এইবার মানুষ হচ্ছিস। শেষে একদিন হয়তো তুই-ই এই দলের সর্দার হয়ে উঠবি। তখন সারা হিন্দুস্থানের লোক বলবে, হাঁ ডাকু বটে রাঘবলাল—তার নাম শুনলে মিলিটারি ভি ডর খায়।

এই কথা শুনেই রাঘবলালের খারাপ লাগল। বুন্দা সিংয়ের মতো ভয়ঙ্কর লোকও তাকে বাহবা দিচ্ছে এতে মনটা খুশি হতেই পারে, কিন্তু বড় হলে সে নাম-জাদা ডাকাত হবে—এইতে রঘু ভারি দমে গেল। এই লোকগুলো সাংঘাতিক ডাকাত—পুলিশের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছে—রঘু প্রাণপণে তা ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। এক-একদিন রাত্রে বাইরে পাতার আওয়াজ কিংবা শেয়াল-কুকুরের চলার শব্দে তার মনে হয়, এই বুঝি পুলিশের দল-বল আসছে, এদের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

পালাতে পারলে সে বাঁচে এখান থেকে। কিন্তু মুরলী বলে দিয়েছে বুন্দা সিংয়ের দুটো চোখ এই বনের হাজার হাজার জোনাকির মতো চারদিকে জ্বলছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়বে, আর তারপর—

ওদিকে বুন্দা সিংয়ের কথা শুনে কিষণলাল বললে, খালি রঘুয়ারই প্রশংসা করছ কেন সর্দার? ওকে লাঠি খেলা শিখিয়ে, কুস্তি লড়িয়ে মানুষ করেছে কে;

www.boiRboi.blogspot.com

সেটাও বলো!

বুন্দা সিং বললে, আলবাৎ—আলবাৎ! কিষণলালেরও বাহাদুরি আছে বৈকি!

কিন্তু রঘুর প্রশংসা শুনে একজনের গা জ্বালা করছিল, তার নাম ভুট্টারাম। বেঁটে চেহারার লোক ভুট্টারাম, মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ আবার তার কানা। এই বলরামপুরের আড্ডায় ভুট্টারামকেই রঘু একদম পছন্দ করে না। যখন-তখন মাথায় গাঁট্টা মারে, রঘুর টিকি ধরে টেনে দেয়। এক-একদিন রাত্রে শোয়ার সময় রঘুকে গা-হাত-পা টিপে দিতে বলে, পছন্দ না হলে ঠাঁই ঠাঁই করে চড় বসায়। মুরলীও দু-চক্ষে ভুট্টারামকে দেখতে পারে না, বলে, ও একনম্বরের বিচ্ছু।

সেই ভুট্টারাম মুখ বাঁকিয়ে একটা ছড়া কাটল:

'তুফান সে কৌয়া গিরে
মৌলা বোলে দেখো খেল্ ॥'

(অর্থাৎ ঝড়ে কাক মরে—আর মোল্লা বলছে, আমার ওস্তাদিটা দ্যাখো একবার!)

বুন্দা সিং ধমক দিয়ে বললে, চোপরাও! তু তো একদম নিকম্মা; কারো ভাল দেখলে বুঝি সহ্য হয় না? ভাগ্ হিঁয়াসে!

সবাই হেসে উঠল, সব চাইতে বেশি করে হাসল রাঘবলাল। আর মুখটা গোঁজ গোঁজ করে সামনে থেকে সুড় সুড় করে চলে গেল ভুট্টারাম।

কিন্তু লোকটার পেটে পেটে কুবুদ্ধি। সেদিন রাতেই সেটা টের পাওয়া গেল। সবাই তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে—হঠাৎ রাঘবলালের বাপরে—মা রে চিৎকার।

মুরলী লাফিয়ে উঠল। বুন্দা সিং, কিষণলাল, চামরি সিং, হনুমান প্রসাদ—যে যেখানে ছিল, টর্চ লাইট আর লাঠি-সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এল। সেই বাঘটাই পিছে পিছে এসে চড়াও হল নাকি রঘুর ওপর।

—ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?

—আমার গায়ের ওপর কী একটা জানোয়ার এসে লাফিয়ে পড়ল।

—জানবর? কাঁহা জানবর!—বুন্দা সিং খাটিয়ার তলায় টর্চ ফেলতেই দেখা গেল সেটাকে। একাণ্ড একটা কোলা ব্যাঙ। রেগে বেলুন হয়ে বসে আছে আর ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে। তার কায়দাই আলাদা।

এই জানোয়ার! সবাই হেসে লুটোপুটি হল। আর এবারে সব চাইতে বেশি হাসল ভুট্টারাম।

—হো দেখো কেইসা পালোয়ান—ব্যাঙের ভয়ে মূর্ছা যায়! হা-হা! ও আবার বাঘ মারবে! তুফানমে কৌয়া গিরে, মৌলা বোলে—

বুন্দা সিং ব্যাঙটার ঠ্যাং ধরে বাইরে বনের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর ধমক দিয়ে বললে, এৎনা রাতমে হল্লা মৎ করো, সব কোই আব্ শো যাও।

সবাই শুতে গেলে মুরলী এসে বসল রঘুয়ার খাটিয়ায়। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, ব্যাঙটা এই ঘরের মধ্যে কেমন করে এল রে রঘুয়া?

—সে আমি কী করে জানবো ভাই?

—বুঝলি, এ হচ্ছে ও বিচ্ছুটার কাজ। ওই ভুট্টারামই বাইরে থেকে ওটাকে ধরে এনে তোর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে। তুই যে বাঘটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস আর সবাই তোকে ভালো বলছে এ ওর প্রাণে একেবারেই সইছে না। তাই সর্দারের কাছে তোকে বুদ্ধু বানাবার জন্যে কাণ্ডটা করেছে।

—ভুট্টারাম আমাকে একেবারেই দেখতে পারে না ভাই।—রঘু কাঁদো-কাঁদো হলো।

—দাঁড়া, ওকে মজা দেখাচ্ছি। কাউকে কিছু এখন বলিসনি, কাল রাত্তিরে এর বদ্লা নেব।

www.boiRboi.blogspot.com

পরদিন বিকেলে লাঠি খেলা হয়ে গেলে রাঘবলাল যখন কোদাল নিয়ে কুস্তির জায়গায় মাটি কোপাচ্ছে, তখন কাউকে কিছু না বলে চুপি-চুপি বনের একদিকে চলে গেল মুরলী। ঝোপের ভেতর এক জায়গায় তার দরকারি গর্ত দেখেছে একটা। ফিরল অন্ধকার হলে—সকলের চোখ এড়িয়ে। দুটি ছোট ছোট ঝাঁপির মতো নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে যে কী লুকিয়ে নিয়ে এল রাঘবলালও তা জানতে পারল না। কিন্তু জানল ভুট্টারাম। সেই মাঝ রাত্তিরেই।

—জান গিয়া—জান গিয়া—মার দিয়া! সে কী বিকট চিৎকার! যেন সাতটা ষাঁড় এক সঙ্গে হাঁকাহাঁকি করছে ভুট্টারামের গলায়!

—কোন্ মার দিয়া? কিস্‌কো মার দিয়া? কেইসে মার দিয়া?

আবার দলবল নিয়ে, তেমনি লাঠি ঠ্যাঙা বাগিয়ে ছুটে এল বুন্দা সিং। খাটিয়ায় বসে পরিত্রাহি চ্যাঁচাচ্ছে ভুট্টারাম। আট-দশটা লম্বা লম্বা কাঁটা বিঁধে আছে তার গায়ে, আর সে সমানে চিৎকার করছে: একদম মার দিয়া—জান মে মার দিয়া—

সবাই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ছোট একটা সজারু কিষণলালের পায়ের তলা দিয়ে ঝুম্-ঝুম্ করে কাঁটা বাজাতে বাজাতে খোলা দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে বাইরে নেমে গেল।

॥ আট ॥

এমনি করে সুখে-দুঃখে রাঘবলালের আরো কিছুদিন কাটলো। কিন্তু মনের অস্বস্তি যেন কিছুতেই কাটে না। বুন্দা সিং আর তার দলবলের মতিগতি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপাততঃ বেশ আছে; রুটি পাকাচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, ভালো মানুষের মতো দূরের গঞ্জে গিয়ে এটা ওটা কিনে আনছে, আর এক-একদিন বেশ ঢোল বাজিয়ে প্রাণ খুলে গান গাইছে। আর রঘু কুস্তি করছে, লাঠি খেলছে, ডন বৈঠক দিচ্ছে। এর মধ্যেই তার থলথলে ভুঁড়ি উধাও হয়েছে, গোলগাল মুখ ভেঙে চওড়া হয়ে উঠেছে চোয়ালের হাড়, ছাতি বেড়ে গেছে অনেকখানি, হাতের গুলি শক্ত হয়ে উঠেছে। এখন কিষণলাল তার সঙ্গে লাঠি খেলে, রঘু যখন ডান হাতে বাঁ হাতে চাকের মতো ঘুরিয়ে তার মার আটকায়—তখন কিষণলাল খুশি হয়ে বলে, বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা।

আর মুরলী সবচেয়ে খুশি।

বলে রঘুয়া, আর-একটু বড় হলে তুই আমাদের সব চাইতে জোয়ান হয়ে উঠবি। কেউ দাঁড়াতে পারবে না তোর সঙ্গে। এসব ভালো—খুব ভালো। কিন্তু—

কিন্তু যেই রাত হয়, বনের ওপর কালো ছায়া নামে, তারপর গাছপালাগুলো অন্ধকারে ভুতুড়ে হয়ে যায়, তখন রাঘবের মনের ওপরেও ছায়া পড়তে থাকে। আরো রাত বাড়ে, ঝাঁ ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠে সমস্ত বনটাকে যেন করাতের মতো চিরতে থাকে। কোথায় কী-সব পাখি ডাকে কুক্ কুক্ কুক্! মোটা গলায় মধ্যে মধ্যে হুতোম প্যাঁচা সাড়া তোলে, শেয়ালের আলাপ আসে, আর কখনো কখনো সব ছাপিয়ে অনেক দূরে গুমগুম করে শোনা যায় বাঘের ডাক।

সেই তখন—

রাঘবের ভয় করে? না!

কান্না পায়—মার কথা মনে পড়ে বাবার জন্য ভারি কষ্ট হয়। বাবার যে-সব কথা সে তখন শুনেও শুনত না, সেইগুলোও তার কানে বাজতে থাকে: তুই আমার

একমাত্র ছেলে, তোর ওপরেই তো আমার সব ভরসা। দু-দিন পরে বুড়ো হয়ে যাব—দোকানপাট আর দেখতে পারবো না—তখন তুই ছাড়া কে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে? কে আমাদের দেখবে? কে দু-মুঠো খেতে দেবে? তুই মানুষের মতো মানুষ হ—তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবার জন্যে আমার শেষ পয়সাটা অবধি আমি খরচ করব।

আরো মনে পড়ে, ক্লাসে মাস্টারমশাই বিলেতের কোন এক বড়লোকের গল্প বলেছিলেন। তাঁর বাবাও ছিল সামান্য দোকানদার। একদিন তাঁর অসুখ করেছিল, ছেলেকে বললেন, 'তুই আজ দোকানে যা!' আদুরে ছেলে জবাব দিলে, 'এত রোদ্দুরে আমি যেতে পারব না।' বাবা আর একটি কথাও বললেন না—সেই অসুখ নিয়েই রোদের মধ্যে দোকানে চলে গেলেন। বড় হয়ে সেই ছেলেটির সেজন্যে এত অনুতাপ হয়েছিল যে রোজ দুপুরে তিনি মাথার টুপি খুলে কিছুক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেবেলার সেই অপরাধের শাস্তি নিতেন।

বাবার কথা—মাস্টারমশাইয়ের কথা তখন রঘুর এক কান দিয়ে ঢুকে আর-কান দিয়ে গুলতির গুলির মতো ছিট্‌কে বেরিয়ে অন্য কানে গেছে। সকালে ঘুম ভেঙেই ভাবত এখন কী খাব। সরপুরিয়া না সরভাজা? দুপুরে থালার পাশে বারোরকম রান্না সাজানো থাকত। বিকেলে পাঁচ-সাতটা চম্‌চম্‌ আর এক ভাঁড় রাবড়ি তো ছিল বাঁধা জলযোগ। আর রাত্তিরে—খাওয়া—খাওয়া আর খাওয়া। ও-ই তখন একমাত্র লক্ষ্য, যাকে বলে ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা। কে শুনছে বাপের কথা,—মাস্টারের কথা। চিরজীবন এমন করে খেয়েই দিব্যি কেটে যাবে।

—কিন্তু রাতের বেলা বনের মধ্যে করাত চেরার মতো আওয়াজ করে যখন ঝিঁঝি ডাকে, যখন বাঘের ডাকে সমস্ত বলরামপুরের জঙ্গল গুম্‌গুম্‌ করে ওঠে, যখন একা খাটিয়ায় রাঘবলালের আর ঘুম আসে না—তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। তারও সেই টুপি খুলে রোদ্দুরে দাঁড়াবার মতো একটা কিছু করতে ইচ্ছে হয়। যদি সে কোনদিন বাড়ি ফিরতে পারে তা হলে খাওয়ার কথা আর ভাববে না। বাবার কথা শুনবে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চেষ্টা করবে।

অথচ, ফিরতে সে কি কোনদিনই পারবে আর? বুন্দা সিংয়ের চোখ এখন হাজার হাজার জোনাকি হয়ে পাহারা দেয়—এই বন থেকে সে প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারবে না। ভয়টা আরো ঘন হয়ে রাঘবের বুকে চেপে বসতে চায়, যখন অনেক রাত পর্যন্ত গোল হয়ে বসে দলবল নিয়ে বুন্দা সিং চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে আলোচনা করে। তখন ওদের মুখগুলোকে মানুষের বলে বোধ হয় না—বাঘের মতো দেখায়।

রাঘব বুঝতে পেরেছে, ওরা কী একটা ভয়ঙ্কর ডাকাতির মতলব আঁটছে। আর তখনই রঘুর রক্ত আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তার জীবন ডাকাতের দলেই কাটবে। যারা মানুষ মারে, লুট করে! ফাঁসীর আসামী হয়—দ্বীপান্তরে যায়!

মুরলীকে জিজ্ঞেস করে: কী করে ভাই?

মুরলী বলে, জানি না।

—চল না পালাতে চেষ্টা করি।

—কালী মাঈজীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবে।

—সেও ভালো। কিন্তু কিছুতেই ডাকাত হতে পারব না!

মুরলী একটু চুপ করে থাকে। ওর চোখ দুটো ছল-ছল করে।

—পালিয়েই বা কী হবে? তোর নয় ঘর আছে—আমার কে আছে? আমি কার কাছে থাকব?

—কেন, আমাদের বাড়িতে যাবে। আমার মা-বাবা খুব ভালো লোক, তোমাকে

www.boiRboi.blogspot.com

কত আদর করবে দেখে নিয়ো।

মুরলী আবার চুপ করে থাকে। তারপর বলে, না সর্দারকে ছেড়ে আমি যাব না।

—তুমি সর্দারকে ভক্তি করো? ঐ রকম ভয়ঙ্কর লোকটাকে?

—জানি না। খুব ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। কোন্‌ গ্রাম—বাপের নাম কী, কিছুই মনে নেই। কিন্তু সেই থেকে সর্দার আমায় মানুষ করেছে। নেমকহারামি করতে পারব না আমি।

রাঘব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মুরলীর দিকে। এই ছেলেটাকে সে বুঝতে পারে না।

এমন সময় হয়ত দাঁত বের করে এসে হাজির হয় ভুট্টারাম। লোকটাকে দেখলে গা জ্বলে যায়।

—কী মতলব আঁটা হচ্ছে দু'জনে? খৈনি-খাওয়া কালো কালো দাঁত দেখিয়ে ভুট্টারাম জানতে চায়। মুরলী বলে, তা দিয়ে তোমার কী দরকার?

—দরকার কিছুই নেই, কিন্তু এই রঘুয়াটা ভারি বদমাস। একদিন আমি ওর বদন বিগড়ে দেব।

রঘু মুরলীর পাশে সরে আসে। মুরলী বলে, কেন কী করেছে ও?

—আমার গায়ে সজারু ছেড়ে দিয়েছে।

—আর তুমি ওর খাটিয়ায় ব্যাঙ ছেড়ে দাওনি?

—চুপ রহো—ভুট্টারাম খৈনি-খাওয়া দাঁতগুলোকে খিঁচিয়ে: তু ভি পহেলা নম্বর কা বিচ্ছু!

—একদম জানসে মার দেগা।

—তো আও—

ভুট্টারাম নাকটা ফুলিয়ে গর-গর করে ওঠে। একবার হাঁটু দুটো থাবড়ে তৈরি হয় কুস্তিগিরের মতো, তারপর বুনো মোষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ওদের দিকে।

ঠিক তক্ষুনি চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—হাঁ হাঁ—দেখো দেখো ভুট্টারাম! তোমার পায়ের কাছে একটা কাঁকড়া বিছে।

—আরে বাপ্‌! বলে ভুট্টারাম তিড়িং করে লাফ মারে একটা, আর সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ডাঙাতে পা পিছলে দড়াম করে রাম-আছাড়।

তখন রঘু আর মুরলীকে কে পায়? হাসতে হাসতে দু'জনে টেনে দৌড়। আর ওদের ধরতে না পেরে পেছন থেকে চেঁচিয়ে গাল দিতে থাকে ভুট্টারাম: একদম মার দেগা—জান লে লেগা—টিকি উখার দেগা। ই বাত হম অভি কহ দেনা—হুঁ—হুঁ।

দুপুর বেলা কে যে কোন দিকে চলে যায়, রঘু বুঝতে পারে না। এই পোড়ো বাড়িটা অন্ততঃ ফাঁকা হয়ে যায় তখন। কিষণলাল কি ভুট্টারামের মতো দু-একজন হয়ত বা খাটিয়া পেতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। বাকি মানুষগুলোর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। এমন কি মুরলী পর্যন্ত কোথায় যেন কোন দিকে চলে যায়। তখন রঘু আপন মনে বেড়াতে বেরোয়।

খুব ঘন বন যেদিকে—সেদিকে যায় না। সেই চিতাবাঘটার কথাটা এখনো মনে আছে তার—সে কি সহজে ভোলবার মতো? মানুষের পায়ে-চলা পথ লক্ষ করেই সে এগোয়। দেখে ফুল ফুটেছে, পাখি ডাকছে, খরগোস ছুটে পালাচ্ছে। রঘুর

মনে পড়ে স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটাকে। গঙ্গার ধার দিয়ে লাল কাঁকরের পথ—তার দু ধারে ঝাউয়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ আর কৃষ্ণচূড়ার ফুলে একাকার।

সব এখন স্বপ্নের মতো লাগে।

আজও রঘু এমনি করে নিজের মনে চলেছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এ কী! এ কোথায় এল সে!

একটা পুরোনো মন্দির, তার গা বেয়ে বটগাছ উঠেছে। তবু মন্দিরটা বেশ পরিষ্কার—মনে হয় লোকের আসা-যাওয়া আছে এখানে। মন্দিরের সামনেই একটা দিঘি, পদ্মফুলে আর কলমিশাকে ছাওয়া। আট-দশটা ফাটল ধরা সিঁড়ি নেমে গেছে সেই দিঘিতে।

বেশ জায়গাটা তো।

রঘু গুটি-গুটি পায়ে মন্দিরের দিকে এগোলো, ভেতরে আধো-অন্ধকার। তবু রঘু দেখতে পেল বেদীর ওপর কালো পাথরের কালীমূর্তি। লকলক করছে লাল টকটকে জিভ—চোখ দুটি কিসের তৈরি কে জানে—যেন ঝক-ঝক করে জ্বলছে। হাতে টিনের খড়্গ নয়, আসল খাঁড়া একখানা—তার এক কোপে মানুষের গলা নামিয়ে দেওয়া যায়।

তাহলে এই সেই বুন্দা সিংয়ের কালী মন্দির! দরকার হলে যেখানে সে নরবলি দিতে পারে।

কালীমূর্তিকে প্রণাম করবে কি—এখান থেকে এখন ছুটে পালাতে পারলে বেঁচে যায় রাঘবলাল। কিন্তু পালাতে পারল না। কে যেন দুটো গজাল ঠুকে তার পা-দুটোকে সেইখানে আটকে দিলে।

রঘু দেখল, ঠিক যেন কালীমূর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে এলো স্বয়ং বুন্দা সিং।

—রঘুয়া! বাজের মতো গলায় বুন্দা সিং ডাকল। রঘু কাঠ। গলা দিয়ে তার স্বর ফুটল না।

—তু হিয়াঁ আয়া কেঁও?—বুন্দা সিংয়ের চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল: কাঁহে?

বুন্দা সিং যে ভাবে পা বাড়ালো তাতে মনে হল, এখুনি সে দুটো সাঁড়াশির মতো হাত দিয়ে গলা টিপে ধরবে। রঘু একভাবে দাঁড়িয়ে রইল—যেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক তখুনি রঘু চেঁচিয়ে উঠল: সর্দার, সর্দার,—তোমার মাথার ওপর সাপ।

লাফিয়ে সরে গিয়ে বুন্দা সিং দেখে, ফাটা দেওয়ালের ভেতর দিয়ে একটা গোখরোর ফণা দুলছে। আর একটু দেরি হলেই তার কপালে ছোবল বসিয়ে দিত।

তীরবেগে কালীর হাতের খাঁড়াটা খুলে নিয়ে বুন্দা সিং—এক কোপ—সাপের মাথাটা তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল। আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল বুন্দা সিংয়ের।

—তোকে মাপ করলাম। আর তুই আজ আমার জান বাঁচালি। এ-কথা কোনদিন আমি ভুলব না।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ নয় ॥

রাঘবের ভয় তখনো কাটেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল, কুচকুচে কালো সেই সাপটার প্রকাণ্ড শরীরটা দেওয়ালের ফাটলের ভেতর থেকে বাইরে ঝুলে পড়ছে একটু-একটু করে—তখনো থর-থর করে কাঁপছে। তার কাটা গলা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। তারপর এক সময়ে ঝুপ্ করে এক বাণ্ডিল দড়ির মতো সাপটা মেঝের ওপর খসে পড়ল।

বুন্দা সিং কয়েকটা শুকনো ফুলপাতা কুড়িয়ে খাঁড়াটা মুছে ফেলল। কালী-মূর্তির হাতে সেটা আবার বসিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালো রাঘবের পাশে। কাঁধে হাত রেখে ডাকল: রঘুয়া!

রঘু চুপ করে রইল। সর্দার বললে, ঠিক আছে, কালী মাঈজীই আজ তোকে পাঠিয়েছিলেন এদিকে। নইলে ওই সাপটা আমার কপালেই ছোবল বসিয়ে দিত। দুনিয়ার কোন রোজাই আমাকে বাঁচাতে পারতো না।

রঘু হাসতে চেষ্টা করল, হাসতে পারল না। বুকটা তখনো সমানে ঢিপ-ঢিপ করছে তার।

সর্দার বললে, আয় আমার সঙ্গে। দুজনে বনের পথ ধরে আস্তার দিয়ে এগিয়ে চলল।

বুন্দা সিংয়ের কর্কশ গলাটা নরম হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল: তোর মা-বাপের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়?

রঘুর চোখে জল এসে গেল। হাতের পিঠে চোখটা মুছে বললে, হুঁ।

—ফিরে গিয়ে কী করবি?

—ভালো করে লেখাপড়া শিখব। ইস্কুলে যাব।

—বাপের দোকানে মিঠাই চুরি করে খাবি না? রসগোল্লা, মোণ্ডা, দহি, ছানার জিলাপি।

তা যদি না হত, তা হলে কি সে এই বলরামপুরের জঙ্গলে এমন ভাবে এসে পড়ত! পড়ত এই ডাকাতদলের পাল্লায়?

—না, আর ওসব খাব না।

বুন্দা সিং হেসে বললে, কেন অরুচি ধরে গেল?

—তা নয়। ওসব বেশি খেলে পেটে চর্বি হয়ে যায়, বুদ্ধি মোটা হয়।

—ঠিক বাত! সর্দার একটু হাসল, তারপর গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে লাগল।

রঘু কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলল, শেষে আর থাকতে না পেরে ডাকল: সর্দার!

বুন্দা সিং যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল: কী বলছিস?

—আমায় সত্যিই ছেড়ে দেবে? দেশে চলে যেতে দেবে?

—ভেবে দেখব! সর্দার আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যেন নিজের সঙ্গেই কথা কইতে লাগল সে: জানিস রঘুয়া, আমিও ইচ্ছে করে ডাকু হইনি। কোনদিন যে আমাকে এই পেশা নিতে হবে সে কথা ভাবতেও পারিনি আমি।

রঘু অবাক হয়ে সর্দারের মুখের দিকে তাকালো।

বুন্দা সিং বলে চলল: আমার দেশ কোথায়—জানিস? রাজস্থানে। তুই বাঙাল মুল্লুকে থাকিস, সে দেশের কথা তুই ভাবতেও পারবি না। শুধু বালি আর পাথর। জল নেই বললেই চলে। ফসল একরকম হয়ই না। বড় বড় শহর আছে। রাজা আছে। বড়া বড়া শেঠজী আছে। মন্দির মঞ্জিল আছে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষের কষ্টের শেষ নেই। আমারও খাওয়া জুটত না। আমার মা জয়পুরে ভিখ মাঙতে গিয়ে

এক শেঠজীর হাওয়া-গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরে গেল। তখন আর মাথার ঠিক রইল না—রাগে দুঃখে আমি ডাকু হয়ে গেলাম। পেট ভরে যদি এক বেলাও রুটি খেতে পেতাম তা হলে সব অন্যরকম হয়ে যেত।

রঘু ভয়ে ভয়ে বললে, সর্দার! আমিও ডাকু হতে চাই না। আমায় ছেড়ে দাও।

হঠাৎ বুন্দা সিংয়ের লাল-লাল ভয়ঙ্কর চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

—তারপর কী করবি? বুন্দা সিং গর্জে উঠল: পুলিশের কাছে গিয়ে বলে দিবি আমার দলের কথা? তারা আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি লটকে দিক—এই তোর মতলব?

—না সর্দার।

—না সর্দার? বাঘের ডাকের মতো ফেটে পড়ল বুন্দা সিংয়ের গলা: গোয়েন্দা—সব গোয়েন্দা! কাউকে বিশ্বাস করি না আমি! শোন রঘুয়া! তুই মুরলীর জান বাঁচিয়েছিস, আজ আমাকে বাঁচিয়েছিস। তাই এবার তোকে আমি মাফ করলাম। ফের যদি এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলবি, তাহলে তোকে সোজা কালী মাঈজীর মন্দিরে নিয়ে খতম করে দেব। ইয়াদ রাখ্না—হুঁশিয়ার!

বলেই ঝড়ের মতো বন ভেঙে কোন দিকে এগিয়ে গেল। রাঘবলাল সর্দারকে আর দেখতেও পেল না।

কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। আশ্চর্য মেজাজ বুন্দা সিংয়ের—কিছু বোঝবার জো নেই। এই দিব্যি মিষ্টি মুখে কথা বলছে, তারপরেই হঠাৎ রেগে গোঁ গোঁ করে উঠল; তখন তার মুখ চোখের দিকে তাকায় কার সাধ্যি? মনে হতে থাকে এখন সে জ্যান্ত মানুষ ধরে বাঘের মতো কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেতে পারে!

বেশ বলছিল, নিজের কথা, বলছিল রঘুকে সে ছেড়ে দেবে, কিন্তু একটু পরেই কী যে হল!

রঘু তাকিয়ে দেখল, আড্ডার কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। কিন্তু এখন আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করল না। একটা প্রকাণ্ড আমলকী গাছে অসংখ্য ফল ধরেছে, সরু সরু পাতার আড়ালে গোছায় গোছায় আমলকী সবুজ মার্বেলের মতো ঝুলেছে, কয়েকটা পাকা ফল ছড়িয়ে আছে তলায়। জায়গাটা পরিষ্কার দেখে রঘু সেখানে বসে পড়ল, দুটো আমলকী কুড়িয়ে নিয়ে চিবুতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

এখন বেলা পড়ে এসেছে। রঘুর মনে পড়ল, এই সময় তাদের স্কুলের ড্রিল পিরিয়ড। রঘু ভাল ড্রিল করতে পারতো না। 'অ্যাটেন্‌শন' বললে 'ফল্ ইন্', 'রাইট টার্ন' বললে 'লেফ্‌ট টার্ন' নিত। তখন তার খিদেতে নাড়ী চিনচিনিয়ে উঠেছে, কেবল ভাবছে, বাড়িতে মা আজ কী নতুন খাবার রেখেছে তার জন্যে? কিন্তু কুস্তি লড়ে, লাঠি খেলে রঘু ভাবছে, ড্রিল করার মতো এমন ভালো জিনিসও তার ভালো লাগতো না—এমনি অকর্মা ছিল সে! সাধে কি ফিগার ভুল হলে ড্রিল মাস্টার ধীরেনবাবু এসে তার কান ধরে চাঁটি লাগিয়ে দিতেন?

আবার যদি কখনো ফিরে যেতে পারি—কিন্তু বুন্দা সিং তাকে কি আর ফিরতে দেবে? ডাকু হয়েই বোধহয় তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে শেষ পর্যন্ত।

—আব্ তুমকো মিলা—

রঘু চমকে তাকাতেই দেখল, সামনে ভুট্টারাম দাঁড়িয়ে। রঘু উঠে পড়ল। আর কতগুলো উঁচু উঁচু বিশ্রী দাঁত দেখিয়ে ভুট্টারাম বললে, সেদিন তো খুব চালাকি করে পালিয়ে গেলি মুরলীর সঙ্গে। এখন যদি তোকে পিটিয়ে তুলোধুনো করি—

www.boiRboi.blogspot.com

কী করবি?

সে রাঘবলাল আর নয়—যে প্যাঁচার ডাকে মূর্ছা যেত। ভুট্টারামের কথায় তার গা জ্বলে গেল।

—তুমি আমায় মারবে কেন?

—তুই আমার খাটিয়ায় শজারু ছাড়লি কেন? আমার পিঠ ফুটো হয়ে গেছে।

রাঘবের বলতে ইচ্ছে হল, তোমার তো গণ্ডারের চামড়া, দুটো শজারুর কাঁটায় আর কী হয় তোমার? কিন্তু সে কথা না বলে সে জবাব দিলে: তুমি আমার গায়ে ব্যাঙ দিয়েছিলে কেন?

ভুট্টারাম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, বেশ করেছি। এখন তোকে মেরে আমি হালুয়া করে দেব। দেখি কে বাঁচায়!

রঘু মাথা সোজা করে বললে, খবর্দার!

—খবর্দার! আচ্ছা, দেখো তব্—

দুটো হাত সামনে ছড়িয়ে নিয়ে ভুট্টারাম ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘুর ওপর। রঘু অমনি কাঠবেড়ালির মতো সড়াৎ করে সরে গেল, আর ভুট্টারাম সোজা গিয়ে ধাক্কা খেল আমলকী গাছটার সঙ্গে। চেঁচিয়ে উঠল: আরেঃ বাপ!

রঘু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

ভুট্টারাম আনন্দে হেসে উঠল। উঁচু উঁচু দাঁতগুলো চক্‌চক্ করে উঠল তার। ছোরাটা তুলে সে রঘুর দিকে এগিয়ে গেল—এক্ষুনি ওর বুকে বসিয়ে দেবে।

প্রাণের দায়ে চেঁচিয়ে উঠল রঘু: মুরলী—মুরলী—মুরলী—ভেইয়া—

—কোই নেহি। কোই তুম্‌কো নেই বঁচায় গা—দাঁতে দাঁত ঘষে ভুট্টারাম ছোরাটাকে বাগিয়ে ধরল, কিন্তু ছোরা আর নামল না। তার আগেই কে তার হাত মুচড়ে ধরল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল ভুট্টারাম, ছোরাটা মাটিতে পড়ে গেঁথে গেল।

রঘু দেখল, বুন্দা সিং দাঁড়িয়ে।

বুন্দা সিং একটা প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দিল ভুট্টারামের গালে। ঢাকের চামড়া ফেটে যাওয়ার মতো আওয়াজ উঠল একটা। আর একটা চড় পড়ল, তারপরেই ভুট্টারাম লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মাটির উপরে।

কিন্তু শুয়ে থাকতেও পারল না। একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সর্দার তক্ষুনি দাঁড় করালো তাকে। ভুট্টারামের চোখ দুটো বোজা, সারাটা শরীর তার টলছে। মুখটা ফাঁক হয়ে আছে, রক্ত দেখা যাচ্ছে দাঁতের গোড়ায় গোড়ায়।

সর্দার বললে, সাবাস্ রঘুয়া। সব দেখেছি আমি। চল্ এখন আমার সঙ্গে। আগে ভুট্টারামের বিচার হবে, তারপর দুসরা কাজ।

আজ রাতেই এই বদমাসকে আমি বলি দেব।

ভুট্টারাম সেই অবস্থায় হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

—সর্দার মুঝে মাপ—

মাপ কভি নেহি! এই বাচ্চার সঙ্গে কুস্তিতে হেরে গিয়ে তুই ছোরা বের করিস। চোট্টা, ডর-পোক—বদমাস কাঁহাকা! তোর মতো লোক সঙ্গে থাকলে বুন্দা সিংয়ের দলের বদনাম। তোকে আমি সাবাড় করে দেব।

—সর্দার!

—চোপ রহো! টুঁটি চেপে ধরে যেমন করে বেড়াল ইঁদুরকে ঝাঁকুনি দেয়, তেমনি করেই সর্দার তাকে ঝাঁকি দিলে। বললে, তোকে মরতে হবে। জরুর।

আর তখন রাঘবলালই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বুন্দা সিংয়ের পায়ের কাছে।

—সর্দার, তোমার পায়ে পড়ছি, ভুট্টারামকে এবার মাপ করে দাও।

বুন্দা সিং রঘুর দিকে তাকালো। আর রক্তমাখা দাঁতগুলো বের করে ট্যারা ট্যারা চোখ দুটোকে মেলে ধরে স্বয়ং ভুট্টারাম হাঁ করে চেয়ে রইল রঘুর দিকে—সমস্ত ভয়-ডর-ব্যথা ভুলে গিয়েই।

এমন অসম্ভব ঘটনা জীবনে সে কখনো দেখেনি।

॥ দশ ॥

ভুট্টারামের ব্যাপারটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হল খানিকটা আর বুন্দা সিংয়ের আড্ডায় রঘুর খাতিরও বেড়ে গেল সাংঘাতিক। বাচ্চা তো কেয়া—দেখা ভুট্টারামকে কেউ পছন্দ করত না। লোকটার মন ভারি নিচ, আর ভয়ঙ্কর কুঁদুলে।

কিন্তু সহজেই পার পেল না ভুট্টারাম।

প্রথমে তো রঘুর কাছে মাফ চাইতে হলোই, তারপর দলের মধ্যে থেকে অকারণ গণ্ডগোল বাধানোর জন্যে তাকে পুরো তিন হাত টেনে নাক খত দিতে হল: ম্যায় আয়সা কাম কভি নেহি করুঙ্গা—কভি নেই করুঙ্গা—

তবু আর রাগ রইল না ভুট্টারামের। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল রঘুর দয়াতেই এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সে। নইলে যে রকম খেপে গিয়েছিল বুন্দা সিং তাকে নরবলি দিয়েই ছাড়ত।

সেদিন রাতের বেলা ঘরে রঘুকে একা পেয়ে ভুট্টারাম গুটি-গুটি পায়ে হাজির হল তার কাছে। এ-ভাই রাঘবলাল!

ভুট্টারামের এমন চিনিমাখানো মিহি গলা যে থাকতে পারে এর আগে তা কখনো ভাবাই যায়নি। হাঁড়িচাঁচার মতো বিশ্রী আওয়াজে সে বরাবর চোখ পাকিয়ে ডেকেছে: রঘুয়া!

কিন্তু গলার মোলায়েম আওয়াজেও রঘুর সন্দেহ গেল না। সাবধান হয়ে খাটিয়ার ওপর সোজা পিঠ খাড়া করে বসল। ভুট্টারামকে বিশ্বাস নেই—কী মতলব সে আঁটছে কে জানে!

রঘু বললে, কী চাই আবার?

ভুট্টারাম আবার সেই চিনিমাখানো আওয়াজে জানালো যে বিশেষ কিছুই সে চাইতে আসেনি, রাঘব আজকে সর্দারের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। এই কৃতজ্ঞতাটাই সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

—ঠিক আছে যাও।

—না ভাই রাঘবলাল, এ শুধু মুখের কথা নয়। তোমার দয়ার কথা ভেবে আমি তোমায় কিছু উপহার দিতে চাই।

সে কি! উপহার?

কুর্তার ভেতর থেকে একটা আঙটি বের করে ভুট্টারাম বললে, ইঠো তোমু লে লো ভাইয়া। হাঁ মামলী সোনেকা চীজ।

—আমি সোনার আঙটি দিয়ে কী করব?

—রাখবে তোমার কাছে। সকলকে বলবে ভুট্টারাম মুঝে ই আঙগোটি দিয়া।—বলে জোর করেই রঘুর হাতে গুঁজে দিলে আঙটিটা। রঘু বুঝতে পারল, তাকে উপহার দিয়ে ভুট্টারাম সর্দারের নেকনজর ফিরে পেতে চায়।

—এ তুমি কোথায় পেলে?

—এক ডাকাইতিসে মিলা থা। এক আউরৎ কি হাথসে ছিন্ লিয়া। ভুট্টারাম

হাসল।

অর্থাৎ ডাকাতি করে পেয়েছিল আর একটি মেয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

ভুট্টারাম চলে গেলে আঙটিটার দিকে চেয়ে বসে রইল রাঘবলাল। আঙটিতে একটা লাল পাথর ছিল, সেটি যেন এক ফোঁটা রক্তের মতো হয়ে জ্বলতে লাগলো তার সামনে। একজনের কত আশার জিনিস এই আঙটি—সেটা জোর করে কেড়ে এনেছে। কে জানে তাকে মেরেও ফেলেছে কিনা—যা নিষ্ঠুর লোক ভুট্টারাম। রঘুর চোখে জল এলো।

এই আঙটি হাতে পরবে সে—এমন পাপের জিনিস! নিজের ভবিষ্যতের চেহারাটা যেন আঙটিটার ভেতরে দেখতে পেলো সে। সেও ডাকাত হবে—খুনী হবে—এমনি করে পরের জিনিস কেড়ে নেবে।

রাঘবলাল আর সইতে পারল না। আঙটিটা যেন হাতের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলতে লাগল তার। ওটাকে সে অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রাত তখন কত কেউ জানে না। বনের ওপর থমথম করছে অন্ধকার। আকাশে মেঘ হয়ে গুমোট করে আছে—একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না কোথাও। শুধু করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো আওয়াজ তুলে ঝিঁঝি ডাকছে, পাখির ছানারা ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠছে কখনো। একটু আগেই শেয়ালের ডাক উঠেছিল, অনেক দূরে থেকে গুম্-গুম্ করে বেজে উঠেছিল বাঘের গর্জন। কিন্তু এখন কিছুই শোনা যাচ্ছে না আর।

গরমে ঘেমে নেয়ে রাঘবলাল অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। স্বপ্ন দেখছিল, শনিবারে তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, দুপুরবেলা, বই-খাতা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছে সে। রাস্তায় ধুলো উড়ছে—আমের মুকুল থেকে গন্ধ উঠছে—একটা বকুল গাছের তলায় অনেকগুলো ফুল লাল হয়ে শুকিয়ে আছে।

সেই সময় কে তার কানে কানে ডাকল: রঘুয়া—স্বপ্নের ঘোরে রঘু ভাবল, মা? কিন্তু স্কুলের রাস্তায় মা কেমন করে আসবে?

আবার ডাক এল: রঘু!

রঘু ধড়-মড় করে উঠে বসল। না, স্কুলের রাস্তা নয়। বলরামপুরের জঙ্গলে, সেই ভাঙা বাড়ির ঘরটায় মিটমিট করে জ্বলছে একটা লণ্ঠনের আলো। পাশের খাটিয়ায় মুরলী অঘোর ঘুমে মগ্ন। তাকে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকছে তার গুরু কিষণলাল।

—কী হয়েছে গুরুজী?

আও মেরা সাথ।

কোথায় যেতে হবে? হঠাৎ রঘুর দারুণ ভয় ধরল। সেই কালী মন্দিরে তাকেই বলি দিতে নিয়ে যাবে নাকি এখন?

কিছুই তো বলা যায় না—সর্দারের মেজাজকে একেবারেই বিশ্বাস নেই।

কিষণলাল হাসল: আও কুছ ডর নেহি!

রঘু উঠে এল। তখনও চোখ থেকে ঘুমের ঘোরটা তার ভাঙেনি, তখনো আতঙ্কে বুকের ভেতরটা তার হাপরের মতো ওঠা-পড়া করছে।

কিষণলাল রঘুর হাত ধরে বললে, সর্দার বোলায়া।

—কেন?

—জরুরি কাম হ্যায়। আও!

কিষণলাল ভরসা দিল বটে, তবে রঘুর পা কাঁপতে লাগল। একটা পুতুলের মতোই কিষণলালের পেছনে পেছনে সর্দারের ঘরে এসে ঢুকল সে।

ঘরের মেঝেতে গোল হয়ে বসেছে দলের সব বড়-বড় জোয়ান। মাঝখানে বুন্দা সিং। চাপা গলায় আলাপ চলছে তাদের মধ্যে।

রঘুকে দেখে সর্দারের চোখের দৃষ্টি যেন স্নেহে কোমল হয়ে গেল। বললে, আও বাচ্চা পাহালওয়ান, বৈঠো।

দলের সবাই হেসে উঠল।

রঘু ভয়ে-ভয়ে বসে পড়ল এক কোনায়। এই সব চাঁইদের বৈঠকে কেন যে তাকে ডাকা হয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। চিরদিনই সে আর মুরলী এ-সবের বাইরে থাকে।

সর্দার গম্ভীর হয়ে ডাকল: রঘুয়া।

—কহিয়ে সর্দার! দলে থাকতে থাকতে হিন্দিটা কিছু-কিছু রপ্ত হয়ে এসেছে রাঘবের।

—তোমার সাহস আর বুদ্ধি দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই একটা বড় কাজের ভার দেব তোমায়।

কিষণলাল রঘুর পিঠ চাপড়ে দিলে।

—সাবাস রঘুয়া। সর্দার ডেকে কাজের ভার দিচ্ছে—আজ তুই জাতে উঠে গেলি।

সর্দার বললে, বলরামপুরের জঙ্গলে এই দু-মাস আমরা ঝুট্-মুট্ বসে নেই। একটা বহুৎ ভারি মতলব আমাদের। সব ঠিক হয়ে গেছে এবার। কাল রাত দুটোর সময় ডাক-গাড়ি এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবে, তখন আমরা সেটা লুট করব।

রঘুর চোখ কপালে উঠল।

সর্দার আস্তে আস্তে বলে চলল: সে তো এমনিতে হবে না, সে গাড়ি উলটে দিতে হবে, অ্যাক্সিডেন্ট হবে—দু-চারশো আদমি মরবে—সেই মওকায় অমরা লুট করে নেব সব।

সারা ঘরটা স্থির হয়ে রইল, একটা কথা বলছে না কেউ। কেবল বাইরে থেকে একটানা করাত চেরার মতো ঝিঁঝিঁর ডাক উঠছে। লণ্ঠনের আলো বুন্দা সিংয়ের প্রকাণ্ড মুখখানার ওপরে, ঠিক একটা রাক্ষসের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

—তাই,—সর্দার বলে চলল: লাইনের জোর খুলে দিতে হবে, ফিশপ্লেট সরাতে হবে। বাস্—কাম পাকা।

দলের একজন আনন্দে বলে উঠল: আউর ডাক-গাড়ি কী দৌড় ভি খতম্! বহুৎ রুপিয়া মিল জায়েগা সর্দার—সোনা চাঁদি ভি আ জায়গা।

—হাঁ, আয়েগা। উসি ওয়াস্তে—সর্দার আবার রঘুর দিকে তাকালো। তুমি কাল যাবে তেওয়ারির সঙ্গে। ফিশপ্লেট সরাতে হবে, ওর সঙ্গে কাজে হাত লাগাবে তুমিও। এই কাজই তোমাকে দিলাম। ইয়াদ রাখ্না—তোমাদের কাজের ওপরেই ভরসা—মেল গাড়ি যদি বেরিয়ে যায়, সব বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ, এই জঙ্গলে আর আমরা বেশি দিন থাকতে পাব না—ডেরা ডাণ্ডা তুলতে হবে আমাদের। ক্যা রঘুয়া, পারবে তো?

কিষণলালই রঘুর হয়ে জবাব দিলে। আর একবার শিষ্যের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললে, জরুর। কাহে নেহি? আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি সর্দার, দেখে নিয়ো।

কিন্তু একটা কথাও বলতে পারল না রাঘব। সারা শরীরটা তার জমে পাথর

হয়ে গেল, কপাল বেয়ে দর-দর করে নামতে লাগল ঘামের স্রোত। মনে হতে লাগল যেন হাত-পা বেঁধে তাকেই কেউ একটা ছুটন্ত মেল ট্রেনের চাকার তলায় ফেলে দিয়েছে।

॥ এগারো ॥

সমস্ত দিনটা রঘুর যে কী ভাবে কাটল, সে শুধু রঘুই জানে। রাত্রে যখন সর্দারের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল তখন তার সামনে সারা পৃথিবীটা ঘুরছে। সবাই যত বলছে, 'সাবাস রঘুয়া,' ততই তার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে।

সর্দার তাকে সম্মান দিয়েছে। এমন বাচ্চা বয়সে এত বড়ো খাতির এর আগে কেউ পায়নি—এমন কি মুরলীও না। ভুট্টারাম তো ওদের চাইতে বেশ বড়, তবু তাকে কোন বিশেষ কাজে সচরাচর ডাকা হয় না। আর রাঘব এই দু-মাসের মধ্যেই একেবারে সর্দারের নিজের লোক হয়ে গেছে, কিষণলাল তো তার নাম করতে অজ্ঞান!

কাজটা কী? সব চাইতে দরকারি কাজ—অর্থাৎ মেল ট্রেন আসবার একটু আগেই লাইনের জোড় খুলে দিতে হবে। তারপর গাড়িটা উল্টে পড়বে, কয়েকশো মানুষের প্রাণ যাবে, আর সেই ফাঁকে বুন্দা সিংয়ের দলবল গাড়িটা লুট করে নেবে।

খুন? শুধু খুন নয়—কতকগুলো নিশ্চিন্ত নিরীহ মানুষ, কত বাচ্চা ছেলে, কত মা, কত বুড়োবুড়ি প্রাণ হারাবে। যারা বাঁচবে, কারো হাত কাটা যাবে, কারো পা উড়ে যাবে। এত বড় অন্যায় কি আর আছে? রাঘব কি কখনো এমন পাপ করতে পারে।

একবার ভাবল মুরলীকে জাগিয়ে সব বলে, কিন্তু মুরলী কী করবে? সে যে কিছুতেই এ কাজ করতে পারবে না—একথা সর্দারকে গিয়ে বলবার জো নেই। বুন্দা সিংয়ের হুকুম না মানলে—তা হলে কী করবে রঘু? পালাবে?

পালানোটা হয়তো এখন একেবারে অসম্ভব নয়। সবাই তাকে বিশ্বাস করে, কেউ আর তার ওপর নজর রাখছে না। আজ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর কালই এখানকার আস্তানা তুলে ফেলবে বলে বাড়ির সামনেও কোন পাহারা নেই। রঘু পালাতে পারে, সহজেই পালাতে পারে এখন।

সেই কখন বন কাঁপিয়ে, শেয়ালের ডাক উঠেছিল, এখন আবার ডাকল। তার মানে, রাত দুটোর কম নয়। এই সুযোগ। এদের সঙ্গে দু-মাস কাটিয়ে রাঘবের এখন আর রাতকে ভয় নেই। সে দেখেছে মানুষের চাইতে বড় কেউ নয়, দুনিয়ার সব জন্তু-জানোয়ার মানুষকেই ভয় করে চলে। যার গায়ে জোর আছে, মনে সাহস আছে—কোন অন্ধকার, কোন সাপ, বাঘ তার পথ আটকাতে পারে না।

রঘু নিজে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওদিকের খাটিয়ায় মুরলী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এখান থেকে চলে গেলে ওর জন্যে মধ্যে মধ্যে রঘুর ভারি খারাপ লাগবে—ছেলেটা সত্যি-সত্যিই ভালোবেসেছিল ওকে। মুরলীর মা-বাবা কেউ নেই—যাওয়ার কোন জায়গা নেই—এদের দলে থেকেই হয়তো ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে একদিন, নইলে কালাপানিতে গিয়ে পাথর ভাঙবে।

মুরলীকে যদি সঙ্গে করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায় তো কেমন হয়? যদি বাবা-মার কাছে গিয়ে বলে, আমার একটি ভাই এনেছি, তোমরা ওকে আমার মতো করে মানুষ করো—তাহলে কী হয়? মাকে সে জানে—মা খুশিই হবে। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

বাবা? তার বাবাও তো ভালো লোক। শহরের সবাই বলে, রামগর্জন সিং খুব সাচ্চা আদমি, সে কখনো পচা মিঠাই বিক্রি করে না, কোনদিন কাউকে ঠকায় না। তবু রাঘব পেটুক বলেই তাকে মাঝে মাঝে গালমন্দ করত আর নেহাত সইতে পারেনি বলেই তো অমন করে একটা রামলাঠি নিয়ে তাকে তেড়ে এসেছিল। এখন সে বুঝতে পারে কী বিশ্রী লোভী ছিল সে, আর রাতদিন পেট পুজোর কথা ভাবলে মানুষ কত অপদার্থ হয়ে যায়। ভালো মানুষ বলেই রামগর্জন তাকে এতদিন বাড়িতে রেখেছে। আর কারো বাপ হলে কবে পিটিয়ে রাস্তায় দূর করে দিত।

তা হলে মুরলীকে নিয়েই যাবে সঙ্গে করে? তাদের তো কোন অভাব নেই। মুরলী তার আপন ভাইয়ের মতোই তো কাছে থাকতে পারবে।

ডাকবে মুরলীকে?

কিন্তু ডাকতে সাহস হল না। যদি মুরলী যেতে রাজি না হয়? যদি জানাজানি হয়ে যায়। থাক, দরকার নেই।

রঘু দরজা খুলল নিঃশব্দে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাকে ঝম-ঝম করছে বন। কী অন্ধকার চারদিকে! আকাশে এক টুকরো চাঁদ হয়তো ছিল, কিন্তু গভীর কালো মেঘের তলায় সেটা ডুব দিয়েছে। আর সেই অন্ধকারে হাজার-হাজার জোনাকির সবুজ আলো জ্বলছে আর নিবছে। একবারের জন্যে রঘুর হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে গেল, মনে হলো ওরা যেন বুন্দা সিংয়ের হয়ে লাখ-লাখ চোখ মেলে পাহারা দিচ্ছে—এখনি বিকট স্বরে আকাশ কাঁপিয়ে উঠবে—'সর্দার পালাচ্ছে, পালাচ্ছে—পালাচ্ছে—'

রঘু থমকে দাঁড়াল।

সর্দারের ভয়ে নয়, আর একটা কথা তার মনে পড়েছে।

সে তো পালাবে! কিন্তু তারপর?

সর্দারের মেল গাড়ি লুট করা তো বন্ধ থাকবে না, লাইনের জোড় খোলবার জন্যে লোকের অভাব ঘটবে না কোথাও। তেওয়ারি তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে-কেউ চলে যাবে। গাড়ি ঠিকই ওলটাবে, মানুষ মরবে, আর—

রঘুর মনে হল, সে তো পালাচ্ছে না—এতগুলো লোককে মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজের ঘরে চলে যাচ্ছে। কালকের মেল গাড়িতে তার বাবাও যে থাকবে না—এ-কথাই বা কে জোর করে বলতে পারে? রঘু তো জানে, তার বাবাও নানা কাজকর্মে অনেক সময় রেলে চেপে কোথায় কোথায় চলে যায়!

কী করা যায়?

কোথাও থানায় গিয়ে খবর দেওয়া যায়, পুলিশের লোক ডেকে এনে বুন্দা সিংকে দলবলসুদ্ধ ধরিয়ে দেওয়া চলে আজই। সকলেরই এই ঘুমন্ত অবস্থায়। কিন্তু তাই কি পারে রাঘবলাল? হোক ডাকাত, তবু তো বুন্দা সিং তাকে ভালোবাসে, তাকে বিশ্বাস করে—শুধু নিমকহারামি করতে পারবে না।

তা হলে?

হঠাৎ আকাশের কালো মেঘে খানিক বিদ্যুৎ চমকালো, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে রঘুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাদের স্কুলের একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ব্রজবাবু। ছেলেরা তাঁকে খুব পছন্দ করত আর তাঁর ক্লাসে রঘুর মতো বোকা ছেলেও কান খাড়া করে এক মনে বসে থাকত।

ব্রজবাবু পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছেলেদের নানা গল্প বলতেন। সেই গল্পেরই একটা রঘুর মনের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল।

একটি ছোট ছেলে দেখল, রেলের পুলটা বর্ষায় ভেঙে গেছে আর সে খবর না জেনেই একখানা রেলগাড়ি ঝক-ঝক করে ছুটে আসছে সেই পুলের দিকে। তখন

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলেটি করলে কী—

রঘুর ভাবনা যেন সঙ্গে সঙ্গে সব কথার জবাব পেয়ে গেল। না, সে পালাবে না, তার চাইতে ঢের বড় কাজ তার করবার আছে। সে-কাজ শেষ না হলে তার ছুটি নেই। তার জন্যে যদি তার প্রাণ যায়—সেও ভালো।

রঘু বুক ভরে একবার বাইরের ভিজে ভিজে বাতাস টেনে নিলে শ্বাসের সঙ্গে—একবার চোখ ভরে দেখল অন্ধকারে লাখো লাখো সবুজ জোনাকি জ্বলছে। তারপর দরজাটা আবার বন্ধ করে নিজের চারপাইতে ফিরে এল। শুতে পারল না, সারা রাত ঠায় বসে রইল আর শুনল, জঙ্গলের ওপার দিয়ে ঝড়ের আওয়াজ তুলে একটা ট্রেন ছুটে যাচ্ছে।

সেই ডাকগাড়ি!

পরের দিনটা রঘুর যেন আর কাটতে চায় না। মাথার ভেতরে সমানে ঝিমঝিম করে চলল, গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল বার বার। ভালো করে সে খেতে পারল না, মন ভরে মুরলীর সঙ্গে গল্প করতেও পারল না।

মুরলী বললে, কী হল রে রঘুয়া?

—কুছ নেহি।

আজ রাতে কী একটা ভারি কাজ হবে—মুরলী ফিসফিসিয়ে বললে, সব তৈরি হচ্ছে।

তা হলে মুরলীকে এখনো কিছু বলেনি সর্দার! রঘু চুপ করে রইল।

মুরলী আবার বললে, তোর ভয় হচ্ছে না রঘুয়া?

রাঘব আস্তে আস্তে বললে, যা হওয়ার হবে, মিথ্যে ভয় করে লাভ কী?

—এ হি তো ঠিক বাত! মুরলী বললে, আমার অবশ্য গোড়াতে খুব ভয় করত। এখন ভালোই লাগে।

—না-হক মানুষ মারতে ভালো লাগে?

ফস করে রাঘব জিজ্ঞেস করে বসল।

মুরলী কেমন থতমত খেয়ে গেল। বললে, না, খুন জখম নয়। তবে অনেক রুপেয়া আউর জেরবাৎ (গয়না) মিলে—

—এই টাকা-গয়না দিয়ে কী হবে মুরলী?

মুরলী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, ইয়ে সওয়াল তো ঠিক হ্যায়, লেকিন—

লেকিন?

মুরলী আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। যেন কী জবাব দিবে খুঁজে পাচ্ছে না।

রঘু বললে, এখন হাতে কোন কাজ আছে মুরলী?

কুছ না কুছ না। কাজ কালো যো কুছ হোবে সে তো রাতের খেলা। এখন ছুট্টি।

—তা হলে চল, বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় যাবি?

—বনের ভেতর।

—বনের ভেতর! যদি বাঘ আসে?

—কিছু হবে না। রঘু হাসল: ডাকুকে বাঘেও ভয় পায়।

মুরলীও হাসল: চল তা হলে।

দুজনে বেরিয়ে পড়লো। ভিজে-ভিজে কালো মাটির ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা পথ—বুন্দা সিংয়ের দলের মতোই দুজন বেপরোয়া মানুষ চলাচল করে

কেবল তা দিয়ে। সরকারি জঙ্গল হলে হয়তো সরকারের লোকজনের আসা-যাওয়া থাকত, গাছের গায়ে নম্বর পড়ত, একটা জঙ্গল-অফিসও থাকতো হয়তো। কিন্তু এই বনের মালিক কোন এক রাজা বাহাদুর—অনেক আগে বড়-বড় সাহেবদের নিয়ে শিকার খেলতে আসতেন—এখন সে-সব বন্ধ হয়ে গেছে। জঙ্গল পড়ে আছে—খুশি-মতো কাঠুরিয়ারা এসে বাইরে থেকে দুটো-চারটে গাছ কাটে, কিন্তু বাঘের ভয়ে কেউ সাহস করে ভেতরে ঢোকে না। তাই বুন্দা সিংয়ের পক্ষে একটা চমৎকার আস্তানা এই বলরামপুরের জঙ্গল। রাজাদের কালী বাড়িতে এখন ডাকাতেরাই পুজো চড়ায়।

দু'জনে চলতে লাগল। এখানে-ওখানে থোকায় থোকায় আমলকি যেন সবুজ ফটিকের গুচ্ছের মতো দুলছে। ভাঁট ফুল ফুটেছে—হলদে-লাল আরো নানারকম অজানা ফুলে ছেয়ে গেছে ঝোপঝাড়, মাটির বুক থেকে এক-একটা নীল আলোর মতো জেগে উঠেছে ভুঁই চাঁপা। কয়েকটা পলাশ-শিমুল লালে লাল। বনে বসন্ত।

রঘুর মনে পড়ল, এই সময় সরস্বতী পুজো হয়ে যায়—স্কুলের প্রতিমাকে তারা পলাশ ফুল দিয়ে ঢেকে দিত; তারপর আসত দোল। সেই আবির-পিচকারি-কুমকুম নিয়ে সারাদিন কী আনন্দ। রঘুর মাথায় টুপি পরিয়ে, গায়ে রং আর কালি-ঝুলি মাখিয়ে ছেলেরা তাকে হোলির রাজা সাজাতো—সবাই তাকে ঠাট্টা করতো। কিন্তু এখন তার মনে হল, এদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার দোলের রাজা সাজতে পারাও কত সুখের—কত আনন্দের ব্যাপার।

মুরলী বললে, এই রঘুয়া—কী ভাবছিস?

—কিছু না।

—আয়, বসি কোথাও।

—বোস্।

এক জায়গায় অনেকখানি জুড়ে প্রকাণ্ড একটা গাছ দাঁড়িয়ে। মোটা মোটা অসংখ্য শিকড় মাটি ফুঁড়ে উঠেছে তার। গাছটায় ফিকে লাল রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র; একটা মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বনে, হাওয়ায় বৃষ্টির গুঁড়োর মতো পাপড়ি ঝরছে। অসংখ্য খুদে মৌমাছির ভিড় জমেছে গাছটাতে। দু'জনে তারই দুটো শিকড়ে বসে পড়ল।

—আচ্ছা মুরলী?

—কি রে?

—আজ রাতে একটা ডাকাতি হবে কোথাও—না?

—তাই তো মনে হচ্ছে।—মুরলীকে নির্বিকার মনে হল। এ-সবে এখন আর ওর কিছু বিশেষ আসে-যায় না, অনেকদিন ধরে দলের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর অভ্যাস হয়ে গেছে এ-সমস্ত।

—মানুষ মরবে?

—মরতে পারে দু-চারজন। আবার যদি কিছু গোলমাল না করে সব দিয়ে দেয়, তাহলে কাউকে কিছু বলবে না সর্দার। এদিকে সর্দারের দিল খুব দরাজ।

—আচ্ছা, দলের লোক মরে না কখনো?

—মরে বই কি—ধরাও পড়ে। কভি-কভি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে জবর লড়াই ভি হয়—তখন দু'দলেই পাঁচ-সাতজন ঘায়েল হয়ে যায়। এই তো তিন-মাহিনা আগে—মুরলী অন্যমনস্ক হয়ে গেল: ছাপরা জিলার এক গাঁয়ের মহাজন-বাড়ি আমরা লুটতে গেলাম। বাড়িতে বন্দুক ছিল, গাঁওবালা আদমি ভি এসে হাজির হল। জোর লড়াই বাধল তখন। ওদের পাঁচ-সাতজন খতম হল, হামাদের তিন-তিন

www.boiRboi.blogspot.com

জোয়ান ভি! মুরলীর চোখে জল এল: জানিস রঘুয়া, ফাগুলাল ছিল আমারই বয়েসী, তোর চাইতেও আমার ভারি দোস্তি ছিল তার সঙ্গে। মহাজনের গুলিতে তার পায়ে এমন চোট লাগল যে এক-পা আর চলতে পারে না। তাকে আনাও যায় না—ফেলে আসাও যায় না। পুলিশের হাতে পড়লে সব হয়তো কবুল করে দেবে। তখন সর্দার কী করলে জানিস? তলোয়ারের এক কোপে একদম জিন্দা ফাগুলালের মাথাটা কেটে নিলে, তারপর সেই মুণ্ডুটা খানিকটা দূরে দরিয়ায়—

—থাক, থাক আর বলতে হবে না—রঘু কান চেপে ধরল।

—এখন শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তোরও অভ্যেস হয়ে যাবে। হয়তো আজ রাতেই দেখবি, আমি ঘায়েল হয়ে পড়েছি—সর্দার তোকেই হুকুম দিয়ে বলবে, এ রঘুয়া, মুরলীকা শির্ কাট্ লে। তোকেও তাই করতে হবে।

—ও-কথা ছেড়ে দে মুরলী—রঘুর যেন দম আটকে এল: আচ্ছা, এই যে দল বেঁধে খুন-ডাকাতি হয়, টাকা-গয়না জোগাড় হয়, তারপর সেগুলো দিয়ে কী করে?

—কেন, ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়।

—তারপর?

—সবাই নিজের-নিজের ভাগ নিয়ে খরচা করে, ফুর্তি করে। তা ছাড়া যাদের ঘর-বাড়ি দেশ-গাঁ আছে, তারা দো-চার মাহিনার জন্যে বাড়ি চলে যায়—ভাল মানুষের মতো কাজ-কারবারও করে। পুলিশের ঝামেলা কম হলে আবার এসে দল বাঁধে, দু-তিন মাহিনা এখানে ওখানে ডাকাতি করে ফের ঘরে ফিরে যায়।

—ঘরে তাদের মা-বাপ বহিন-ভাই বাল-বাচ্চা আছে?

মুরলী হাসল: হ্যাঁ অনেকেরই আছে। খালি আমি আর সর্দার একদম সাফ। তখন বুন্দা সিং ইয়া বড় এক দাড়ি লাগিয়ে সাধু সেজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে, কোথায় কার ঘরে কেমন সোনা-দানা আছে তার খবর নেয়। আর আমি তার চেলা হয়ে পিছে পিছে বেড়াই।

—তোমাদের কথা আলাদা। কিন্তু যাদের মা-বাপ ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে আছে, তারা কেমন করে মানুষ খুন করে ভাই মুরলী?

—বললুম তো হাত দুরুস্ত্ হয়ে যায়। তখন মুরলি মারা আর মানুষ মারায় কোন তফাত থাকে না।

—আর ধরা পড়লে?

—ফাঁসি কা তক্তা। গলায় দড়ি পরে ড্যাং ড্যাং করে দু-চার মিনিট বহুৎ মজাদার নাচ। ব্যাস উসকে বাদ খেল্ খতম্!—মুরলী হি-হি করে হেসে উঠল আবার। আর রাঘবের মনে হল মুরলী কী অসহ্য নিষ্ঠুর—মন বলে, মায়া-মমতা বলে ওরও বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর।

আজকে রঘুর প্রথম রাত। তারও প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। একজন দু-জন নয়—কয়েকশো নিশ্চিন্ত নিরীহ মানুষকে খুন করে। চমৎকার।

ভাবতে ভাবতে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসে! তাই ভেবে আর দরকার নেই। যা হওয়ার হবে।

রঘু আলোচনাটা ঘুরিয়ে নিলে।

—তোর ছেলেবেলার কথা কিছু মনে নেই মুরলী? বুন্দা সিংয়ের কাছে আসবার আগেকার কোন কথা?

মুরলী যেন চমকে উঠল। তারপর চেয়ে রইল সামনের দিকে—যেখানে পলাশের মাথাগুলো লালে লাল, যেখানে সোনালি আলোয়—লতার জালে কয়েকটা কুল গাছ

ঢাকা পড়ে গেলেও একরাশ লাল-হলুদ পাকা ফল উঁকি মরছে তার ভেতর থেকে। একজোড়া ঘুঘু ওদের সামনেই উড়ে পড়ে মাটি থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল, ওদের বসে থাকতে দেখেও এতটুকু ভয় পেল না, পাখিদের সোনা নেই, টাকা-গয়না নেই—তাই ডাকাতদের তারা ভয়ও পায় না।

—আমার ছেলেবেলা? বচপন? মুরলী যেন ঘুমের মধ্যে থেকে জেগে উঠল: একটু একটু মনে আসে ভাই। যেন স্বপ্নের মতো লাগে। একটা ভৈষাঁর পিঠে চড়ে বাবার সঙ্গে চলেছি। পথের ধারে জলের ভেতর পদ্মফুল ফুটেছে—লতায় লতায় সিঙাড়া ধরেছে। দূরে মহাবীরজীর একটা লাল ঝান্ডা দেখা যায় বটগাছের মাথায়—সেখানে মেলা বসেছে—এতদূর থেকেও মানুষের গলার আওয়াজ শুনি। আমি যেন বাবাকে বলি, বাবা মেলায় গিয়ে আমাকে লাড্ডু আর জিলাবি কিনে দিতে হবে।

—তারপর? রঘুর চোখ চক-চক করে উঠল।

—আবার দেখি: তেমনি ঘুমভাঙা গলায় বলে চল্‌ল মুরলী: কোথায় যেন রামলীলা হচ্ছে। ঢোলক বাজছে, করতাল বাজছে—সীতা মাইজী নেচে নেচে গান করছে, কোত্থেকে চলে এল দুশমন রাবণোয়া। সীতাজীকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বাবার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

মুরলী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: আর কিছু মনে নেই।

—আমার মা-বাবার কাছে যাবি মুরলী?

মুরলী অদ্ভুত উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। জবাব দিল না।

—যাবি মুরলী?

মুরলী হয়তো এবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবার চক্-চক্ করে উঠেছিল তার চোখ দুটো। কিন্তু কোন কথা বলবার সে সুযোগ পেল না। তার আগেই বন কাঁপিয়ে বাঘের ডাকের মতো গম্ভীর গলা ভেসে এল: মুরলী—মুরলী—

দুজনেই চমকে কান খাড়া করল। কে ডাকছে?

আবার লহরে লহরে ভেসে আসতে লাগল সেই ডাক: মুরলী—এ মুরলী? কিধার গিয়া রে তুম?

—সর্দার।

মুরলী লাফিয়ে উঠল। চল্ রঘুয়া, শিগ্‌গির চল্। কী কাজে যেন ডাক পড়েছে।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সে। সাড়া দিয়ে বললে, আতা হুঁ সর্দার, আভি ম্যায় আতা হুঁ—

রাঘব ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল পেছনে পেছনে। পা-দুটো তার আর চলতে চায় না। মুরলীর কাছ থেকে কথাটার জবাব পাওয়া গেল না। আর পাওয়া গেলেই বা কী লাভ হতো? আজকের এই দুঃস্বপ্নের রাতটার পরে রঘুই কি আর কখনো নিজের বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে পারবে?

দিন কাটে—রোজ যেমন কাটে। এরই মধ্যে চলল আলাপ আলোচনা, তলোয়ারে শান দেওয়া বন্দুক পরিষ্কার করা। চাপা উত্তেজনা থমথম করছে চারদিকে। ভুট্টারাম লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে, বহুৎ দিনোঁকে বাদ আজ এক ভারি কাম হোগা!—কিন্তু সেই ভারি কাজটা যে কী সে তা এখনো জানে না। ভুট্টারামের লাফানি দেখে এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাচ্ছে রাঘবের।

একবার কিষণলাল এসে জিজ্ঞেস করল, ভয় হচ্ছে না কি রে রঘুয়া?

—নেহি গুরুজী।

www.boiRboi.blogspot.com

কিষণলাল বললে, বহুৎ আচ্ছা। পহেলি দফে কলিজা সবারই একটু গড়বড়ায়, কিন্তু তোর দেখছি খুব শক্ত। বড়ে খুশিকা বাত।

দিন কাটল, সন্ধ্যা নামল, রাত হল। পোড়ো বাড়িটার ঘরে ঘরে মিটমিটে আলো জ্বলল। অন্য দিন ন-টা বাজতে-না বাজতে জোয়ানের দল খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে, উঠে পড়ে রাত চারটের পরেই। কিন্তু আজ আর কারো চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। সবাই তৈরি হচ্ছে।

এগারোটা—বারোটা—

তখন তেওয়ারি এসে ডাকল: রঘুয়া চল্—

মুরলী অবাক হয়ে বললে, ও কোথায় যাচ্ছে?

—কাম মে! তেওয়ারি হেসে বললে: আও রঘুয়া!

রঘু বেরিয়ে গেল তেওয়ারির সঙ্গে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল মুরলী—ব্যাপারটা এখনো সে বুঝতে পারছে না।

দুজনে দুটো টর্চ নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লে। আজও তেমনি লাখে লাখে জোনাকি জ্বলছে, চারদিকে সেই থরে-থরে অন্ধকার—বনের গাছপালা কন্ধকাটার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু রঘু কিছু টের পাচ্ছিল না। ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে তার কান ভরে বাজছিল নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ।

যেতে যেতে সব বুঝিয়ে বলল তেওয়ারি। রঘু শুনতে লাগল।

তেওয়ারির হাতে যে থলেটি আছে তার মধ্যে রয়েছে হাতুড়ি, সাঁড়াশি, রেঞ্চ এইসব। এইগুলো দিয়ে লাইনের তিন-চারটে জোড় সে খুলে দেবে। রঘু আলো ধরে তাকে সাহায্য করবে।

ব্যস, আধি ঘন্টেকে কাম। এর মধ্যে সর্দার তার দলবল নিয়ে তৈরি হয়ে চলে আসবে। একটু পরেই আসবে ডাকগাড়ি। উস্‌কে বাদ—ওর পরে কী যে হবে, সেটা আর তেওয়ারি বলল না। দু-তিনবার টেনে-টেনে হাসল, আর সেই হাসি শুনেই রঘুর রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

জঙ্গল পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে যেখানে এল, সেখান থেকে স্টেশন প্রায় চার মাইল দূরে। এইখানটাই সবচেয়ে নিরিবিলি; এর ত্রিসীমানাতে জন-মানুষেরও চিহ্ন নেই। তেওয়ারি বললে, ইধার বহুৎ শের (বাঘ) ভি হ্যায়। কিন্তু শেররাও ডাকুকে ভয় করে, তার কাছে এগোয় না।

দু' পাশে ঘন বন, মাঝখান দিয়ে রেলের লাইন চক্‌চক্ করছে। চাঁদ নেই, কিন্তু আকাশ-ভরা তারার আলোয় লাইন জ্বলছে, শাদা শাদা নুড়িগুলো পর্যন্ত ঝিকমিক করছে। তেওয়ারি বললে, হিয়াঁ—

তেওয়ারি বানিয়ে বলেনি। আধঘন্টার মধ্যেই লাইন থেকে দু'জনে গোটা-চারেক জোড় খুলে ফেলল, লোহার বলটুগুলোকে তেওয়ারি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল বনের মধ্যে। বললে, উপরসে কুছ মালুম নেহি হোগা, লেকিন গাড়ি যব্ আয়েগা, তব্—

কাজ শেষ করে দু-জনে জঙ্গলের মধ্যে নেমে এল। খানিকটা যেতেই চোখে-মুখে টর্চের আলো এসে পড়ল একরাশ।

বুন্দা সিং দলবল নিয়ে হাজির।

—হো গিয়া?

—হো গিয়া সর্দার।

—ঠিক হ্যায়।—একবার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল বুন্দা সিং—আউর পন্দরহ্ (পনেরো) মিনট! সব কোঁই এহিঁ বৈঠ্ যাও।

সব ছায়ামূর্তির মতো বসে রইল সেখানে। ঝিঁঝিঁর ডাক বেজে চলল, বনের

পাতায় পাতায় হাওয়া উঠল, দূরে যেন বাঘের ডাকও শোনা গেল একবার। কারো মুখে কোন কথা নেই! মুরলী শুধু একবার ফিসফিস করে ডাকল, রঘু! কিন্তু রঘুকে পাশে দেখতে পেল না, কোথায় যেন উঠে গেছে সে।

ঝম্ ঝম্ ঝম্! চাকার আর লোহার শব্দ—একটা গম্ভীর বাঁশির আওয়াজ। মেল ট্রেন আসছে—দূরের বাঁকটা ঘুরছে। আর তিন মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে জোড়-খোলা লাইনের ওপর।

সর্দার বললে, সব তৈয়ার?

—তৈয়ার?

ট্রেন আসছে—আরো কাছে আসছে। কিন্তু একি! জোড়ের মুখে আসবার ঠিক আগেই জোরালো একটা বাঁশি বাজিয়ে বিকট আওয়াজে থেমে গেল কেন? এমন তো কথা ছিল না। বারো জোড়া চোখ জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বাঘের মতো।

ও কে? টর্চের মুখে লাল কাপড় বেঁধে এখনো লাইনের ওপর দোলাচ্ছে কে? ওই তো গাড়িটাকে ঠিক জোড়ের মুখে থামিয়ে দিয়েছে। ট্রেনের সার্চ-লাইটের আলোয় তাকে চিনতে আর কারুর বাকি নেই।

—রঘুয়া! বেইমান!—এক মুরলী ছাড়া এগারোটা গলা একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।

বৃন্দা সিং বন্দুক তুলল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, পহেলে উস্‌কো খতম কর্ দেনা—

বন্দুক তুলল, কিন্তু ট্রিগার টানতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মন্দিরে সেদিন সাপের হাতে নির্ঘাত মরণ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল রঘু। যো জান দিয়া, উস্‌কো জান লেনা? রাম-রাম। রাজপুত কখনো একাজ করতে পারে?

কিন্তু ট্রিগার টানল কিষণলাল। দুম্ করে শব্দ, নীল আগুনের ঝলক, তারপর একটা চাপা চিৎকার করে রঘু লাইনের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

॥ বারো ॥

ততক্ষণে একটা বিরাট হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে চারদিকে।

ড্রাইভার, ফায়ারম্যান—সব নেমেছে, গার্ড এগিয়ে এসেছেন। ট্রেনের ঘুমন্ত যাত্রীদের কাছেও পৌঁছে গেছে খবরটা। দেখতে দেখতে তিন-চারশো লোক জড়ো হয়ে গেছে সেখানে।

—ক্যা হুয়া?

—হোয়াট্‌স দি ম্যাটার?

—কি হয়েছে—কী হয়েছে?

এঞ্জিনের দিন-করা আলোতে কী যে হয়েছে তা আর বুঝতে বাকি নেই কারুর। মাত্র সাত-আট হাত আগেই লাইনের দু-ধারে নাট-বল্টু আর ফিসপ্লেট ছড়ানো। ঠিক সময়মতো গাড়িটা থেমে না গেলে কী যে হতো তা ধারণাও করা যায় না। মারাত্মক অ্যাক্‌সিডেন্ট হতো—গাড়ি উল্টে পড়ত, কতগুলো মানুষের যে প্রাণ যেতো কে বলতে পারে!

আর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনটাকে যে বাঁচিয়েছে সে—

যেন লাইনের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে রঘু। লাল কাপড়ে জড়ানো টর্চটা

www.boiRboi.blogspot.com

ছিটকে চলে গেছে দূরে, মাথা থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

কে এ? কোথা থেকে এল?

ট্রেনের ড্রাইভার বলল, গাড়িটা থেমে যাওয়ার মিনিট খানেক পরেই সে বন্দুকের মতো আওয়াজ শুনেছে একটা। মনে হয়, পাশের জঙ্গল থেকে ছেলেটাকে গুলি করেছে কেউ!

পাশের জঙ্গল—তা বটে! লাইনের দু-ধারে ঘন কালো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন অন্ধকারের পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই জমাট কালো বনের গায়ে হাজার হাজার জোনাকির আলো লাখ লাখ ভূতের চোখের মতো জ্বলছে আর নিবছে। ট্রেন-থেমে-যাওয়া অদ্ভুত নিস্তব্ধতার ভেতরে তীব্র স্বরে ঝিঁঝিঁর ডাক উঠছে—মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার করাত চালিয়ে আকাশটাকে কারা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে চাইছে।

কে একজন শুকনো গলায় বললে, এ বলরামপুরের জঙ্গল। বাঘ-ভালুক আছে—ভয়ানক জায়গা।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের ভেতর কোথা থেকে এল এই ছোট ছেলেটি—ট্রেনটাকে এমন সাংঘাতিক অপঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে? আর বনের মধ্যে থেকে কে-ই বা তাকে গুলি করে বসল?

চারদিকে তাকিয়ে গাড়ির তিন-চারশো যাত্রীর বুক ছম্-ছম্ করতে লাগল!

যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন ডাক্তার এগিয়ে এলেন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন রাঘবের পাশে।

রঘু একবার নড়ল, একবার চাপা গলায় বললে, মা—তারপরেই আবার নিঃসাড় হয়ে গেল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন। তখনো নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু—

বুকের ডান দিক থেকে রক্ত গড়িয়ে রেলের স্লিপার আর নুড়িগুলো রাঙা হয়ে গেছে। ডাক্তার রুমাল দিয়ে রক্ত মুছে ফেললেন। ঠিক কাঁধের নিচে বিঁধেছে গুলিটা। ডানদিক বলেই বেঁচে আছে এখনো। বাঁ দিক হলে সোজা হৃৎপিণ্ডে চলে যেত।

ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে আমার ডাক্তারি বাক্সটা কেউ নিয়ে আসুন শিগ্‌গির!—দেরি করবেন না—

চার-পাঁচজন লোক তৎক্ষণাৎ তাঁর বাক্স আনতে ছুটল।

আর ঠিক সেই সময়—

ভিড় ঠেলে একটা মানুষ এসে দাঁড়ালো। মেঘের মতো গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে!—ক্যেয়া দেখা ডাক্তার সাব? জিন্দা হ্যায়—ইয়া মর গিয়া?

দু-তিনশো লোকের চোখ এক সঙ্গে তার দিকে গিয়ে পড়ল। বিরাট চেহারা, দুটো আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, বুনো বাঘের মতো ভয়ঙ্কর হিংস্র তার মুখ। কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। লোকটা এমন বীভৎস দেখাতে যে তার দিকে তাকানো মাত্র প্রাণ কেঁপে ওঠে।

সমস্ত যাত্রী তবু আতঙ্কে তারই দিকে চেয়ে রইল। একটা কথা বলতে পারল না কেউ।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে, জিন্দা হ্যায় ডাক্তার সাব?

ডাক্তার বললে, এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু কিছু বলা যায় না। গাড়ি ব্যাক করিয়ে এখুনি একে কোন শহরে নিয়ে যেতে হবে; যেখানে হাসপাতাল আছে। অপারেশন করার পরে বোঝা যাবে সব।

—নাও বাঁচতে পারে?

ডাক্তার বললেন, বলেছি তো, কিছুই বলা যায় না।

সেই বিরাট জোয়ানটা লাইনের ওপর বসে পড়ল—যেন শিকারীর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একটা পাগলা হাতি। তারপর ঝুঁকে পড়ল রঘুর ওপর। ভাঙা গলায় বলতে লাগল: রঘুয়া, রঘুয়া, মুঝে মাপ করে দে! তুই বেইমান নোস—বেইমান এই বুন্দা সিং।

যে জান দেয়, রাজপুত কখনো তার জান নেয় না। রঘুয়া, মুঝে মাফ্ কর দে—

ডাক্তার কেবল সাহস করে কথা বলতে পারলেন—কে—কে তুমি?

আমি ডাকাত বুন্দা সিং, আমিই গাড়ি লুটতে চেয়েছিলাম। বুন্দা সিংয়ের দু-চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগল: এই গাড়িতে কোন পুলিশ নেই? আমাকে গিরেফতার করো—থানে মে লে যাও, আমার ফাঁসি হোক। জান দেনেওয়ালার জান যে নিতে পারে, ফাঁসিকাঠই তার আসল জায়গা।

ডাক্তারের ব্যাগ এসে পড়েছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা নিতেও যেন ভুলে গেলেন তিনি।

'রাঘবের জয়যাত্রা' আমি এই পর্যন্ত লিখছি, এমন সময় ধড়াম করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। লম্বা-চওড়া হাসিমুখ সার্জেন্টটি এসে ঢুকল আমার ঘরে।

দাদা, কী লিখছেন?

আমি হেসে বললুম, তোমাদের কীর্তি-কাহিনীই শোনাচ্ছিলাম রামধনুর ছোট ছেলেমেয়েদের।

—বোসো রাঘব, বোসো।

হ্যাঁ, ঘরে ঢুকেছে রাঘবলাল সিং। সেই পেটুক ক্যাবলা ছেলেটি আর নেই। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি বুদ্ধিতে ঝলমল করছে চোখ-মুখ।

ঘর কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল রাঘব।

—আমার কীর্তি? তা বটে! জীবনে কী দিনগুলোই যে গেছে!

বললুম, সেই দুঃখের অভিজ্ঞতা না হলে তুমি তো মানুষ হতে পারতে না রাঘব! আর সেদিন নিজের প্রাণ দিয়েও তুমি ট্রেনটাকে বাঁচাতে পেরেছিলে বলেই তো ট্রেনের যাত্রী পুলিশ কমিশনারের চোখের ওপর পড়েছিলে। ভালো কথা, বুন্দা সিংয়ের খবর কী?

—ভালই আছে বুড়ো। জেল থেকে বেরিয়ে জয়পুরে যে ছোট দোকানটা করে-ছিল সেটা বড় হয়েছে এখন। আমাকে দেওয়ালির আশীর্বাদ করে পাঠিয়েছে।

—মুরলীর আর কোন সন্ধান পাওনি?

রাঘবের মুখের ওপর ছায়া পড়ল। একবারের জন্য ছল-ছল করে উঠল চোখ।

—আজ পনেরো বছরের ভেতরেও তার কোন খোঁজ পাইনি দাদা! সেই রাতে বলরামপুরের জঙ্গলে সে চিরদিনের মতো মুছে গেছে। হয়তো কিষণলালের সঙ্গে থেকে এখনো ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, হয়তো কোথাও পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে, হয়তো বা সর্দারের মতো ভালো হয়ে ঘরে ফিরে গেছে।

রাঘবলাল বললে, জানি না দাদা!

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। আমরা দু-জনেই বিষণ্ণভাবে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সেই সময় ঘরে ঢুকলেন আমার কাকিমা। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড একথালা

মিষ্টি।

—রাঘবের গলার আওয়াজ পেয়ে বিজয়ার মিষ্টি নিয়ে এলুম।

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে কাকিমাকে প্রণাম করলে, তারপর আমাকেও।

—আরে, তাই তো ভুলে গিয়েছিলুম যে! কিন্তু কাকিমা, এ যে প্রায় সের-দেড়েক মিষ্টি! খেতে পারব?

কাকিমা বললে, এমন জোয়ান ছেলে—এ ক'টা খেতে পারবে না কেন? খাও—খাও।

—তোমার বাবার দোকান থেকেই এসেছে।

আমি হাসলুম: তুমি যদিও এখন আর নিজেদের মিষ্টি খাও না—তবু এই ছানার জিলিপিগুলো একবার পরখ করে দেখতে পারো। চমৎকার হয়েছে।

—ছানার জিলিপি! সেই মারাত্মক ছানার জিলিপি!

আবার অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুলে রাঘবলাল খাবারের থালাটা কাছে টেনে নিলে।

www.boiRboi.blogspot.com

রামমোহন

এক

এ কার প্রাসাদ?

দালাই লামার।

কে তিনি?

যাকে জিজ্ঞেস করা হল, এইবার তার চোখ ছানাবড়া! দালাই লামা কে; জানো না? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের দেবতা। তাঁর ইচ্ছেয় চন্দ্র-সূর্য ওঠে—অস্ত যায়। তাঁর আদেশে পাহাড়ে তুষার ঝড় ওঠে—ভূমিকম্প হয়—মহামারী আসে। তাঁর ইচ্ছেয়—

আর বলতে হলো না। সতেরো বছরের বিদেশী ছেলেটি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

চারদিক থেকে একদল রক্তচোখ ঘিরে এল তাকে।

হাসলে যে?

আমি এ সব বিশ্বাস করি না। দালাই লামা একজন মানুষ—শুধুই মানুষ। ওসব কিছুই তার করবার ক্ষমতা নেই। শুধু তোমাদের বোকা বানিয়ে, দেবতা সেজে আরামে দিন কাটাচ্ছে সে।

কে বলে এত বড় পাপ কথা? দালাই লামার নামে এমন অপবাদ কে দিতে পারে? কোন সাহসে? চারদিকের রক্তচোখগুলোতে দপ দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এই অবিশ্বাসী বিদেশীকে তারা হত্যা করবে।

হত্যা তারা করতও। কিন্তু তিব্বতের মেয়েরাও মায়ের জাত। তারাই ছেলেটিকে আড়াল করে রাখল স্নেহ দিয়ে, তারাই তার প্রাণ বাঁচাল।

তুষার ঢাকা হিমালয়ের দুর্গম দুস্তর পথ। প্রতি পদে পদে মৃত্যু যেন ফাঁদ পেতে রয়েছে। মেঘ আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে, চোরা বরফের গহ্বর বাঁচিয়ে, শ্যাওলায় পিছল পাথরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে সমতলের দিকে ফিরতে ফিরতে শুধু একটি কথাই ভাবতে লাগল সেই দুঃসাহসী বিদেশী ছেলেটি।

ধর্মের নামে মানুষের এই মূঢ়তাকে সে দূর করে দেবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর তিব্বতেও নয়—সারা পৃথিবীর কাছে সে প্রচার করবে যুক্তি আর মুক্তির বাণী। মেরুদণ্ডহীন ভীরুদের সে জাগিয়ে তুলবে কঠিন শক্তিতে।

আর, সে কখনো ভুলবে না মায়ের জাতকে। তাদের দুঃখমোচন করাই হবে তার সারা জীবনের সাধনা। দুর্ভাগা বাংলাদেশের দুঃখিনী মায়েদের জলভরা চোখ ছলছল করে উঠল তার চোখের সামনে।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

প্রায় দুশো বছর আগে, ১৭৭৪ সালে।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রায় রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের যেদিন জন্ম হল—সেদিন বাড়িতে আনন্দের সীমা ছিল না। আদর করে ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল রামমোহন।

জমজমাট সংসার। বহুকালের বনেদী জমিদার বংশ—ঐশ্বর্য খ্যাতি আর প্রতাপের তুলনা নেই। পরম বৈষ্ণব আর ভক্ত পরিবার—বাড়িতে রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহ, দুবেলা ঘটা করে সে বিগ্রহের পুজো হয়।

এমন পরিবারে জন্ম নিয়ে রামমোহনের যে এ-হেন মতিগতি হবে কে বুঝতে পেরেছিল সে-কথা?

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আশ্চর্য মেধাবী রামমোহন। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পুঁথির দিকে ঝোঁক। রামকান্ত ভাবলেন, এই ছেলেটিকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে হবে—লেখাপড়া শেখাতে হবে ভালো করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে ইংরেজ সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে তখন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নয়—ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী। তাদের কাজ ভারতবর্ষের নতুন জমিদারি থেকে খাজনা আদায় করা আর ব্যবসা করা।

দেশের শিক্ষা-দীক্ষা সবই তখন চলছে পুরোনো রীতিতে। সেই নবাবী আমলে যেমন চলত। অবস্থাপন্ন হিন্দুপরিবারের ছেলেরা তখন সংস্কৃত আর ফার্সী শিখলেই উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য করা হত তাঁদের।

রামকান্ত ছেলেকে সংস্কৃত শিখতে পাঠালেন কাশীতে। কয়েক বছরের মধ্যেই সংস্কৃতে অদ্ভুত পন্ডিত হয়ে উঠলেন রামমোহন। তারপর তাঁকে ফার্সী শেখাবার জন্যে পাটনায় পাঠালেন রামকান্ত। এত ভালো ফার্সী শিখলেন যে তাঁর নাম হল "মৌলবী রামমোহন"।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই অসামান্য পন্ডিত হয়ে রামমোহন রাধানগরে ফিরে এলেন। শিক্ষার যেটুকু বাকী ছিল তা সম্পূর্ণ হল পালপাড়া গ্রামের বিখ্যাত অধ্যাপক নন্দকুমার কাব্যালংকারের সংস্পর্শে এসে। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এই নন্দকুমার বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কিন্তু এত বিদ্যা, এত জ্ঞান বুদ্ধি কাল হল রামমোহনের পক্ষে। অন্তত রামকান্ত সেই কথাই ভাবলেন।

দেব-দেবীর পুজোয় রামমোহনের আর বিশ্বাস নেই। তাঁর মতে ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। মাটি-পাথরের দেবতাকে পুজো করা মিথ্যে বিড়ম্বনা। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আর ক্রীশ্চানই হোক—এক ঈশ্বরকে যারা নানারূপে দেখে, তারা ভ্রান্ত।

প্রথম প্রথম রামকান্ত ছেলেকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুদিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলে দুর্ধর্ষ তার্কিক। তর্কে বিচারে ছেলের সামনে তিনি দাঁড়াতেও পারেন না।

রামকান্তের ধৈর্যচ্যুতি হল। গর্জন করে বললেন, বিধর্মী, নাস্তিক কুলাঙ্গার। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

পনেরো বছরের ছেলে সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কোথায় গেল—?

ভারতবর্ষকে দেখতে। সত্যের সন্ধান করতে।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখলে ভারতবর্ষকে। কী শোচনীয় কুসংস্কার—কী মূঢ়তা! এক একজন কুলীন তিনশো-চারশো করে বিয়ে করে। এক একটি কুলীন যখন মারা যায়—তখন ছমাসের মেয়ে থেকে ছিয়াশী বছরের বুড়ী পর্যন্ত এক সঙ্গে বিধবা হয়।

দেখতে পেল সতীদাহের বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ। নব্বুই বছরের বুড়ো স্বামীর চিতায় ষোল বছরের স্ত্রীকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে ধূপ-ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রচার করা হচ্ছে—সতী স্বেচ্ছায় হাসিমুখে স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলেন। একটা চমৎকার ঘটনা বলি শোনো।

দিল্লীর এক শেঠজী কোটিপতি। ঘরে তাঁর চার-চারটি স্ত্রী, দলে দলে খিদ্-মদ্গার, হুঁকোবর্দার।

যমুনার ধারে কয়েক শো মণ চন্দন কাঠ দিয়ে হল আকাশ-ছোঁয়া চিতা। চিতায় শেঠজীর সঙ্গে উঠলেন তাঁর চার স্ত্রী। কিন্তু অমন মানী লোকের স্বর্গে গিয়ে চারটি স্ত্রীতেই কেবল কুলোবে কেন? অতএব কয়েকজন ঝি-চাকরকেও স্বর্গে যেতে হল। তাঁর সঙ্গে তামাক সাজবে কে—পা টিপে দেবে কে—হাওয়া করবে কে?

সেইখানেই শেষ নয়। দুটো প্রকাণ্ড আরবী ঘোড়াকেও চিতায় চড়িয়ে দেওয়া হল।

আবার ঘোড়া কেন? বা-রে নইলে শেঠজীর মতো অমন দিক্পাল লোক কিসে চড়ে স্বর্গের দেউড়িতে ঢুকবেন? স্বর্গের দারোয়ানেরাই বা নইলে দুহাত তুলে তাঁকে সেলাম ঠুকবে কিসের খাতিরে!

এমনিই ছিল সে-যুগের কুসংস্কার। আজ আমাদের হাসি পায়—কিন্তু সেদিন রামমোহনের চোখ ফেটে জল এসেছিল দুঃখে লজ্জায় ক্ষোভে। দেখবার আরো অনেক বাকি ছিল। হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ—কিন্তু হিন্দু কোথায়? কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ রামায়েৎ, কেউ গানপৎ। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণা। সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি হিন্দু আছে, কিন্তু কে সেই হিন্দু কেউ সে-কথা জানে না। গঙ্গা-সাগরে সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে দেশের মানুষ ভাবে তার পুণ্যের ভাঁড়ার ভরে উঠলো। ঘরের মেয়েদের অশিক্ষায় আর দুর্গতির মধ্যে ফেলে রেখে তারা মনে করে ধর্মচর্চা হচ্ছে। রাশি রাশি অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থেকে তারা চিৎকার করে শাস্ত্রের বুলি আওড়ায়। বাংলা দেশ থেকে শুরু করে দুরান্তের তিব্বত পর্যন্ত এক দুর্গতি আর একই-মূঢ়তার ইতিহাস।

অসহ্য।

এই ইতিহাস বদলাতে হবে। এই অজ্ঞানতার পাপকে মুছে দিতে হবে চির-কালের জন্যে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চানকে একমন্ত্রে মিলিয়ে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই মিলন-মন্ত্র আসবে এই দেশের 'উপনিষদ্' থেকেই। সংস্কারের অজ্ঞতায় আমরা যা হারিয়েছি, তার পুনরুদ্ধার করবেন তিনি। সেই সংকল্প বুকে নিয়েই চার বছর পরে রামমোহন রায় দেশে ফিরলেন।

তিন

কিন্তু দেশে ফিরেও রামমোহন বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। পরম বৈষ্ণব রামকান্তের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিনই তাঁর বিরোধ বাধে। সংসারের এই অশান্তির ভেতরে রামমোহনের মন ক্লান্ত হয়ে উঠল। কিছুদিন পৈতৃক-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের পর আবার একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর পথে। নিজের ভাগ্য গড়ে

তুলবেন নিজের হাতেই।

কিছুকাল পশ্চিমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। পাটনা ছাড়িয়ে—কাশী ছাড়িয়ে—আরো দূরে, আরো অনেক দূরে। এই ভ্রমণ তাঁর নিষ্ফল হল না। আরো ভালো করে ভারতবর্ষকে দেখলেন, আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় চিন্তার ভাণ্ডার ভরে উঠল তাঁর।

যেখানেই যান—একই দুর্ভাগ্য, একই কুসংস্কার, একই অন্ধতা। রামমোহনের সংকল্প বজ্রের মতো কঠিন হতে থাকে। এই ভারতবর্ষকে তাঁর বদলাতে হবে—নতুন করে গড়ে দিতে হবে এ-দেশের অভিশপ্ত মানুষগুলোকে।

এ তো গেল চিন্তার দিক। কিন্তু কর্মবীর রামমোহন কাজের দিক থেকেও বসে ছিলেন না। নিজের বুদ্ধি আর উদ্যমের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করেছিলেন তিনি।

দু বছর পরে রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮০১ সালে। এখানেই শুরু করলেন কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা। কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত আর নতুন গড়ে ওঠা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সময় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়—এ'দের একজনের নাম জন ডিগ্‌বি। ডিগ্‌বির সঙ্গে পরিচয় রামমোহনের জীবনের একটা মস্তবড় ব্যাপার। কেন, সেকথা পরে বলছি।

রামমোহনের বাবা রামকান্ত রায় তখন বর্ধমান রাজ সরকারে চাকরি করতেন এবং সেখানেই বাড়ী করে থাকতেন। বেহিসেবী রামকান্ত রায় শেষ জীবনে নানা রকম দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অসুখে এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় বর্ধমানে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়।

রায় রায়ানদের আদি বাড়ী লাঙ্গুল পাড়ায় রামকান্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন হল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে রামমোহনকেও আসতে হল দেশে।

কিন্তু রামমোহনের নতুন ধর্মমত নিয়ে গোলযোগ বাধল। রামমোহনের মা তারিণী দেবী তাঁর নাস্তিক ছেলেকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার দিলেন না।

এতদিন সামান্য বন্ধন ছিল, এবার তাও কাটল। একদিকে মায়ের অভিশাপ অন্যদিকে নিজের সত্য। এই দুইটিকে মাথায় নিয়ে রামমোহন চিরদিনের মতো নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

জন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে টমাস উডফোর্ড নামে একজন ইংরেজ কালেক্টারের দেওয়ানি করে সরকারী কাজে রামমোহন কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। এই সব কারণে ডিগ্‌বি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রামমোহনকে নিজের দেওয়ান করে নিলেন।

রামমোহন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর—এই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের কেবল মনিব কর্মচারীই সম্বন্ধ ছিল না। এই ইংরেজ সিভিলিয়ানটি রামমোহনের অসামান্য প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। সেকালে কোনো ইংরেজ অফিসারের সামনে কোনো কালা আদমির চেয়ারে বসবার অধিকার ছিল না। ডিগ্‌বি রামমোহনকে সে অধিকার দিয়েছিলেন।

একদিন কথায় কথায় ডিগবি বললেন, রামমোহন, তোমার ফার্সী আর সংস্কৃতে এত দখল—এমন অসাধারণ পণ্ডিত তুমি! কেন তুমি ইংরেজী শেখো না? কেন তুমি শেকস্‌পীয়ার আর ফ্রানসিস বেকনের আশ্চর্য ভাষা থেকে বঞ্চিত রয়েছ?

এ যুগের দুনিয়াকে জানতে গেলে ইংরেজী না শিখলে চলবে না একথা রাম-

www.boiRboi.blogspot.com

মোহন জানতেন। কিন্তু কে তাকে ইংরেজী শেখাবে? দেশে তখন ইংরেজী শেখার স্কুল নেই—শেখার রেওয়াজও নেই। ফার্সী জানলেই সরকারী চাকরী করা যায়। কে ইংরেজী শেখাবে!

ডিগ্‌বি বললেন, বেশ তো, আমিই শেখাব। রামমোহন তৎক্ষণাৎ রাজী। ছাত্রের মত ছাত্র পেলেন ডিগ্‌বি। ক্ষুরধার মেধা, অসাধারণ নিষ্ঠা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে রামমোহন যে কোনো ইংরেজের মতোই চমৎকার ভালো ইংরেজী বলতে আর লিখতে শিখলেন। ডিগ্‌বি তাঁর জার্নালে এ-সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে রামমোহনের প্রশংসা করে গেছেন। আর রামমোহন তাঁর অসংখ্য ইংরেজী লেখায় এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ স্থায়ী করে গেছেন।

জন ডিগ্‌বি ভাগলপুরে বদলী হয়েছেন, সঙ্গে রামমোহনকেও যেতে হয়েছে। ভাগলপুরে তখন যিনি বিদায়ী কালেক্টর তাঁর নাম স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন। জবরদস্ত, বদমেজাজী, নেটিভ্‌-বিদ্বেষী লোক ছিলেন এই হ্যামিলটন সাহেব। সেদিন রামমোহন পালকি চেপে চলেছেন ভাগলপুরের পথ দিয়ে। রাস্তার ধারে একটা ইঁটের পাঁজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন হ্যামিলটন। তাঁকে সেলাম না করেই একজন কালা আদমী পালকি চড়ে চলে গেল—এই দেখে হ্যামিলটনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। যে যুগে সাহেবদের সামনে দিয়ে মাথার ছাতা খুলে যাওয়ার দস্তুর ছিল না, সে যুগে এতবড়ো গোস্তাকি!

রাগে আগুন হয়ে হ্যামিলটন ঘোড়া ছুটিয়ে রামমোহনের পালকি ধরলেন। তারপর শুরু হল অকথ্য অভব্য গালাগালি।

রামমোহন ভদ্র ভাষায় বোঝাতে চাইলেন যে হ্যামিলটনকে তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু ভদ্রভাষা শোনবার মতো ভদ্রতাও হ্যামিলটনের ছিল না। শেষ পর্যন্ত রামমোহন তাঁর গালাগালিতে কর্ণপাত না করেই পালকি চেপে চলে গেলেন।

কিন্তু তাই বলে এ-অপমান মুখ বুজে সইবেন এমন মানুষ রামমোহন নন। তৎক্ষণাৎ তিনি তখনকার বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এই অসম্মানের প্রতিকার দাবি করে একখানি বিস্তৃত আবেদনপত্র পাঠালেন।

সে আবেদনপত্র ব্যর্থ হয়নি। এর ফলে স্যার হ্যামিলটনের কাছে নির্দেশ এল ভবিষ্যতে কোনো দেশীয় লোকদের সঙ্গে যেন তিনি কোনো রকম অভদ্র বচসা না করেন।

এমনি বাঘের মতো মানুষ ছিলেন রামমোহন।

চার

ডিগ্‌বির সঙ্গে চাকরি করে রামমোহনের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছিল। রংপুর থেকে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

এর আগে আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা এখানে বলে রাখি।

রামমোহনের দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকমণি দেবী। এই বৌদিকে রামমোহন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন—মায়ের মতোই ভালোবাসতেন।

জগমোহন অকালে মারা গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে সতী হলেন অলকমণি। জানা যায়, অলকমণি সতী হতে চাননি। কিন্তু ধর্মের নামে রাক্ষস সমাজ তাঁকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বীভৎসভাবে আর একটি নারীকে হত্যা করা হয়।

রামমোহন নাকি বৌদিকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

ঢাকের শব্দে, ধুনোর ধোঁয়ায় পৈশাচিক আনন্দে জনতা চিৎকার করছে: জয় সতী অলকমণির জয়!

বৌদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক-চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনের যে কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারীহত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন।

ঘটনাটি সত্য কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক আছে। তর্ক আছে কিন্তু রামমোহনের একাধিক জীবনীকার এ ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। সত্যি হওয়া অসম্ভব নয়! আর রামমোহনের প্রতিজ্ঞা। হ্যাঁ সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছিলেন বইকি। তাঁর কোনো সংকল্প কোনো দিনই ব্যর্থ হয়নি। সেকথা পরে বলব!

রামমোহন ডিগ্‌বির কাছ থেকে দেশে ফিরে এলেন। এসে রঘুনাথপুরে একটি নতুন বাড়ী তৈরী করলেন।

কিন্তু তাঁর স্বাধীন মতামতের জন্যে তখন চারদিকেই তাঁর শত্রু! তাঁর নিজের মা তারিণী দেবী পর্যন্ত এই বিধর্মী সন্তানের মৃত্যু কামনা করছেন। এই সুযোগে রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল বিষধর সাপের মতো ফণা তুলল।

রামমোহন নিজের বাড়ীতে বসে শাস্ত্র আলোচনা করেন—বই লেখেন। সারা ভারতবর্ষের জন্য সর্বজনীন ধর্মমত তিনি গড়ে দেবেন—হিন্দু বৌদ্ধ ক্রীশ্চান মুসলমান সকলকে এক করে দেবেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রে, এতবড় অনাচার সইবে কেন গোঁড়া সমাজপতি রামজয় বটব্যালের?

নানা উৎপাত শুরু হল রামমোহনের বাড়ীতে। রাতদিন ঢিল পড়ছে—পড়ছে গোরুর হাড়। তাঁর নামে কদর্য ভাষায় গান রচনা করে দলে দলে তাই গেয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ীর আশে পাশে।

রামমোহন বুঝলেন গ্রামে বসে নীরব সাধনা তাঁর নয়। তাঁকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যেতে হবে বাংলা দেশের প্রাণতীর্থ কলকাতায়। সেখান থেকেই সংগ্রাম শুরু করবেন তিনি। শুরু করবেন তাঁর মহাভারতের সাধনা।

রামমোহন কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় একাধিক বাড়ী এর মধ্যেই কিনেছিলেন রামমোহন। মানিকতলাতেও একটি বাড়ী ছিল তাঁর। সেখানে এসেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রতিভাবান বিত্তশালী মানুষটির নাম কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে সম্ভ্রান্ত মানুষ আসতে লাগলেন তাঁর বাড়ীতে। এমনকি যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে আসতেন তাঁরাও রামমোহনকে ভারতবর্ষের অন্যতম দ্রষ্টব্য বলে মনে করতেন। এ'দের মধ্যে ছিলেন আর্ল অব্ মানস্টার, ফরাসী বিজ্ঞানী ভিক্টর জাকম', ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কস ইত্যাদি। বিখ্যাত লেখক জর্জ বার্নার্ড শ' নাকি একজন ভ্রমণকারীকে বলেছিলেন, 'তুমি ইংল্যান্ড দেখতে চাও? বার্নার্ড শ'কে যখনি দেখেছ, তখনি তোমার ইংল্যান্ড দেখা হয়ে গেছে!' রামমোহন সম্বন্ধেও বোধহয় একথা সেদিন বলা যেতে পারত।

কলকাতায় এসেই রামমোহন তাঁর নতুন সর্বভারতীয় ধর্মমত প্রচারে অগ্রসর হলেন। তাঁর চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়াল অসংখ্য অনুরাগীর দল। এ'দের মধ্যে ছিলেন ছাত্রবন্ধু ভারতপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীশ্চান পাদরি অ্যাডাম, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। রামমোহনের নতুন ধর্মমতকে যাঁরা পছন্দ করতেন না, তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁদের ভেতরে ছিলেন রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার জয়কৃষ্ণ সিংহ, বিখ্যাত পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ ইত্যাদি।

এ'দের কয়েকজনকে নিয়ে রামমোহন প্রথমে তাঁর মানিকতলার বাড়ীতে, পরে সিমলার নতুন বাড়ীতে (যে বাড়ি এখন আমহার্স্ট স্ট্রীটে রয়েছে) একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভায় নানা রকম আলোচনা হত—শাস্ত্র পাঠ হত, রামমোহনের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই) নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক চলত! এ সভায় জাতিভেদ ছিল না, সমাজভেদ ছিল না, সকলের জন্যেই ছিল এর অবারিত দ্বার। দেশের সমস্ত মানুষের জন্যই জ্ঞান আর বুদ্ধির দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এই উদার ধর্মমত গোঁড়ারা বেশিদিন সহ্য করতে পারল না। ক্রমেই রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা রকম আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। রামমোহনও ছাড়বার পাত্র নন। সত্য আর যুক্তির ভিত্তিতে এক সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান আর ক্রীশ্চানকে আক্রমণ করলেন তিনি।

হিন্দুরা রামমোহনের মুণ্ডপাত কামনা করতে লাগলেন। মুসলমানরা খেপে উঠলেন তাঁর উপর। শ্রীরামপুরের ক্রীশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে কাগজেপত্রে রীতি-মতো যুদ্ধ চলতে লাগল তাঁর। সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতো বীরবিক্রমে সকলের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন রামমোহন।

অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করতেই জানতেন—ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু রামমোহন অমিতপ্রতাপে শত্রু বাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন। বইয়ের পর বই লিখতে লাগলেন, প্রকাশ্য বিচার সভায় তাঁর কাছে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগলেন দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা। তাঁর ফার্সী বই 'তুহ্‌ফাৎ উল-মুয়াহ্‌হিদিন', 'বেদান্ত সার', 'বেদান্ত গ্রন্থ' ইংরেজী ক্রীশ্চান সমাজের প্রতি আবেদন চারদিকে যেন আগুন জ্বালিয়ে তুলল। সারা ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠল—ইয়োরোপের ক্রীশ্চান সমাজে পর্যন্ত সাড়া পড়ল। এমন কি বন্ধু অ্যাডামকে নিয়ে একটি নতুন ধর্মসভা পর্যন্ত তিনি গড়ে তুললেন, তার নাম ইউনিটারিয়ান কমিটি, তার উদ্দেশ্য গোঁড়া ক্রীশ্চান-ধর্মের সংস্কার।

ক্রীশ্চান পাদ্রীরা সমস্বরে রামমোহন আর অ্যাডামকে গালাগালি আরম্ভ করে দিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে রামমোহনের বই ছাপানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রামমোহন হার মানতে জানতেন না। নিজের টাকায় তিনি নতুন প্রেস কিনলেন—সেই প্রেস থেকে চলতে লাগল তাঁর অপরাজেয় অভিযান।

পাঁচ

এসব তো গেল ধর্ম আর তত্ত্বের দিক। কিন্তু আরো অনেক কাজ বাকী। অনেক কাজ। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কই রামমোহনের?

দেশে তখন ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। এই কোম্পানী ভারতবর্ষে শিক্ষা-প্রচারের কাজে কিছু কিছু অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ তখনো শিক্ষা বলতে ফার্সী আর সংস্কৃতের চর্চাই বুঝতেন।

www.boiRboi.blogspot.com

রামমোহন অনুভব করলেন, ফার্সী আর সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে এখন অতীতের তপস্যা করে লাভ নেই। যুগের হাওয়া বদল হয়ে গেছে। নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানে ইয়োরোপই পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। এক সময়ে রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট ইয়োরোপের দিকে জানালা খুলে দিয়ে রাশিয়ায় নতুন জীবনের সাড়া এনে দিয়েছিলেন।

রামমোহন তাঁরই মতো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন, তিনি চাইলেন ইংরেজির মাধ্যমে দেশে নতুন চিন্তা চেষ্টার বন্যা এসে আছড়ে পড়ুক। ইংরেজি-শিক্ষার সমর্থনে একবার লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাতে তাঁর এই বলিষ্ঠ শক্তি আর প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় মেলে।

এই সময় কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সক্রিয় উৎসাহ দেখান আর তাঁর সমর্থনে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রভৃতিও এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত ১৮১৬ সালের মে মাসে তখনকার সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ইস্টের বাড়িতে একটি আলোচনা সভা বসল। কলেজ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা রচনার জন্যে কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট লোকের ডাক পড়ল—একদিকে যেমন রামমোহনের দলবল রইলেন, অন্যদিকে তাঁর বিরোধী পক্ষের রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, মতিলাল শীল প্রভৃতিও উপস্থিত হলেন। রামমোহন নিজে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা বলা যায় না।

চাঁদা তুলবার প্রস্তাব উঠল। সেই সঙ্গে কলেজের পরিচালক সমিতি গড়বার প্রস্তাবও হল। আর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ এল রামমোহনের বিরোধী পক্ষ থেকে! রামমোহন যদি এই কলেজের ব্যাপারে কোন অংশে জড়িত থাকেন, কিংবা কোনো চাঁদা দেন তাহলে তাঁরা সমবেতভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করবেন।

স্যার হাইড্ ইস্ট হতবাক্। সে কী কথা! এ তো শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে এসব ব্যক্তিগত মতবাদের প্রশ্ন কেন?

কিন্তু রামমোহনের বিরোধী দল কোনো কথা শুনতে রাজী নন। হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী রামমোহন এই কলেজের সংস্রবে থাকলে তাঁরা এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবেন না!

হাইড ইস্ট হাসলেন: আমি তো খ্রীশ্চান—দারুণ গোঁড়া খ্রীশ্চান। আমি যদি আপনাদের কলেজের জন্যে কিছু অর্থ সাহায্য করি সে কি নেবেন না আপনারা?

বিরোধী পক্ষ বললেন, নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু রামমোহনের কিছুতেই নেওয়া চলবে না। তাকে বাদ দিতেই হবে।

ইচ্ছে করলে রামমোহন নিজের জোরেই সেদিন কলেজের পরিচালন সমিতিতে থাকতে পারতেন, তাঁকে ঠেকাবার শক্তি কারো ছিল না। কিন্তু শুধু তাঁর জন্যেই দেশের এমন হিতকর প্রতিষ্ঠানটি বিপন্ন হয়ে পড়বে! এ হতে পারে না।

রামমোহন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন। যার জন্যে এত করেছেন, এত চেষ্টা এত পরিশ্রম ব্যয় করেছেন যাকে সফল করে তুলতে—তার একটু ক্ষতি তাঁর সইবে না।

রামমোহনকে বাদ দিয়েই গড়ে উঠল তাঁর স্বপ্নতীর্থ বিদ্যালয় মহা পাঠশালা। সে মহা পাঠশালা আজো বেঁচে আছে সগৌরবে। তার নাম এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ।

মহা পাঠশালা থাক্—রামমোহন নিজেই একটি স্কুল গড়লেন। ইংরেজি শিক্ষা চাই দেশে দেশে, জ্ঞানের বিস্তার চাই, নতুন যুগের আলোয় জাতিকে জাগিয়ে তোলা চাই। নিজের হাতে তৈরী করলেন তাঁর অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল।

ছাত্র আসতে চায় না। না-ই এল। ছেলে রামপ্রসাদকে ভর্তি করে দিলেন, শিষ্য

নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়ণকে নিয়ে এলেন, দ্বারকানাথ ভর্তি করে দিলেন তাঁর ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে। দু-চারজন করে আরো কিছু ছাত্র এল। এদের কাছেই রামমোহন শোনাতে লাগলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের মিলনের বাণী।

কিন্তু আরো স্কুল চাই। আরো ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা চাই। তখন কলকাতার চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রধান বিশপ ছিলেন রেভারেণ্ড জেমস্ ব্রাইট্। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে রামমোহন স্কটল্যান্ড থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে আনালেন। তাঁর নাম আলেকজান্ডার ডাফ্।

নতুন স্কুল খুললেন ডাফ্। কিন্তু সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিল। স্কুলবাড়ি আর পাওয়া যায় না। খ্রীশ্চানকে ঘর ভাড়া দেবে কে? জাত যাবে যে। তার ওপর ইংরেজি শিক্ষার ফলে ছেলেরা যদি খ্রীশ্চান হয়ে যায়?

ডাফ্ অকূল পাথারে পড়লেন। রামমোহন ভরসা দিয়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ডাফ্‌কে তিনি বাড়ী যোগাড় করে দিলেন। কিন্তু একটিও ছাত্র নেই—শুধু তো আর চেয়ার-বেঞ্চিকে পড়াতে পারেন না তাঁরা। রামমোহন ছুটলেন—পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র জুটিয়ে আনতে লাগলেন।

এবারেও ব্যর্থ হলেন না তিনি। তাঁর বজ্রপ্রতিজ্ঞা কখনোই ব্যর্থ হয়নি। ডাফের সেই স্কুলই আজকের স্কটিশচার্চ কলেজ।

ছয়

কাজ—কত কাজ! দেশে খবরের কাগজ নেই, অতএব জনমত প্রকাশের মুখপাত্র চাই। রামমোহন পত্রিকার পর পত্রিকা বের করে চললেন। 'সম্বাদ কৌমুদী', 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'ফার্সী মিরাৎ উল আখবর'—আরো কত কী! এইসব কাগজে তিনি প্রচার করতে লাগলেন তাঁর নতুন সর্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম, করে চললেন শাস্ত্রের বিচার, এনে দিতে লাগলেন নতুন চিন্তা আর আদর্শ। মেয়েদের উপর সমাজের যে অত্যাচার চিরদিন চলে আসছে, তার প্রতিকার দাবী করলেন। ন্যায় বিচারের জন্য চাইলেন জুরীর প্রথা। চাইলেন আসামীর 'হেবিয়াস কর্পাসের' অধিকার, প্রজার ওপর জমিদারী পীড়নের অবসানের জন্য নতুন প্রজা-স্বত্ব আইন। সেই সঙ্গে বেরুতে লাগল বইয়ের পর বই।

চারদিকে কি শত্রুর অভাব ছিল? মোটেই না। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীরাও তাঁদের বই-পত্রে, পত্রিকায় কদর্য কটু ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন রামমোহনকে। রটে গেল তিনি ম্লেচ্ছ—তিনি গরুর মাংস খান—আরো কত কী।

গালাগালি দিলেন না রামমোহন। ভদ্র সংযত ভাষায় তিনি নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে চললেন। তাঁর সেই দুর্ভেদ্য বর্মে ঘা লেগে প্রতিপক্ষের অস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

যুক্তিতে যারা হারল। রাগে অন্ধ হয়ে গেল তারা। রামমোহন রাস্তায় বেরুলে তাঁর গাড়িতে ঢিল পড়ে। বাড়ির চারদিকে জড় হয়ে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায়। তার নামে গান বেঁধে নগর সংকীর্তন চলতে লাগল।

ব্যাটার সুরাই মেলের কুল,
ব্যাটার বাড়ী খানাকুল,

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল,
ওঁ তৎ সৎ বলে ব্যাটা
বানিয়েছে স্কুল—

কিন্তু সত্যের পথ ধরে যিনি চলেছেন, এসব ক্ষুদ্রতা তাঁর গায়ে লাগে না। পায়ের নিচে কাঁটা ছড়িয়ে থাকলেও ছুটন্ত তেজী ঘোড়া কি থেমে দাঁড়ায়?

রামমোহনও দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন।

অনেক বন্ধু শত্রু হল ভয় পেয়ে। সরে দাঁড়াল কতজন। কিন্তু 'একলা চল্‌রে'। আজ দেশ যদি আমায় না চেনে, কাল চিনবে; আজকে পাগল বলে যে গায়ে ধুলো দিচ্ছে—কাল সে মালা নিয়ে আসবে পিছনে পিছনে। এই তো নিয়ম!

দূর থেকে যারা দিনরাত রামমোহনের সর্বনাশ কামনা করে, মনে মনে বলে: সাবাস! পুরুষ নয় সিংহ।

কাছে আসতে সাহস নেই কারো! ভয় হয়, সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তারাও বুঝি রামমোহনের শিষ্য হয়ে দাঁড়াবে। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা সমাজপতিদের ভয়ে রামমোহনের চৌহদ্দি মাড়ায় না, তাদের মনেও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে রামমোহনের আশ্চর্য প্রভাব।

একটা ঘটনা বলি।

আদালতে সাক্ষীদের শপথ নিতে হয়। সে-কালে হিন্দুদের গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে হত।

হঠাৎ একজন আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করে বসল। জল চিরদিনই জল, গঙ্গারই হোক আর যারই হোক। সে জল ছুঁয়ে শপথ করতে কিছুতেই রাজী নয়। রামমোহনকে সে হয়তো চোখেও দেখেনি। তবু আদালতে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা ঘোষণা করল: আমি রামমোহনের শিষ্য। যাকে বিশ্বাস করি না, তার নাম নিয়ে শপথ করতে আমার বিবেকে বাধে।

সূর্যকে কয়েক টুকরো মেঘ কী করে রাখবে আড়াল দিয়ে? সমাজ আর সমাজপতিদের সমস্ত শাসনকে অগ্রাহ্য করে এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ছিল রামমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

তেজস্বী নির্ভীক মানুষ, অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ান। সে শক্তি যত বড়ই হোক—লড়তে তাঁর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না।

দেশী খবরের কাগজে তখনকার দিনে যে স্বাধীন সাহসী সাহসী সমালোচনা শুরু হয়েছিল, তা দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্তাদের চোখ টাটিয়ে উঠল। এই সব কাগজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্যে ১৮২৩ সালে এক আইন পাশ করা হল।

দেশের বড়ো বড়ো ধর্মধ্বজী, বড়ো বড়ো চাঁইয়েরা মাথা নিচু করে অপমান হজম করে গেলেন। কেবল করলেন না রামমোহন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে একমাত্র তিনিই তাঁর 'মিরাৎউল আখবর' বন্ধ করে দিলেন, জানালেন:

আব্রু কে বা মদখুনই বাস্ত দিহদ
বা উমেদ-ই করম্ এ, খাজা বা দায়বান
মা-ফরোশ—

অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর দামে কেনা হয়েছে, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের কাছে বিক্রি কোরো না! সে যুগে এতোবড়ো কথা রামমোহনেরই বলবার শক্তি ছিল।

শত্রু যেমন অসংখ্য, বাধা যেমন প্রচুর, তেমনি প্রলোভনেরও অন্ত ছিল না।

www.boiRboi.blogspot.com

তখন যে সব মিশনারি ছিলেন তাঁরা ভাবতেন, দেশের বড়ো বড়ো লোকদের ক্রীশ্চান করতে পারলেই বুঝি সারা দেশ ক্রীশ্চান হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে। চার্চ আর ইংল্যাণ্ডের আর্চবিশপ মিডলটনেরও সেই বিশ্বাস ছিল।

দেশের সেরা মানুষ রামমোহন রায়কে বশ করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি সহজ হয়ে যায়। নানা কারণে মিড্‌লটনের আশা আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। চলতি হিন্দু ধর্মের সংগে যাঁর মিল নেই, ক্রীশ্চানদের ইউনিটারিয়ান কমিটির সঙ্গে যাঁর এখন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—একটু চেষ্টা করলেই কি তাঁকে ক্রীশ্চান ধর্মে টেনে আনা যায় না? একদিন রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করে সেই ইঙ্গিতই দিলেন মিড্‌লটন। তুমি ক্রীশ্চান হও দেখবে তোমার সৌভাগ্য কেমন করে খুলে যায়।

অর্থ, রাজসম্মান, প্রতিপত্তি—

ঘুস? রামমোহনের দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সেই যে মিড্‌লটনের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন—জীবনে আর তাঁর মুখদর্শনও করেননি তিনি।

যেখানে পীড়িতের কান্না সেখানেই রামমোহন। যেখানে অন্যায় সেখানেই বজ্রপাণি রামমোহন। স্বদেশেই হোক আর বিদেশেই হোক। তিনি তো কেবল বাঙ্গালীই নন। সারা ভারতবর্ষের তিনি—সারা পৃথিবীর।

সাম্য স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে যে বিরাট ফরাসী বিপ্লব ঘটে গেছে, রামমোহন দিনের পর দিন তার সংবাদের জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন। জনগণের জয়ের সংবাদে আনন্দে আশায় তাঁর বুক ভরে ওঠে। তিনি স্বপ্ন দেখেন কবে তাঁর দেশের মানুষও ফ্রান্সের বিপ্লবী জনগণের মতো মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠবে: 'মার্সে-ই'। কবে আমাদের দেশেও চূর্ণ হয়ে যাবে বাস্তিলের কারাগার!

মানুষের স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্যে তাঁর যে কি অসামান্য ব্যাকুলতা ছিল, তার দুটি উদাহরণ দিই।

তখন কলকাতায় একজন উদারচেতা ইংরেজ সাংবাদিক ছিলেন, তাঁর নাম সিলক্ বাকিং হাম। এই বাকিং হামের সঙ্গে রামমোহনের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ১৮২১ সালের আগস্ট মাসে বাকিং হাম এক ভোজসভার ব্যবস্থা করেন এবং যথারীতি রামমোহন তাতে নিমন্ত্রিত হন।

কিন্তু সেদিনের সেই নিমন্ত্রণে রামমোহন যেতে পারেননি। একটা শোচনীয় দুঃসংবাদে তিনি তখন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। খবর এসেছিল অস্ট্রিয়ার অন্যায় আক্রমণে ইটালীর জনসাধারণ পরাধীনতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে।

এমন দুর্দিনে রামমোহন কি কখনো যোগ দিতে পারেন ভোজসভায়? সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বাকিং হামকে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন, মনুষ্যত্বের মহিমায়, স্বাধীন চেতনার দীপ্তিতে তা অমর হয়ে রয়েছে। রামমোহন লিখেছিলেন—

"Enemies to liberty and friends of despatism have never been and never will be ultimately successful !"

অর্থাৎ স্বাধীনতার শত্রু এবং অত্যাচারের বন্ধুরা কখনোই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি—কখনো পারেও না।

এই ছিল রামমোহনের জীবন-বেদ। দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ওপর তখন যা খুশি অত্যাচার করতো স্পেনের সরকার। ১৮২৩ সালে এই উপনিবেশগুলো যখন সেই অত্যাচার থেকে মুক্ত হল তখন রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়িতে এক বিরাট ভোজসভার ব্যবস্থা করে ঔপনিবেশিক জনগণকে অভিনন্দিত করেছিলেন তিনি।

এই সভায় তাঁর বহু ইউরোপীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজন

জিজ্ঞাসা করেন, দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভে তাঁর এত আনন্দ কেন? তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ রামমোহনের সম্পর্কই বা কী?

উত্তরে উত্তেজিত ভাষায় রামমোহন বলেছিলেন—

"What ought I to be insensible to my fellow creatures where every they are, or however unconnected by interests, religion or language?"

"কী! স্বার্থ, ধর্ম বা ভাষায় মিল না থাকলেই কি আমার সহকর্মীদের (স্বাধীনতার সংগ্রামীদের) সম্পর্কে আমি অচেতন হয়ে থাকবো?"

এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রই রামমোহনের কাছ থেকে পরে গ্রহণ করেছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর জীবনের আদর্শ মানুষ কে? কবি অসংকোচে উত্তর দিয়েছিলেন: রামমোহন রায়।

ঠিকই জবাব দিয়েছিলেন।

সাত

দেহ মনে অদ্ভুতকর্মা রামমোহন রায়। অটুট স্বাস্থ্য, অসামান্য কর্মশক্তি। দৈনিক আঠারো উনিশ ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারেন। খেতেও পারেন তেমনি। বারো সের করে দুধ আর চার সের করে মাংস খাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়—পঞ্চাশটা ডাব নইলে তেষ্টা মেটে না—চল্লিশটা আম দিয়ে জলযোগ করেন। পুরুষের মতো পুরুষ সন্দেহ কি!

চমৎকার সুন্দর চেহারা। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি-প্রতিভা প্রসন্ন ললাট, যেন জনগণমন অধিনায়ক হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছেন।

দশ হাতে কাজ করে চলেছেন। ব্রহ্ম-সভা, অ্যাংলো হিন্দু স্কুল, ডাফ্ স্কুল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের অধিকার আদায় করবার আন্দোলন, দেশের শিল্প-নৈতিক উন্নতি—যেদিকে তাকানো যায়, হিমালয়ের চূড়োর মতো রামমোহন দাঁড়িয়ে আছেন মাথা তুলে। একটি মাত্র মানুষের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষ সেদিন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এমন পাণ্ডিত্য আর এত বড় কর্মশক্তি নিয়ে তাঁর পরে আজ পর্যন্ত আর একজন মানুষও জন্মাননি এশিয়ায়। একজনও না।

সাত আটটা ভাষাই শিখেছিলেন। আর শেখবার কি আগ্রহ। মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে? বহুৎ আচ্ছা! সঙ্গে সঙ্গে মূল বাইবেল পড়বার জন্যে হিব্রু ভাষা তিনি শিখেছিলেন।

মেধার তুলনা হয় না।

একবার এক বিরাট পণ্ডিত একখানা তন্ত্রের বই নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তর্ক করতে এলেন। তন্ত্রের সে বইখানা রামমোহনের পড়া ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে পরদিন আসতে বলে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শোভাবাজারের রাজবাড়ী থেকে চিঠি লিখে তন্ত্রের বইটি আনিয়ে নিলেন। একরাত্রির পরিশ্রমে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করলেন দুরূহ বইখানা।

পরদিন পণ্ডিতের সঙ্গে শুরু হল বিচার। কী হল বিচারে? দুর্ধর্ষ পণ্ডিত হার মেনে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের তলায়।

কত গল্প যে আছে রামমোহন সম্বন্ধে! দু-একটা বলি।

www.boiRboi.blogspot.com

একবার এক ব্রাহ্মণ নাকি কঠিন রোগমুক্তির জন্যে দেবতার দুয়োরে ধর্ণা দেন। দেবতার স্বপ্নাদেশ হল: যদি তিনি তাঁদের গ্রামের একজন বুড়ো কলুর ছোঁয়া খান তবে তাঁর রোগ সারবে। কলুর ছোঁয়া! কী সর্বনাশ। জাত থাকবে না যে! ব্রাহ্মণ চোখে অন্ধকার দেখলেন। একদিকে জাত আর একদিকে প্রাণ। কোন্‌টা রাখেন?

অগত্যা উপায় চাইতে গেলেন রামমোহনের কাছে।

রামমোহনের এ-সবে বিশ্বাস ছিল না, তবু ব্রাহ্মণের দশা দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি বললেন, আপনি কলুকে নিয়ে জগন্নাথে চলে যান। সেখানে জাতি বিচার নেই, সবাই সবার ছোঁয়া খেতে পারে।

চমৎকার সমাধান! ব্রাহ্মণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আর একবার তাঁর বন্ধু কালীনাথ রায়চৌধুরী এক জোচ্চরের পাল্লায় পড়েছিলেন। কোথা থেকে একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ নিয়ে এসেছে। এই শঙ্খ যার ঘরে থাকে, সে নাকি কোটিপতি হয়, লক্ষ্মী অচলা হয়ে বাস করেন তার কাছে। পাঁচশো টাকায় শঙ্খটা কালীনাথকে দিতে রাজী আছে সে!

লোভে পড়লেন কালীনাথ। তবু একবার মনে হল রামমোহনের পরামর্শ নেওয়াটা মন্দ কথা নয়।

শঙ্খওয়ালাকে নিয়ে রামমোহনের কাছে উপস্থিত হলেন কালীনাথ। শুনে রামমোহন হাসলেন। শঙ্খওয়ালাকে বললেন, বাপুহে যে শঙ্খের এত দাম, তুমি নিজেই বা তাকে মাত্র পাঁচশো টাকার জন্যে হাতছাড়া করছ কেন? ইচ্ছে করলে নিজেই যখন কোটিপতি হতে পারো, তখন হঠাৎ তোমার এই পরোপকারের বাসনা কী কারণে?

বলা বাহুল্য, এর জবাব শঙ্খওয়ালা দিতে পারল না। তৎক্ষণাৎ পিটটান দিল সে।

রামমোহন সম্বন্ধে এমন অসংখ্য গল্প আছে। সে-সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। কিন্তু তার দরকার কী। তাঁর নিজের জীবনই যে একখানা মহাভারত!

কাজ করে চলেছেন রামমোহন। শিল্প বিস্তার, সমাজ সংস্কার, ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, নারীর অধিকার। বইয়ের পর বই লিখে চলেছেন। বাংলায়, ইংরেজীতে।

তাঁর রচনা সম্পর্কে একটা কথা এখানে বলে রাখি। রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য রচনার সময়ও তাঁর ছিল না। তাঁর সমস্ত লেখাই ধর্ম আর সমাজ সংস্কারমূলক। তবু বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় দান রয়েছে। রামমোহনকে এ যুগের বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা বলা যেতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা গদ্য রচনায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেও কেমন করে সাহিত্যের রস আনা যায়, কত সরল, সুন্দর ভাষায় কত কঠিন জিনিসকে ব্যাখ্যা করা চলে, রামমোহনের রচনা না পড়লে তা ধারণাও করা যাবে না। মৃত্যুঞ্জয়ের কঠিন পণ্ডিতী ভাষার পাশে পাশে রামমোহনের প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদের দুটি প্রস্তাব মিলিয়ে পড়লেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রামমোহন পাণ্ডিত্য করতে চাননি—কিন্তু সহজ সুন্দর প্রাণের ভাষা নিয়ে তিনি বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করে দিয়েছিলেন। পরে এই ভাষাই বিদ্যাসাগরের হাতে সম্পূর্ণভাবে প্রাণ পেয়ে উঠেছিল।

এছাড়া অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন তিনি—সেগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রচুর পরিচয় রয়েছে। তাঁর কয়েকটি গান আজও পরিচিত।

কিন্তু এখনও তাঁর আসল কাজ বাকী। এখনও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সতীদাহের উতরোল কান্না। এখনো দেশের মায়ের জাত স্বার্থপর পুরুষের হাতে ভোগ করছে মৃত্যু-যন্ত্রণা। সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই কান্না এসে রামমোহনের বুকে

আঘাত করে থাকে।

তাছাড়া বৌদির চিতার পাশে বসে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন, সে তো এখনও তাঁর পালন করা হয়নি। সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ দু'খণ্ডে প্রকাশ করে—সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েই তো তাঁর কর্তব্য শেষ হতে পারে না। এইবার তাঁকে নামতে হবে সতীদাহ নিরোধের সক্রিয় ভূমিকায়। দেশের বুক থেকে এত বড়ো পাপ চিরদিনের মতো উপড়ে ফেলতে হবে তাঁকে।

কর্মযোগী রামমোহন নতুন উৎসাহে রণক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। আর এই সময় ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক।

আট

এ দেশে যে সব ইংরেজ বড়লাট এসেছেন, তাঁরা অনেকেই অনেক রকম কুকীর্তি রেখে গেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ডালহাউসি, লর্ড কার্জন কিংবা লর্ড উইলিংডনের মতো বড়লাটদের ভারতবর্ষের মানুষ কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এই সব ধূর্ত ইংরেজরা যে কোনো রকমের মিথ্যে চাতুরী আর নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এঁদের হীন কুৎসিত চক্রান্তের দুর্ভোগ আজও ভারতবর্ষের মানুষকে বইতে হচ্ছে। সবচাইতে লজ্জা আর অপমানের কথা: আজ স্বাধীন হওয়ার পরেও এঁদের নানা রকমের স্মৃতি-চিহ্ন আমাদের কলকাতা শহরকেই কলঙ্কিত করে রেখেছে।

এঁদের মধ্যে অনেকখানি ব্যতিক্রম বলা যায় বেন্টিঙ্ককে। বেন্টিঙ্ক যে একেবারে মহাপ্রাণ ভারতপ্রেমিক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর মধ্যে বেশ কিছুটা উদারতা ছিল। নানা কারণে তাঁর প্রতি আমাদের কিছু কিছু কৃতজ্ঞতার অবকাশ আছে। দেশের দস্যু দমন করে, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন আর সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দিয়ে বেন্টিঙ্ক কয়েকটা খুব বড়ো কাজ যে করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবাসীর ধর্মে কর্মে বাধা দেওয়া ইংরেজ সরকারের আইনের বিরোধী। কাজেই প্রতিদিন চোখের সামনে সতীদাহের বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ দেখেও তাঁরা প্রতিকার করতে পারতেন না। বেন্টিঙ্কের অনেক আগেই লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা এ সম্বন্ধে নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতদের মত চাওয়া হয়।

তাতে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্রবিচার করে জানিয়েছিলেন যে মাত্র কয়েকটি অবস্থাতেই সতীদাহ সমর্থন করা যেতে পারে। এবং সতী হওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। জোর করে কোন মেয়েকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা শাস্ত্রসম্মত তো নয়ই বরং তার বিরোধী। তা সত্ত্বেও ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একটা সভ্য শিক্ষিত জাতি কেমন করে এই নারীহত্যার আনন্দে খেপে উঠত। আরো আশ্চর্য—দেশের রাজা মহারাজা, বড়ো বড়ো পণ্ডিত আর সমাজপতিরা এই প্রথাকে বজায় রাখবার জন্যে সেদিন প্রাণপণে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব থেকে মহারাজা গোপীকৃষ্ণ হরনাথ তর্কভূষণ দেওয়ান রামকমল সেন, সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি কে না ছিলেন!

সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে রামমোহন এই সব প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়ে চলেছিলেন। তাঁর প্রবর্তক-নিবর্তকে এবং 'সম্বাদ কৌমুদীতে' তিনি যেমন সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ধর্মবিরোধী ম্লেচ্ছ রামমোহনের নিন্দাবাদ চলছিল।

বিরোধী পক্ষ এবং রামমোহনের ব্রহ্মসভা আর ধর্মসভার মধ্যে সেদিনের যে লড়াই, তাকে সংক্ষেপে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধ বলা যেতে পারে। একদিকে সত্য অন্যদিকে সংস্কার। একদিকে যুক্তি আর অন্যদিকে অন্ধতা।

এদেশে পা দিয়েই রামমোহনের সম্বন্ধে বেন্টিঙ্ক অনেক খবর পেয়েছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সত্যনিষ্ঠার জন্যে বেন্টিঙ্ক তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। নানাভাবেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল।

রামমোহনের আত্মসম্মানের জ্ঞান যে কত সজাগ ছিল এখানে তার একটা গল্প বলি।

একবার সতীদাহ নিয়ে আলোচনার জন্য বেন্টিঙ্ক রামমোহনের কাছে তাঁর এ-ডি-কং অর্থাৎ দেহরক্ষীকে পাঠিয়েছেন। এ-ডি-কং এসে সেলাম দিয়ে সরকারী কেতায় জানাল: ভারতের মহামান্য গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

রামমোহন জানালেন, তিনি যেতে পারবেন না, তিনি সামান্য মানুষ, ধর্ম কর্ম নিয়ে কাল কাটান, লাটসাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা করবার স্পৃহা নেই!

অন্য কোন বড়লাট হলে জিনিসটা কিভাবে নিতেন কে জানে, কিন্তু বেন্টিঙ্ক ছিলেন একটু অন্য ধাতের মানুষ। ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। আবার তাঁর দেহরক্ষীকে পাঠালেন রামমোহনের কাছে।

এবার এ-ডি-কং এসে সবিনয়ে জানাল : মিস্টার উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলে অত্যন্ত খুশী হবেন।

গবর্নর জেনারেলের আদেশে রামমোহন যাননি। কিন্তু মিস্টার বেন্টিঙ্কের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হল।

এমনি আত্মমর্যাদাবোধ ছিল রামমোহনের।

ভারতবর্ষের বীভৎস সতীদাহ প্রথা বেন্টিঙ্ককে অত্যন্ত পীড়া দিত। তাছাড়া সতীদাহের ওপরে জে-পেগস নামে একজন ইংরেজ একটি বই লিখেছিলেন তখন: ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে 'সতীর ক্রন্দন'। বইটিতে সতীদাহের যে ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল, বেন্টিঙ্ক তাতে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে প্রতি বছরেই সতীদাহের সংখ্যাও বেড়ে চলেছিল। এক কলকাতা বিভাগেই চার বছরে কতগুলি সতীদাহ হয়েছিল, এখানে তার একটা হিসাব দিচ্ছি।

বছর	সতীর সংখ্যা
১৮১৫	২৫৩
১৮১৬	২৮৯
১৮১৭	৪৪২
১৮১৮	৫৪৪

এটা তখনকার দিনের মোটামুটি সরকারী হিসেব, কিন্তু আসলে সতীদাহ এর অন্তত দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়েছিল এরকম মনে করা যেতে পারে। এই হিসেব থেকেও দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বৎসর কী অস্বাভাবিকভাবে সতীদাহ বেড়ে চলেছিল।

১৮১৮ সালের সংখ্যা ১৮১৫ সালের দ্বিগুণেরও বেশি।

শুধু বই লেখাই নয়—বেন্টিঙ্ক আসবার আগে থেকেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে রামমোহন আবেদন করে আসছিলেন! সতীদাহের যাঁরা সমর্থক তাঁরাও চুপ করে বসেছিলেন না। সতীদাহের প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁদের যুক্তি ছিল এই রকম।

www.boiRboi.blogspot.com

'যেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরা নীচু স্তরের জীব, তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কম, তাদের কোনো মনের জোর নেই, তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তারা অজ্ঞ এবং যেহেতু শাস্ত্রের হুকুমে তারা বিধবা হয়ে সংসারের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য সেই জন্যে তাদের এইভাবে পুড়িয়ে মারাই উচিত!'

নিজেদের মা মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধার নমুনাটা দ্যাখো একবার। অথচ আমরা ভারতবাসীরা নাকি মেয়েদের দেবী বলে মাথায় তুলে রাখি!

সিংহগর্জনে রামমোহন এর প্রতিবাদ করলেন। তীক্ষ্ণধার যুক্তিতর্কে প্রমাণ করে দিলেন, মেয়েরা কোনো অংশে পুরুষের চাইতে নিকৃষ্ট তো ননই বরং অনেকদিক থেকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ। এবং সতীদাহের পেছনে হিংস্র বর্বরতা ছাড়া আর কোনো সত্যই থাকতে পারে না।

যুক্তিতে হেরে গিয়ে প্রতিপক্ষ রামমোহনের সর্বনাশ কামনা করতে লাগলেন। এমন সময় বেন্টিঙ্কের আবির্ভাব হল।

সতীদাহ-সম্পর্কে বেন্টিঙ্ক তো আগে থেকেই বিরূপ ছিলেন। রামমোহনের লেখা পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি স্থির করলেন, ভারতবর্ষ থেকে এ-প্রথা তিনি উচ্ছেদ করেই দেবেন।

মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল।

রক্ষণশীলদের কাগজ 'সমাচার-চন্দ্রিকা' চিৎকার করে উঠল। হিন্দুর ধর্ম গেল—জাত গেল—সর্বনাশ হল। বেন্টিঙ্ক যেন এমন অন্যায় কাজ কিছুতেই না করেন!

ওদিকে দেশের লোকেরও তখন একটু একটু করে ঘুম ভাঙছে। রামমোহনের দলেও লোকের অভাব হল না। 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ রামমোহনকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন।

দেশে যেন ঝড় উঠল। দুদিকে ভাগ হয়ে গেল হিন্দু সমাজ আর শেষ পর্যন্ত—

রামমোহনেরই জয় হল। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়ে গেল। ধর্মধ্বজীরা খেপে উঠলেন।

নয়

অসম্ভব—এ কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। দেশের রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে ভাটপাড়ার দিগ্‌গজ পণ্ডিত পর্যন্ত প্রায় আটশো লোক সতীদাহের স্বপক্ষে দরখাস্তে সই করেছেন। তবু আইন পাশ হয়ে গেল! ম্লেচ্ছ রামমোহনের ভাঁওতায় পড়ে খ্রীষ্টান বেন্টিঙ্ক সনাতন হিন্দু ধর্মের এতবড় অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে পারে না। দরখাস্ত পাঠাও বিলেতে। প্রিভি কাউন্সিলে। তোলো চাঁদা।

উঠল চাঁদা। দু-পাঁচশো নয়—একেবারে বিশ হাজার টাকা! রাজা মহারাজারা তো টাকা দিলেনই, ধর্মসভার লোকের চাঁদার উৎপাতে সাধারণ মানুষের রাস্তায় চলাই দায় হল। যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে, চাঁদা দাও—সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। লোকে জেরবার হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ধর্ম সভার পক্ষ থেকে ফ্রান্সিস্ বোথি নামে একজন ইংরেজ অ্যাটর্নিকে বিলেতে পাঠানো হল টাকা আর দরখাস্ত দিয়ে।

রামমোহনের ধর্মসভাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না, তাঁরাও পালটা রামমোহনকে বিলেতে পাঠাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন।

ওদিকে রামমোহনের জীবন প্রায় বিপন্ন হয়ে উঠেছে, তাঁকে খুন করবার জন্যে

www.boiRboi.blogspot.com

ভাড়াটে গুণ্ডা ঘুরে বেড়ায়। আত্মরক্ষার জন্যে সব সময়ে একখানা গুপ্তি সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয় রামমোহনকে। তাঁর বাড়ির চারদিক ঘিরে-ঘিরে কুৎসিত ভাষায় গান চলতে থাকে:

জাতের নিবেশ রামমোহন রায়
বিদের নিকেশ করেছে—

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে কিছুদিনের জন্যে পুলিশের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হয়েছিল রামমোহনকে।

ওদিকে বোথি বিলেতে রওনা হয়ে গেছেন, আর অপেক্ষা করা চলে না। এ-পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি রামমোহনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কিন্তু সে টাকা রামমোহন নিলেন না—ব্রাহ্ম সমাজকে তা দান করে দিলেন। তিনি নিজের টাকাতেই বিলেত যাবেন।

কিন্তু টাকা কোথায়?

সুযোগ এসে গেলো অদ্ভুতভাবে।

ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যপাট চলছে, কিন্তু দিল্লীতে তখনও নামমাত্র একজন বাদশা রয়েছেন দ্বিতীয় আকবর। এই দ্বিতীয় আকবর তাঁর কত-গুলো ন্যায্য অধিকার নিয়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন। কোম্পানি সে আবেদন গ্রাহ্য করল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় আকবর ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে একজন 'এলচি' বা দূত পাঠাবেন বলে স্থির করলেন।

স্বয়ং বাদশার দূত হতে পারে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে এমন আর কোন্ দ্বিতীয় মানুষ ভারতবর্ষে আছে রামমোহন ছাড়া? অতএব প্রস্তাব এল রামমোহনের কাছে। দিল্লীর বাদশা তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে চান।

রামমোহন সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বাদশার কাজ তো আছেই। তাছাড়া কিছুদিনের মধ্যেই প্রিভি-কাউনসিলে সতীদাহ বিলের আলোচনাও শুরু হবে। যেমন করে হোক সে সময় তাঁর সেখানে থাকা দরকার। এত করে শেষে ঘাটে এসে নৌকো ডুবতে দেওয়া যাবে না।

রামমোহন তৎক্ষণাৎ বিলেত যাওয়ার জন্যে তৈরী হলেন। কিন্তু বাধা এল দুদিক থেকে।

প্রথম বাধা দিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারা রামমোহনকে দূত বলে মানতে চাইল না। তাঁর 'রাজা' উপাধিও স্বীকার করতে রাজী হল না। কে এখন দিল্লীর বাদশা—কে আর মানে তাকে?

রামমোহন বললেন, তথাস্তু, সাধারণ মানুষ রামমোহন সাধারণ ভাবেই বেড়াতে যাবেন বিলেতে।

অগত্যা ছাড়পত্র দিতে হল কোম্পানিকে।

দ্বিতীয় বাধা হিন্দু সমাজ।

ব্রাহ্মণের ছেলে বিলেত যাবে? কালা পানি পার হবে?

একঘরে করব—মুখ দর্শনও করব না।

কিন্তু এ বাধায় থমকে যাবেন কেন রামমোহন?

সমাজ একঘরে করতে তাঁকে বাকিই বা রেখেছে কোথায়? বিলেত যাওয়ার সব বন্দোবস্তই তিনি করে ফেললেন।

তাঁর যাওয়ার আগেই একটা বিচিত্র সংবাদ এল। স্যার ফ্রান্সিস বোথি যে জাহাজে করে ধর্মসভার দরখস্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। ঝড়ে ডুবে গেছে সে জাহাজ। বোথি কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কিন্তু কাগজপত্র সব গেছে। রামমোহন হেসে উঠলেন।

বোম্বির জাহাজ ডুবেছে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গভীর দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে, কিন্তু তাদের আশীর্বাদে জাহাজের পালে লাগবে উনপঞ্চাশ পবনের বেগ।

শেষ পর্যন্ত ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে চড়ে রামমোহন ইয়োরোপের পথে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন। সঙ্গে চাকর রামহরি দাস আর মেয়ে বক্‌স্‌।

দশ

এখনকার দিন নয় যে দমদম বিমান ঘাটি থেকে প্লেনে উঠছেন, আর মেঘের বুক চিরে সাগর-পাহাড় ডিঙিয়ে দেখতে না দেখতে লন্ডনের ক্রয়ডন এয়ারপোর্টে গিয়ে নামলে! তখন সুয়েজ খাল পর্যন্ত কাটা হয়নি—ভারতবর্ষ থেকে বিলেত যেতে হলে পুরো ছটি মাস সময় লাগত।

পড়েন, লেখেন, ডেকে পায়চারি করেন আর সঙ্গী যাত্রীদের সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি এই সব নিয়ে আলোচনা করেন রামমোহন। চলতে চলতে জাহাজ কেপ-টাউনে গিয়ে পেঁছুল।

একটা দুর্ঘটনা ঘটল এখানে। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে এক-খানা পা ভেঙে গেল রামমোহনের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাঙা পা তাঁর আর জোড়া লাগেনি।

কিন্তু পা ভাঙলে কী হয়—মনে তাঁর অদম্য শক্তি। এই কেপটাউনেই তিনি একদিন দুখানি ফরাসী জাহাজ দেখতে পেলেন। বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে তাদের ওপর।

শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গেলেন রামমোহন। সেই অবস্থাতেই তিনি মুক্তি-যোদ্ধা ফরাসীদের অভিনন্দন জানাতে ছুটে গেলেন তাদের জাহাজে। মাথার উপরে সেই উড়ন্ত স্বাধীনতার পতাকার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল আনন্দে বলতে লাগলেন, Glory, Glory, Glory to France—ফ্রান্স, ধন্য, ধন্য, ধন্য!

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল রামমোহন লিভারপুলে পেঁছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা এগিয়ে এল চারদিক থেকে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম রস্কো লিভার-পুলে থাকতেন। এতদূরে থেকেও তিনি রামমোহনের আশ্চর্য পাণ্ডিত্য আর প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। টমাস্ হাড্‌সন ফ্রেচার নামে লিভারপুলের এক ভদ্রলোক তখন ভারতবর্ষে যাত্রা করছিলেন, রামমোহনের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর হাতে একটা দীর্ঘ চিঠিও লিখেছিলেন রস্কো।

কিন্তু সে চিঠি রামমোহনের কাছে পেঁছুবার আগেই রামমোহন লিভারপুলে পেঁছেছিলেন। রস্কো তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। রামমোহনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় রস্কো বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজকের দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সুযোগ আমি পেয়েছি।

ইংল্যাণ্ডে তখন নতুন রেল লাইন হয়েছে। সেই রেলে চেপে রামমোহন লিভার-পুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের কলকারখানা দেখতে গেলেন। কারখানার কুলি মজুররাও বুঝি এই অসামান্য পুরুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন—ছুটে এসে রামমোহনকে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। হাজার হাজার লোক এমন ভাবে এসে জড়ো হল যে, কর্তৃপক্ষ শেষে কারখানার দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

লিভারপুল থেকে লন্ডনে। পথে যেখানেই তিনি বিশ্রাম করেন, কৌতূহলী মানুষ ভিড় করে তাঁকে দেখতে।

www.boiRboi.blogspot.com

লন্ডনে পেঁছে বাসা নিলেন রিজেন্ট স্ট্রীটে। সারা শহর তোলপাড়। ভারত-বর্ষের এই অসামান্য মানুষটিকে দেখবার জন্যে সংখ্যাতীত লোক ছুটে আসতে লাগল। রাজনীতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক কারা না ছিলেন তাঁদের মধ্যে! বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তার দরজায় গাড়ীর ভিড় জমে থাকত। বন্ধ হয়ে যেত রাস্তা।

প্রথম যখন রামমোহন লন্ডনে পেঁছুলেন তখনই একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। সাময়িক ভাবে রামমোহন বণ্ড স্ট্রীটের একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। মধ্য রাত্রিতে যখন হোটেলের সবাই ঘুমন্ত, তখন একজন বুড়ো হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন রাম-মোহনকে দেখতে। তিনি এই মাত্র খবর পেয়েছেন যে রামমোহন লন্ডনে পেঁছেছেন। এই লোকটি যে-সে নন্, দিকপাল দার্শনিক পণ্ডিত জেরেমি বেন্থাম স্বয়ং। বার্ধক্যের জন্যে বেন্থাম কয়েক বছর যাবৎ কারো সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করতেন না। কিন্তু রামমোহনের সংবাদে তিনি নিজের বিশ্রাম ফেলে ছুটে এসেছেন।

ইয়োরোপের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা রামমোহনের প্রতিভাকে কতখানি সম্মান করতেন এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

কাজের মানুষ রামমোহন লন্ডনে পেঁছেই কাজে ডুব দিলেন। তাঁর ভাঙা পায়ের অবস্থা তখনো ভালো নয়—ডাক্তারেরা বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কিন্তু সময় কই রামমোহনের! দ্বিতীয় আকবরের কাজ বাকি, সতীদাহ বিল রয়েছে, ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বিস্তারের জন্যে পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল আলোচনা হচ্ছে—সে-আলোচনা শুনতে হবে তাঁকে। ভারতবর্ষের মানুষ হয়েও স্বাধীনচেতা রামমোহন এই রিফর্ম বিল সম্পর্কে এত বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন যে প্রকাশ্য সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন: এ বিল যদি পাশ না হয়, তাহলে তিনি আর ইংল্যাণ্ডের প্রজা হয়ে থাকবেন না—আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবেন।

খ্যাতি আর সমাদর চারদিক থেকেই ছুটে আসতে লাগলো তাঁর কাছে। ভারতবর্ষে থাকতে উদ্ধত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁর রাজা উপাধি মানতে চায়নি। কিন্তু এখানে সে সম্মান ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। উদ্ধত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করল। কোম্পানির চেয়ার-ম্যান উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁকে সম্বর্ধনা করে বললেন, 'যেমন মৌমাছি বাগানের ফুলগুলো থেকে সব চাইতে মিষ্টি মধু আহরণ করে তেমনি এই ব্রাহ্মণও অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার থেকে ভ্রমণ ও পঠনের মধ্যে দিয়ে উচ্চতম মানসিক প্রকর্ষ আয়ত্ত করেছেন।' রাজা চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেক-উৎসবে অন্যান্য দেশের রাজ-দূতদের সঙ্গে তাঁকে আসন দেওয়া হল। নতুন লন্ডন ব্রীজের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজা উইলিয়ম যে ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানেও রামমোহনকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে ইয়োরোপে কোনো কালা আদমির এত বড়ো সম্মান কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্তু এশিয়ার পুরুষসিংহ নিজের শক্তিতেই সেদিন তা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

সতীদাহ-বিলের কাজ তো ছিলই আরো অনেক বড়ো কর্তব্য ছিল সামনে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নতুন শাসন-তন্ত্র রচনা করছিল। এই উপলক্ষে হাউস অব্ কমন্‌সে একটি সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহনকে সাক্ষী দেবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়। এই সুযোগই রামমোহন চাইছিলেন। দেশের নানা-মুখী সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে রামমোহন সেদিন সিলেক্ট কমিটির সামনে যে-সব আলোচনা করেছিলেন, সেগুলিতে একদিকে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ অন্য-

দিকে তাঁর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। এইসব বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল :

১। ভারতবর্ষের রাজস্ব-প্রথা : এ সম্বন্ধে রামমোহনকে চুয়াত্তরটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন প্রজাস্বত্ব খাজনার হার, কৃষক এবং জনসাধারণের উন্নতি-সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন।

২। ভারতের বিচার-পদ্ধতি: এ নিয়ে রামমোহনকে আটাত্তরটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন বিস্তৃত উত্তর দেন।

৩। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরো অতিরিক্ত কতগুলি প্রশ্নের জবাবও তাঁকে দিতে হয়।

৪। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কেও তাঁর অভিমত গ্রহণ করা হয়!

৫। ভারতবর্ষের প্রজাদের অবস্থা : এ বিষয়ে রামমোহন বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য দেন।

রামমোহনের এইসব মতামত ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন শাসনতন্ত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। সে-যুগের পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্যে যতখানি করা সম্ভব রামমোহন তা প্রাণপণে করতে চেয়েছিলেন। অথচ আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আজো রামমোহনকে আমরা ভালো করে চিনতে শিখিনি, তাঁর উপযুক্ত মর্যাদাও দিতে পারিনি।

রামমোহন সিলেক্ট কমিটির সামনে যে-সব কথা বলেছিলেন, তা এখানে লিখতে গেলে এক বিরাট পুঁথি হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা বড়ো হয়ে সে-সব পড়ে নিয়ো। আমরা কেবল দু-একটি প্রশ্নের নমুনা এবং রামমোহন কীভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন, তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। আশা করি, এ থেকেই তোমরা রামমোহনকে চিনে নিতে পারবে।

প্রশ্ন: 'বর্তমানে বাংলা দেশে জমিদারি প্রথা এবং মাদ্রাজের রায়ৎওয়ারি প্রথার ফলে প্রজাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে?'

উত্তর : 'এই দুটি প্রথার ফলেই গরীব প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। একদিকে জমিদারের স্বার্থপরতা আর লোভ তাদের সর্বনাশ করছে, অন্যদিকে রাজস্ব-বিভাগের সরকারী আমীন আর আমলাদের চাপে তাদের প্রাণান্ত। আমি এ-জন্যে অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করি। বাংলাদেশের জমিদারেরা খাজনার হার বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে যা খুশী প্রশ্রয় পায় আর গরীব চাষীরা সব রকম সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। কোন বছর যদি বাড়তি ফসল হয় আর ফসলের দাম কমে যায়, তাহলে চাষীদের প্রায় সব ফসল বেচে দিয়ে জমিদারের খাজনা মেটাতে হয়। তাদের ঘরে না থাকে এতটুকু খাবার, না থাকে এক মুঠো বীজ ধান।'

মনে রেখো রামমোহন নিজেও জমিদার ছিলেন। অথচ তা সত্ত্বেও জমিদারি প্রথা সম্পর্কে কেমন স্পষ্ট ভাষায় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন তিনি!

আর একটি প্রশ্ন : আপনি ভারতবর্ষের বিচার প্রথায় কতগুলো দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। কীভাবে তাদের সংশোধন করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ভারতবাসীর রীতি-নীতি, ভাষা, চাল-চলন সমাজ এবং ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ইয়োরোপীয় বিচারপতিরা কিছুই জানেন না। সুতরাং তাঁদের পক্ষে কখনোই সুবিচার করা সম্ভব নয়।

অপর পক্ষে যাঁরা ভারতবাসী তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন পরাধীনতা আর উপেক্ষা, তাই দেশীয় বিচারকদেরও সাধারণের কাছে কোনো মর্যাদা নেই। সুতরাং আমার মতে, ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের ন্যায়-পরায়ণতা মিলিত হলেই দেশে সুবিচার সম্ভব হতে পারে।

www.boiRboi.blogspot.com

রামমোহন যে যুগে বাস করে গেছেন, সেকালে ইয়োরোপীয়দের সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাটুকু একেবারে অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু আরো কিছুদিন পরে যদি রামমোহন বেঁচে থাকতেন, তাহলে একথা নিশ্চয় বলতেন: হে বিলিতী প্রভুরা, তোমাদের সুবিচারের নমুনা তো অনেক দেখা হল, এবার দয়া করে চাটি-বাটি তোলো। আমাদের ভালমন্দ এখন আমরাই বুঝব, তোমাদের আর কষ্ট করে আমাদের খবরদারি করতে হবে না। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই—সেটা ১৮৩১ সাল। তখনো ইংরেজদের দাঁতন যে এমন করে বেরিয়ে আসেনি, তখনো ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলেনি।

এগারো

এর মধ্যে সতীদাহ বিলের আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে প্রিভি কাউন্সিলে। নিজের রাশি রাশি ধারালো যুক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন পুরুষসিংহ। ধর্মসভার দরখাস্ত তার সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বোথির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল—বৌদির পিতার পাশে বসে যে প্রতিজ্ঞা রামমোহন করেছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল তাঁর।

ভারতবর্ষ থেকে সতীদাহের পাপ মুছে গেল চিরদিনের জন্যে। সভা, সম্বর্ধনা আর অভিনন্দন চারদিকে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় কই! আজ এখানে বক্তৃতা, কাল ওখানে পরশু সেখানে। রামমোহন এখন রিজেন্ট স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে ডেভিড্ হেয়ারের ভাইয়ের বাড়িতে উঠে এসেছেন। হেয়ার পরিবার রামমোহনকে আপনার লোকের মতোই আদর যত্ন করতেন। হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে এঁদের সঙ্গে প্রায় আত্মীয়-সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল।

বিলেতের সমাজ জীবনে রামমোহনের কী অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার বলি। বিশেষ করে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর যে উদার আদর্শ—তাই নিয়ে চারদিকে যে কতখানি আলোড়ন উঠেছিল, তার নমুনা পাওয়া যায় একটি কৌতুক নাটিকায়। নাটিকার নাম হল 'ভারতে নতুন গবর্নমেন্টের পরিকল্পনা। এই নাটকে পার্লিয়ামেন্টের একজন সদস্যপদ প্রার্থী বক্তৃতা দিয়ে বলছেন : অতএব আমার মতে রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল করা হোক। বিচারপতি করা হোক মুসলমানদের। হিন্দুদের দেওয়া হোক রাজস্ব বিভাগের ভার। পুলিশ বিভাগের ভার নিক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা। এই প্ল্যানের বিশেষত্ব হল এই রামমোহন। না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান এবং ভারতবর্ষের কোনো সম্প্রদায়ের ওপরেই তাঁর কোন পক্ষপাত নেই। বাকি প্রত্যেকেই যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকবে তখন সেই নানা বিরোধী মতের আঘাতে আঘাতে ভারতীয় শাসনযন্ত্র গড়গড় করে এগিয়ে চলবে।

কৌতুকের মধ্য দিয়েও লেখক রামমোহনের সত্য পরিচয়ই তুলে ধরেছিলেন।

সিলেক্ট কমিটির সামনে যে সব আলোচনা সেদিন রামমোহন করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তার সম্পূর্ণ মর্ম সেদিন বোঝেনি। অথবা বুঝতেও চায়নি। যদি ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র গড়বার সময় তাঁর পরামর্শ উপযুক্ত ভাবে নেওয়া হত—তাহলে তা থেকে অনেক সুফল ফলত। কারণ রামমোহন স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না।

তাঁর বুদ্ধি ছিল যেমন সজাগ, যুক্তি ছিল তেমনি ধারালো। রামমোহন সম্বন্ধে ডক্টর ল্যান্ট কার্পেন্টার লিখেছেন, স্বদেশের জন্যে অনেক—অনেক বড় কাজ তিনি (রামমোহন) করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্যে যা করা হয়েছে বা করা যেতে

পারে, তাদের সবকিছু সম্বন্ধে তিনি সর্বদা তীব্রভাবে সচেতন থাকতেন। ইংল্যাণ্ডের আইনসভার সঙ্গে তাঁর যেসব যোগাযোগ, তা থেকে তাঁর তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, গভীর বিচার শক্তি আর সুসমঞ্জস চিন্তাধারার পরিচয় মেলে।...তাঁকে একাধারে দেশপ্রেমিক আর দার্শনিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তব জ্ঞানের উজ্জ্বল নিদর্শন। একথা বিশ্বাস করা যায় যে, আমাদের সরকার তাঁর মতামতের উচ্চমূল্য দিয়েছিলেন। এবং ভারতীয় জনসাধারণের ভালোমন্দ নির্ধারণ করার জন্য যে নতুন শাসনতন্ত্র গড়া হয় রামমোহনের দ্বারা তা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসেই রামমোহনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। আর একটি দেশে যতক্ষণ না তিনি পেঁছিতে পারছেন, যতক্ষণ না সে-দেশের একমুঠো মাটি তুলে তিলক পরছেন নিজের কপালে ততক্ষণ ইয়োরোপে আসাই যে তাঁর অসার্থক হয়ে রইল!

সেই দেশটির নাম ফ্রান্স।

রুশো ভোলতেয়ার দিদারোর জন্মভূমি। এই দেশেই লেখা হয়েছে 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট'—এই দেশের এক সাইক্লোপিডিস্ট লেখকেরাই সারা পৃথিবীতে স্বাধীন চিন্তার আর বৈপ্লবিক মনোভাবের জোয়ার এনেছেন। এই ফ্রান্সেই ঘোষিত হয়েছে সাম্য স্বাধীনতার আর ভ্রাতৃত্বের বাণী, এখানেই ভেঙেছে বাস্তিলের কারাগার, এখানেই ফরাসী বিপ্লবের রক্তিমশীল জ্বলেছে আগামী ইতিহাসের সূর্যোদয়ের মতো।

ফ্রান্সে রামমোহনকে যেতেই হবে!

অতএব ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি প্যারীর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে একখানা দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তখানা নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে এতে দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের একতার বাণী শুনিয়েছেন রামমোহন। এমনকি তখনকার দিনেও আজকের মতো একটি লীগ অব নেশনস বা জাতি সংঘ গঠন করে পৃথিবীতে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এই দরখাস্তে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের মধ্যে যে ছাড়পত্র প্রথা এবং নানারকম বিধি নিষেধ, এই দরখাস্তে রামমোহন তার প্রতিবাদ করেছেন। মানবতার যে উদার মহান আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে জাতিতে জাতিতে ঘৃণা আর সন্দেহের সম্পর্ক তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। রামমোহন জানতেন নানা দেশের মানুষের মধ্যে সহজ মেলামেশা আর ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে। ছাড়পত্র প্রথার কড়াকড়ির মধ্যে যে অবিশ্বাস ও জাতিগত দূরত্ব আছে, রামমোহনকে তা কতখানি দুঃখ দিয়েছিল, তাঁর দরখাস্তে সে কথা তিনি এইভাবে বলেছেন: আমি ভেবেই পাই না, অন্যান্য বিষয়ে যে ফরাসী জাতি সৌজন্য এবং ঔদার্যের জন্য বিখ্যাত, তার দেশে এমন প্রথার অস্তিত্ব থাকে কেমন করে!

দুটি দেশের রাজনৈতিক বিরোধ যদি এই ছাড়পত্র প্রথার প্রধানতম কারণ হয়, তার সম্পর্কেও চমৎকার সমাধানের ইঙ্গিত রামমোহনের এই দরখাস্তে আছে। তিনি লিখেছিলেন, খুব সহজ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতাতেই তো এর মীমাংসা করা যায়। দুটি দেশের পার্লিয়ামেন্ট থেকেই সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সম্মেলন প্রত্যেক বছর করা হোক এবং রাজনৈতিক মতভেদের সমস্যাগুলো উপস্থিত করা হোক সেখানে। ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হোক এবং দুটি দেশ থেকে পালা করে সভাপতি নির্বাচিত হোন। একবছর সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হোক এক দেশে, পরের বছর হোক অন্যদেশে। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের ব্যাপারে এ বছর যদি ডোভারে সম্মেলন হয়, পরের বছর তা হোক ক্যালেতে।

এই ধরনের সম্মেলনের সাহায্যে দুটি সভাদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব-

www.boiRboi.blogspot.com

রকম পার্থক্যেরই অবসান ঘটানো যেতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই ভাবে সহজেই সব সমস্যারই সমাধান হতে পারে। উভয় পক্ষই সম্পূর্ণভাবে খুশি হতে পারেন এবং বংশানুক্রমিক ভাবে দুটি দেশের মধ্যে প্রীতি আর শান্তি অব্যাহত থাকতে পারে।

পরবর্তীকালে জাতি সংঘ গঠন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিশ্বসমস্যা সমাধানের পূর্বাভাস রামমোহন এই ভাবেই সেদিন দিয়েছিলেন। ইয়োরোপের কাছে শান্তি এবং মৈত্রীর বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া রামমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বহুদিন পরে রামমোহনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ এই মিলন মন্ত্রই নিয়ে গিয়েছিলেন। ইয়োরোপের মানুষের প্রাণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রেমের ও কল্যাণের বাণী নোবেল পুরস্কারের শ্রদ্ধাঞ্জলি এনে দিয়েছিল তাঁর পায়ের কাছে।

রামমোহনের এই আবেদন পত্র ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। পরম সমাদরে রামমোহনকে তিনি ফ্রান্সে আমন্ত্রণ জানালেন।

১৮৩২ সালের শেষাশেষি রামমোহন তাঁর স্বপ্নের মহাতীর্থে এসে পৌঁছুলেন। দুহাত বাড়িয়ে বরণ করল ফ্রান্স। তাঁর খ্যাতি সেখানে বহু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। সাহিত্যিক, রাজনীতিক আর দার্শনিকেরা দলে দলে আসতে লাগলেন তাঁর কাছে। সোসাইটি এশিয়াটিক অফ প্যারিস তাঁকে সম্মানিত সদস্য করে নিয়ে দুর্লভ মর্যাদা দান করল। স্বয়ং লুই ফিলিপ তাঁকে আহারে নিমন্ত্রণ করলেন।

পরম সমাদরে কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে রামমোহন আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

ফ্রান্স থেকে এসে দারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন রামমোহন। ভারতবর্ষে এবং লণ্ডনে যে ব্যাঙ্কটি তাঁর টাকাপয়সা সরবরাহ করেছিল হঠাৎ সেটা ফেল পড়ল। ব্যক্তিগত জামিনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে তিনি ঋণ চাইলেন—সে ঋণ তারা দিতে রাজী হল না। দিল্লীর বাদশাহের যে কাজটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন সে ব্যাপারেও কোম্পানি এমন কতগুলো নোংরামি করল যে রামমোহন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলেন।

কেপটাউনে পা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে রামমোহন কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। টাকার অভাবে, দেনায় আর দুশ্চিন্তায় তিনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেয়ার পরিবার তাঁকে সানন্দে অর্থসাহায্য করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ নিতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধল।

এই সময়ে ব্রিস্টল থেকে রামমোহনের ডাক এল। ডেকে পাঠালেন রামমোহনের গুণগ্রাহী বন্ধু রেভারেণ্ড ডক্টর কার্পেন্টার। ব্রিস্টলে এসে রামমোহনের অর্থকষ্ট অনেকটা দূর হল। মিস্ কিড্‌ল বলে একটি মহিলা স্টেপল্‌টন গ্রোভে তাঁর বিরাট বাড়ির অনেকখানি রামমোহনের বসবাসের জন্যে ছেড়ে দিলেন: ডক্টর কার্পেন্টার আর তাঁর পরিবারের বন্ধুতা, মিসেস্ কিড্‌লের আতিথ্য, চারদিকের সহজ প্রীতি আর দাক্ষিণ্যের মধ্যে কিছুটা শান্তিতে রামমোহনের দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর মাথার খাটুনিতে রামমোহনের জীবনী শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সারাজীবনের অক্লান্ত সৈনিক এবার বুঝি দেহে মনে বিশ্রামের ডাক শুনতে পেলেন।

১৮৩৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বরে পড়লেন রামমোহন। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। ডেভিড হেয়ারের ভাইঝি মিস্ হেয়ার আহার-নিদ্রা বন্ধ করে তাঁর সেবা করে চললেন। ডক্টর কার্পেন্টারের মেয়ে মেরীও এগিয়ে এলেন তাঁর শুশ্রূষায়। নামজাদা ডাক্তার মিস্টার ক্যারিক এই অসাধারণ মানুষটিকে

বাঁচানোর চেষ্টার ত্রুটি করলেন না—যথাসাধ্য করলেন মিস কিডল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর স্টেপলটন গ্রোভেই ভারত-পুরুষ রামমোহনের ক্লান্ত চোখে শেষ ঘুম ঘনিয়ে এল।

শোকশান্ত একটি বিষণ্ণ দিনে স্টেপলটন গ্রোভের ছায়াবীথির তলায় রামমোহনের শেষকৃত্য সমাধা হয়ে গেল।

দশবছর পরে রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে যান, তখন তিনি রামমোহনের দেহ ওখান থেকে সরিয়ে এনে 'আর নোসভেল' নামে আর একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন এবং তার ওপরে গড়ে দেন চমৎকার একটি মন্দির। আজ সে মন্দির আমাদের জাতীয় তীর্থ।

বারো

একশো কুড়ি বছরেরও বেশি হল—রামমোহন আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।

কিন্তু যে প্রতিভাদীপ্ত, উন্নত, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন কি আমরা সফল করতে পেরেছি? রামমোহন ছিলেন: "Prophet of new India"—নবভারতের অগ্রদূত। তাঁর সেই নতুন ভারতবর্ষ কি গড়ে তুলতে পেরেছি আমরা?

এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের অধিকার। রামমোহন—বিদ্যাসাগর—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী বলে পরিচয় দেবার অধিকার।

www.boiRboi.blogspot.com

রবীন্দ্রনাথ

সেই কবেকার এক বাইশে শ্রাবণ মুছে গেছে অনেক বর্ষার জলধারায়, সেদিনের ব্যক্তি-বিয়োগের দুঃখ আজ ইতিহাসের অক্ষর। তবু রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাই নি, কখনও হারাতে পারি না।

শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণে'র সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নেই। কী অবিশ্বাস্য এই না-থাকা। কী শূন্য এই শান্তিনিকেতন। ভারাতুর মন নিয়ে ফিরে এলাম গেস্ট-হাউসে। আর বিষণ্ণ সন্ধ্যার আকাশকে কালো করে নেমে এল অশ্রান্ত বৃষ্টি।

ইলেকট্রিকের আবছায়া আলো নিঃশেষে মুছে গেল সেই বৃষ্টিতে। দূরে মাঠের পরে বিদ্যুতের আলোয় ঝলকে উঠতে লাগল শাল তমালের চঞ্চলতা। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে। দেখলাম 'বরষণ মুখরিত অন্ধকারে' কোন্ দিগন্তের পার থেকে তিনি আসছেন—'সজল সন্ধ্যায় একটি কেতকী' তাঁর হাতে—'মেঘে মেঘে তড়িৎ-শিখার ভুজঙ্গ-প্রয়াতে' শুনতে পেলাম তাঁর কলকণ্ঠ।

আর-একদিন। উদয়াস্ত দম-চাপা কাজের ভিড়। জীবিকার অসহ্য তাড়না! একটুখানি মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পেলাম, তখন রাত বারোটার কাছাকাছি।

ছাতে উঠে এলাম। খানিক দূরে চারতলা মেস-বাড়িটা ছাড়া কোন জানলায় আর আলো জ্বলছে না—এখন 'ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার'। শান্ত, স্তব্ধ আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে যখন সারাদিনের হিসেব তলিয়ে নিতে চাইছি তখন কানে এল বহু দূর থেকে কে যেন সেতার বাজাচ্ছে। বেহাগের সুর।

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম আকাশের দিকে। চন্দ্রহীন আকাশে নক্ষত্রের জ্যোতির্বাসর। ঐ সেতারের সুরটা আমাকে তুলে নিল আমিত্বের আবরণ থেকে—ছাড়িয়ে গেল এই কলকাতা, এই পৃথিবী: আমি দেখলাম আমার সমস্ত চেতনা ঐ সুরের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। ঐ সুর মাটিতে বাজছে না, মানুষের হাতে একটা যন্ত্রেও নয়—সমস্ত আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে—ঐ অগণিত নক্ষত্র তারই অগ্নিবিন্দু।

আর তখনই অনুভব করলাম রবীন্দ্রনাথকে:

'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়
আজকে আমার তারে তারে বাজাও সে বারতা—।'

ভীম বধ

প্রথম দৃশ্য

(একটা থিয়েটারের স্টেজ। পেছনে একটা জঙ্গলের সীন খাটানো। ডিরেক্টর—মানে নাটকের পরিচালক কালুদা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। তাকিয়ে দেখলে চারিদিক, আর কাউকে না দেখে রেগে চিৎকার করে উঠল।)

কালুদা। হবে না—থিয়েটার হবে না! এই সমস্ত গোবর-গণেশকে দিয়ে কখনো প্লে হয়! আজ হবে না থিয়েটার—হতেই পারে না!

(হারাধনের প্রবেশ)

হারাধন। কী হয়েছে কালুদা? অত চেঁচাচ্ছ কেন?

কালুদা। চেঁচাব না? বলি হারাধন, ওটা কী সীন টাঙিয়েছ—শুনি?

হারাধন। কেন—চমৎকার অরণ্যের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছি!

কালুদা। অরণ্য! তোমার মুণ্ডু! তুমি একটি গবেট! বুঝেছ, নির্জলা গবেট!

হারাধন। কেন, সীনটা দেখতে বেশ! কত মনোরম তরুলতা—কত কুসুম ফুটে রয়েছে—শাখায় শাখায় কত কোকিল সুমধুর স্বরে—

কালুদা। (চেঁচিয়ে) শাট আপ্। (ভেংচে) তরুলতা—কুসুম—কোকিল সুমধুর স্বরে! বলি, কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অরণ্য কোত্থেকে এল—অ্যাঁ? আর তাছাড়া দ্বৈপায়ন হ্রদই বা গেল কোথায়? দুর্যোধন লুকিয়ে কোথায় বসে থাকবে—শুনি?

হারাধন। এই নাও—কথা শোন একবার। আমি হ্রদ কোথায় পাব? স্টেজ কেটে আমি হ্রদ তৈরি করব নাকি? বল তো একটা পুরানো গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক নিয়ে আসি। তার মধ্যে দুর্যোধন ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

কালুদা। ইয়ার্কি পেয়েছিস—না? (রেগে) গেট আউট—দূর হ সামনে থেকে! (হারাধন চলে গেল) যা হোক, ঐ অরণ্য দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে এখন! লোকে ধরে নেবে দুর্যোধন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে বসে ছিল। কিন্তু আর সব হতচ্ছাড়া গেল কোথায়? এই সীনটাতেই দেখছি সব মাটি করে দেবে—একদম ভাল রিহার্সাল হয়নি! (চেঁচিয়ে) এই নিমাই—এই পটলা—

(একমুখ দাড়ি লাগিয়ে গায়ে যাত্রার দলের মতো পোশাক পরে নিমাইয়ের প্রবেশ। কালুদা ভীষণ চমকে গেল)

আরে এটা কে রে?

নিমাই। আমি নিমাই।

কালুদা। নিমাই! তা বেশ! কিন্তু কিসের পার্ট করছ তুমি? ধৃতরাষ্ট্রের?

নিমাই। ধৃতরাষ্ট্র কেন হবে? আমি ভীম।

কালুদা। ভীম? তাহলে অমন জগঝম্প দাড়ি লাগিয়েছিস কেন? কে তোকে বলেছে ভীমের অমন বাবর শা-র মতো দাড়ি ছিল?

www.boiRboi.blogspot.com

নিমাই। বা রে! দাড়ি গজাবে না? কদ্দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলছে! দিন নেই, রাত নেই—খালি যুদ্ধ! এর মধ্যে ভীম কখন দাড়ি কামাবে শুনি? পরামানিক পাবে কোথায়?

কালুদা। এঃ—এঃ! খুব যে পণ্ডিত হয়ে গেছিস! ভীম দাড়ি কামাবে কেমন করে? কেন, অর্জুন বাণ দিয়ে মেজদার দাড়ি কামিয়ে দেবে!

নিমাই। বাণ দিয়ে?

কালুদা। হাঁ—হাঁ—বাণ দিয়ে। অমন ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে দিতে পারল, আর দাদার দাড়ি কামাতে পারবে না? খোল্, খুলে আয় এক্ষুনি?

(শ্রীকৃষ্ণবেশে নিখিলের প্রবেশ)

নিখিল। কালুদা, দ্যাখো তো সাজ কেমন হল?

কালুদা। আহা—খাসা! এখন গিয়ে কদম্ববৃক্ষে উঠে বসলেই হয়! এই নিখ্লে, হাতে আবার বাঁশি নিয়েছিস বড়!

নিখিল। বাঃ—শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি থাকে না?

কালুদা। এ কি বৃন্দাবনের বন পেলি যে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরাবি? এসব অপোগণ্ডকে নিয়ে তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল! কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কি ছিল মনে নেই? শঙ্খ চক্র।

নিখিল। শাঁখ দিয়ে কি হবে? আমি বাজাতে পারি না।

কালুদা। চোপরাও! খালি পাকামো শিখেছিস! শাঁখ না হল, একটা চক্র তো দরকার!

নিখিল। চক্র আমি নিয়ে এসেছি। দাদার সাইকেলের একটা টায়ার!

কালুদা। কী! সাইকেলের টায়ার! ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমি ফায়ার করি! (নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে) তুই যে তখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে বললুম না ঐ মোগলাই দাড়ি খুলে আসতে?

নিমাই। তুমি তখন থেকে কেবল আমার দাড়িই দেখছ। আর নিখ্লে কেষ্ট সেজেছে, তার জুতো বুঝি তোমার চোখে পড়ে নি?

কালুদা। আরে আঁ—তাই তো! এ যে ডার্বি জুতো! নিখ্লে!

নিখিল। আমার পা মচকে গেছে। অন্য জুতো পরলে লাগে।

কালুদা। তাই বলে ঐ জুতো! তুই পাগল, না আমি পাগল?

নিমাই। দু-জনেই।

কালুদা। শাট আপ! যা, খোল জুতো!

নিখিল। খালি পায়ে নেংচে হাঁটতে হবে আমাকে?

কালুদা। তাই হাঁটবি। নেংচে নেংচেই হাঁটবি।

নিখিল। শ্রীকৃষ্ণ খোঁড়া হয়ে হাঁটবে? লোকে যে—

কালুদা। লোকে যা বলে আমি বুঝব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আহত হয়েছে, তাই খুঁড়িয়ে চলছে। হল তো? যা এখন। নিমাই, তুমিও যাও দাড়ি খোলো গে—

নিমাই। খুলছি। কিন্তু একটা কথা বলব কালুদা?

কালুদা। বল চটপট।

নিমাই। আমি বলছিলুম কি—এই থিয়েটারের পর পাঁচ বছর আমাদের কাউকে আর জুতো কিনতে হবে না।

কালুদা। মানে?

www.boiRboi.blogspot.com

নিমাই। মানে এই থিয়েটার দেখে লোকে এত জুতো ছুঁড়বে যে তাতেই—

কালুদা। আঁ—মস্করা? ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? গেট আউট!

(নিমাই আর নিখিলের পলায়ন)

শেম! এদের নিয়ে থিয়েটার করতে হবে? এর চাইতে যদি দলবল নিয়ে খোল কর্তাল বাজিয়ে হরি-সংকীর্তন গাইতুম, তাহলেও অনেক বেশি যশ হত! ছ্যাঃ!

(প্যাঁচার মতো মুখ করে দুর্যোধনবেশী গাঁট্টাগোট্টা পান্নালালের প্রবেশ)

তোমার আবার হাঁড়ির মতো মুখ কেন হে পান্নালাল? পেট কামড়াচ্ছে? আমি দেখছি শেষ পর্যন্ত তুই-ই ডোবাবি! তখন তোকে এত করে বললুম, এত তেলেভাজা খাসনি—খাসনি! তা—

পান্নালাল। (খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে) পেট কামড়াচ্ছে কে বললে তোমায়?

কালুদা। তাহলে? অমন তালের আঁটির মতো চেহারা করবার মানে কি?

পান্নালাল। কালুদা, আমি থিয়েটার করব না।

কালুদা। থিয়েটার করবে না—মানে?

পান্নালাল। মানে করব না!

কালুদা। বাঃ—বাঃ! রসিকতার সময়টি তো পেয়েছ ভাল! একটু পরে থিয়েটার আরম্ভ হবে, তুমি দুর্যোধন, তোমার উরুভঙ্গ নিয়ে নাটক, এখন বলছ কিনা পার্ট করবে না?

পান্নালাল। দুর্যোধন বলেই করব না।

কালুদা। জ্বালাস নি বলছি পেনো! এমনিই আমার মেজাজ এখন বেজায় খারাপ! খ্যাঁক খ্যাঁক করে এখন আমি যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারি। কী হয়েছে তোর?

পান্নালাল। ঐ নিমাই তাহলে ভীমের পার্ট করবে?

কালুদা। নিশ্চয়।

পান্নালাল। আর আমি দুর্যোধন?

কালুদা। নিঃসন্দেহে।

পান্নালাল। অসম্ভব।

কালুদা। মানে?

পান্নালাল। মানে আবার কী? নিমাইকে তো আমি এক ল্যাং মেরে পটকে দিতে পারি! আর ঐ শুঁটকো ফড়িংটাই কিনা আমার উরুভঙ্গ করবে! মহাভারত টহাভারত আমি বুঝি না! মোদ্দা, ঐ রোগা পটকা নিমেকে আমার উরুভঙ্গ করতে দেব না! কিছুতেই না!

কালুদা। কী মুশকিল! বলি, মামাবাড়ির আব্দার পেলি? রিহার্সালের সময় বললি না কেন?

পান্নালাল। বলেছিলুম তো। তুমি তখন আমাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বোঝালে আমার নাকি হিরোর পার্ট। এখন দেখছি সব বোগাস! আমি হিরো না ছাই! উরুভঙ্গ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে হাহাকার করব, আর নিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে! জাঁক দেখাবে! উহুঁ! ইম্পসিবল!

কাল্দা। ইম্পসিবল! (দাঁত খিঁচিয়ে) দ্যাখ পেনো!—অনেকক্ষণ ধরে তোর বাঁদরামো সহ্য করেছি আমি। একটু পরে প্লে আরম্ভ হবে, আর এখন উনি এলেন ধাষ্টামো করতে! যা রেডি হয়ে নে শিগগির—নইলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব! বেরো—যা শিগগির গিরিন রুমে—

পান্নালাল। (খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে) আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে!

(বেরিয়ে গেল)

কাল্দা। এদের নিয়ে আমায় থিয়েটার করতে হবে! ছ্যা—ছ্যা! এর চাইতে যদি ঢোল বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' গাইতুম, তাহলেও নাম হত! যতসব বেকুবের কারবার! (সামনের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে)—অ্যাঁ—মেলা অডিয়েন্স এসে গেছে যে! এই, ড্রপ ফাল, ড্রপ ফাল! প্লে আরম্ভ করতে হবে!

(ড্রপ পড়ল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ড্রপ উঠল। সেই অরণ্যই রয়েছে পেছনে। গদা হাতে দুর্যোধন অর্থাৎ পান্নালাল পায়চারি করছে।)

দুর্যোধন। আজি লুকাইয়া হ্রদে,
কুরুক্ষেত্র রণ হতে পলাতক আমি।
না না—এ তো হ্রদ নয়, এ যে বনভূমি!
কাল্দা বলিয়াছে মোরে।

(প্রম্পটার উইংসের পাশ থেকে গলা বের করল)

প্রম্পটার। এই—কী বলছিস এ সমস্ত। ঠিকমতো পার্ট কর্!

দুর্যোধন। চোপরাও! আমি দুর্যোধন,
ভাঙিবে আমার উরু—
ঐ নিমো?
হাঃ-হাঃ-হাঃ—পায় অট্টহাসি—
আসুক অর্জুন এইখানে একবার!
পাবে টের মজা কারে বলে!

(উত্তেজিত প্রম্পটার স্টেজে প্রায় ঢুকে গেল)

প্রম্পটার। এই পেনো—কী হচ্ছে? ভাল করে পার্ট বল শিগগির—

দুর্যোধন। নিকালো হিঁয়াসে! মোরে দিবে উপদেশ। অর্বাচীন যত।

(শ্রীকৃষ্ণের সাজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিধিরের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। মহামানী দুর্যোধন—
এতদিনে বুঝেছ কি তুমি,
অধর্মের জয় নাহি হয়? বুঝেছ কি—

দুর্যোধন। কে রে ওটা? খোঁড়া কেষ্টা? (হেসে)
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
কার বাড়িতে গিয়েছিলি
কে ভেঙেছে ঠ্যাং? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

প্রম্পটার। এই সেরেছে! দিলে সব ডুবিয়ে! এ পেনা, থাম্ থাম্—ওসব নয়—

দুর্যোধন। কী বার বার হাঁসের মত করিস প্যাঁক প্যাঁক?
বহুক্ষণ সহিয়াছি তোর এ ধৃষ্টতা রে বর্বর।
এইবারে পাবি সমুচিত প্রতিফল—

(প্রম্পটারের গলা ধরে টেনে সজোরে পদাঘাত)

প্রম্পটার। ওরে বাপরে, গেলুম রে—মেরে ফেললে রে—

(বই আর বাঁশি ফেলে সবেগে পলায়ন)

দুর্যোধন। তারপর খোঁড়া-কেষ্ট? কী মতলবে হেথা আগমন?

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিসফিসিয়ে) মাইরি ভাই পান্নালাল—কী আরম্ভ করলি তুই! থিয়েটার যে মাটি হয়ে গেল! ঐ দ্যাখ্—সামনে অডিয়েন্স হাসছে!

দুর্যোধন। হাসুক—হাসুক যত খুশি।
আমি নাহি করি ভয়।
রাজা দুর্যোধন আমি—হাতে মোর গদা।
ওরে ল্যাং ল্যাং খোঁড়া কেষ্ট! কী বুঝাস মোরে?

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিসফিসিয়ে) আঃ—কী করছিস! ঠিকমতো বলে যা। নে আমি আরম্ভ করছি: (জোরে)
শোন রাজা দুর্যোধন,
যত পাপ করিয়াছ—এবে তার হইবে বিচার!
ঐ হের ধু ধু জ্বলে রাশি রাশি লেলিহান শিখা—
ঐ শোন আর্তনাদ।
খেলিয়া কপট পাশা পাণ্ডবেরে দিলে নির্বাসন,
মহাপাপ সঞ্চিলে কত না—
আজ তাই তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে—

দুর্যোধন। এঃ, খুব লেকচার দিচ্ছিস! তবু যদি খোঁড়া না হতিস। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁ! (টেনে টেনে হাসি)

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিসফিসিয়ে) মাইরি পেনো, থামোকা সব মাটি করে দিস নে। আমায় বলতে দে—(জোরে)
তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে
ঐ আসে ভীমসেন।
হও হে প্রস্তুত—
নামিছে তোমার পরে কালের বিচার।

(গদা হাতে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। রে রে রে রে পামর!
এইবার কোথায় পলাবি? পাইয়াছি তোরে!
সমুচিত দণ্ড দিব এবে।
আয় রণে—গদাযুদ্ধ করি তোর সনে।

www.boiRboi.blogspot.com

দুর্যোধন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে নিমে, এবার আমিও পেয়েছি তোকে।
হা রে রে রে রে রে—
গদাযুদ্ধ আমার সঙ্গে?
বোঝ্ ঠ্যালা!

(গদাম করে গদা দিয়ে এক বিরাট ঘা বসালো নিমাইয়ের পিঠে)

ভীম। আঁ—একি! আমাকে মারলে যে বড়? এরকম তো কথা ছিল না!
দুর্যোধন। চোপরাও।—রোগা পটকা নিমে
ভাঙিবে আমার উরু। (বিচ্ছিরি মুখ করে) অ্যাঃ—
তোর মতো অনেক ভীমকে আমি গিলে খেতে পারি, বুঝেছিস? যা—যা।

(গদা দিয়ে ভীমকে আর এক ঘা। নিমে ঠেকাতে গিয়েও পারল
না—উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল)

শ্রীকৃষ্ণ। এ কী কান্ড। দুর্যোধন—এ কী ব্যবহার?
কথা আছে ভীম ভাঙিবে তব উরু।
তুমি কেন ভাঙিতেছ পিঠ তার,
কহ, কোন অধিকার-বলে হেন কার্য করিতেছ?
দুর্যোধন। ওঃ—তুমি আবার ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছ?
ওরে—ওরে খোঁড়া কেষ্ট, ওরে ধড়িবাজ—
দাঁড়া তবে। দিব দেখাইয়া
কত ধানে কত চাল হয়।

(দড়াম করে শ্রীকৃষ্ণের পিঠে গদাঘাত; শ্রীকৃষ্ণের সবেগে পতন
এবং তার চাইতেও বেগে উত্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। ওরে বাবারে। কালুদা—

(খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত প্রস্থান)

দুর্যোধন। যা নিয়ে আয় ডেকে—
তোর কালু-আলু-কলা-মুলো যা যেখানে আছে—
সবারে করিব আমি ঠান্ডা,
খাইব চিবায়ে কচ্‌কচ!

(এই ফাঁকে নিমাইও পালাচ্ছিল। ঘপাৎ করে তার কাঁধ চেপে ধরল)

দুর্যোধন। এই ভীমসেন, পালাস কোথায়?
ভীম। ছেড়ে দাও আমাকে। আমি আর গদাযুদ্ধ করব না তোমার সঙ্গে।
দুর্যোধন। গদাযুদ্ধ করবি না—বললেই হবে? ভীম হয়েছিস না?
দাঁড়া এবে—
তোর যত লম্ফঝম্ফ—সমস্ত ওস্তাদি
এবার করিব শেষ—

(বলেই গদা তুলে দমাদ্দম পিটতে শুরু করল ভীমকে। দু-একবার ঠেকাতে চেষ্টা করে
ভীম শেষে মাটিতে পড়ে গেল, তারপর জুড়ে দিল পরিত্রাহি চিৎকার)

ভীম। কালুদা—বাঁচাও—বাঁচাও। এই হতচ্ছাড়া পেনোটা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে
আমাকে মেরে ফেললে—

www.boiRboi.blogspot.com

দুর্যোধন। রেখে দে তোর কেলো—ভুলো, কলামুলো—
পিটিয়ে পিটিয়ে তোকে করে দেব তুলো—

(আবার ধপাধপ গদাঘাত, নিমাইয়ের আর্তনাদ)

ভীম। কালুদা—কালুদা—
দুর্যোধন। কালুকে করিব আমি আলুসেদ্ধ!

(কালুদা, প্রম্পটার, আরো দু-তিনজনের প্রবেশ)

কালুদা। ভয় নাই—ভয় নাই—ভীমবধ হতে নাহি দিব!
সৈন্যগণ—চেপে ধর এই পাষন্ড দুর্যোধনের ঠ্যাং—
ফেলে দাও চিৎ করে
অবিলম্বে ভূমিতলে!

(সকলে মিলে দুর্যোধনকে ধরে ফেললে, তারপর ফেলে দিলে মাটিতে। এর মধ্যে দুর্যোধন
বেশ কয়েক ঘা বসিয়েছে সকলকে। কালুদা তার গদাটা কেড়ে নিলে)

দুর্যোধন। ছাড়ো—ছাড়ো—ধর্মযুদ্ধ কর—
এস একে—একে,
সবে মিছে কেন ধর ঠেসে?

(নিমাই ওরফে ভীম তখন জুত পেয়ে দু-ঘা লাগালো দুর্যোধনকে)

ভীম। হা-রে-রে-রে-রে দুর্যোধন,
এবার কেমন লাগে?
দুর্যোধন। স্তব্ধ হও কাপুরুষ! (চিৎকার করে) দেখলেন মশাইরা, দেখলেন? ব্যাটা ভীমকে দিয়েছিলুম ঠান্ডা করে—সবাই মিলে কিভাবে আমায় বিধ্বস্ত করলে—দেখলেন? এটা কী রকম ব্যাভার হল আঁ? ও মশাইরা, ও অডিয়েন্সের ভদ্রলোকেরা, দেখলেন তো একবার?
কালুদা। থাক—থাক—খুব হয়েছে! প্লে করতে এলুম দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ—বানিয়ে দিলে ভীম-বধ! এদের নিয়ে থিয়েটার, মশাই? এর চাইতে খোল কর্তাল নিয়ে কালীকেত্তন গাইতুম, অনেক ফল হত এর চেয়ে! থিয়েটার এই পর্যন্ত থাক। এই ড্রপ ফ্যাল্—

—যবনিকা—

পরের উপকার করিও না

প্রথম দৃশ্য

(চাটুজ্জেদের রোয়াক)

ভজহরি। (বাজখাই গলায়) আমার দলবল সব হাজির? প্যালারাম?
প্যালা। আছি ভজাদা।
ভজ। হাবুল সেন?
হাবুল। (ঢাকাই ভাষায়) এই তো তোমার সামনেই খাড়াইয়া রইছি। দ্যাখতে পাও না?
ভজ। ক্যাবলা?
ক্যাবলা। প্রেজেন্ট স্যর!
ভজ। (চটে) আবার ইংরেজি কেন গোমুখ্যু! ইংরেজ চলে গেছে, খাঁটি বাংলা বলবি এখন! বল্—হাজির আছি ভজাদা!
ক্যাবলা। আচ্ছা, তাই হবে। হাজিরই রইলাম না হয়।
ভজ। নে, চল্ এবার। বেরিয়ে পড় চটপট।
হাবুল। যাবা কই? সিনেমায় নাকি?
ভজ। হুঁ—সিনেমায়! পয়সা দেবে কে চাঁদ, শুনি? সব তো ট্যাকখালির জমিদার। চল—কালীঘাটে বেড়িয়ে আসি।
প্যালা। আবার কালীঘাট কেন? তোমার ধর্মে কর্মে মতি হল নাকি ভজাদা? ও-সব বালাই তো কোনদিন ছিল না!
ভজ। বেশি বকাস নি প্যালা—রদ্দা খাবি। ধর্মকর্ম আবার কী? কালীঘাটে দিব্যি প্যাঁড়া পাওয়া যায়—চল্ তাই খেয়ে আসি!
ক্যাবলা। এটা ভাল প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাট। চারিদিকে গোলমাল। 'পাণ্ডা লাগবে নাকি বাবু? এই যে আসুন-আসুন—মাকে দর্শন করুন।' একটা পয়সা দাও বাবা, মা কালী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!'

ভজ। ধ্যাত্তোর। কালীঘাটে ভদ্দরলোক আসে! খালি পাণ্ডা আর ভিখিরি, ভিখিরি আর পাণ্ডা!
হাবুল। যা কইছ ভজাদা! য্যান্ গোয়ালন্দের স্টীমার-ঘাট!
প্যালা। চল ভজাদা, পালাই। এর পরে জামা-কাপড় কেড়ে নেবে মনে হচ্ছে।
ক্যাবলা। ওরেঃ-বাপরে! আবার কে আসছে। একটা বিরাট সাধু দেখছি। পেল্লায় চেহারা—টকটকে লাল চোখ—হাতে চিমটে—মাথায় জটা—যেন ঘটোৎকচ!

সাধু। (ভীমসেনী গলায়) হর হর—বোম্ বোম্।
ভজ। উঃ—কী চাঁচাছোলা গলা! যেন ষাঁড় ডাকছে!
সাধু। এই, তোমার নাম কেয়া হ্যায়?
ভজ। (ঘাবড়ে) আমার নাম? আমার নাম বাবা ভজহরি মুখুজ্জে।
সাধু। ভজহরি? ঠিক আছে। দে পাঁচসিকে পয়সা।
ভজ। পাঁচসিকে কোথায় পাব বাবা?
ক্যাবলা। আমাদের ট্যাঁক তো দাদা গড়ের মাঠ!
সাধু। (ধমকে) চুপ রহো!
প্যালা। ওরে বাবা!
হাবুল। চুপ কইরা থাক্ ক্যাবলা! দ্যাখস না চেহারাখান? চিমটা দিয়া অখনি রামপিঠান লাগাইবো!
সাধু। এই ভজহরি! কত আছে তোর কাছে?
ভজ। আনা সাতেক হবে বাবা!
সাধু। আনা সাতেক? আচ্ছা, তাই দে! আর একটা বিড়ি।
ভজ। বিড়ি সিগ্রেট তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর!
সাধু। হুঁ! গুড বয় দেখছি! তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কখনো খাস নি, ওতে যক্ষ্মা হয়। দে—পয়সাই দে! হাঁ করে আছিস কী? দে। শিগগির—
ভজ। (ভয় পেয়ে) হাঁ—আঁ—বাবা—দিচ্ছি—

(পয়সা দেওয়ার আওয়াজ)

সাধু। বহুৎ আচ্ছা। ভারি খুশী হলাম। এই নে, আশীর্বাদী জবাফুল দে মাথায়। হ্যাঁ রে ভজহরি, তুই এখানে কেন র‍্যা?
ভজ। আজ্ঞে বাবা, প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।
সাধু। তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে! তোকে দেখে মনে হচ্ছে পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি!
ভজ। (ঢোক গিলে) দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ করেছি বাবা! মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—এসব ভাল ভাল কাজ অনেক করেছি। কিন্তু পরোপকার তো কখনো করি নি।
সাধু। (চটে) করিস নি মানে? তুই তো ছোঁড়া বড্ড এঁড়েতক্কো করিস! এই তো আমায় সাত আনা পয়সা দিলি—খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন্। সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখ—বুঝলি? সেই দুঃখ দূর করতে আদা নুন খেয়ে লেগে পড়। আর্তের সেবা কর্—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। দে দে—একটা বিড়ি দে—
ভজ। বললাম যে বাবাঠাকুর, আমরা বিড়ি-টিড়ি খাই না।
সাধু। ওহো, তাও তো বটে! বেশ বেশ, বিড়ি কখনো খাস নি। আর শোন্—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—

(সাধুর প্রস্থান)

প্যালা। চলে গেল! স্রেফ ভোগা দিয়ে সাত আনা পয়সা মেরে নিলে!
ভজ। চুপ কর্ প্যালা! বাজে বকলে গাঁট্টা লাগাব! লোকটা নির্ঘাৎ মহাপুরুষ!
ক্যাবলা। কী সর্বনাশ!

www.boiRboi.blogspot.com

ভজ। ঠিক বলেছে—পরের উপকারই আমি করব। কালই চলে যাব দেশের বাড়িতে—ধোপাখোলায়। দারুণ ম্যালেরিয়া সেখানে। কলকাতা থেকে বোতল ভরে জ্বরারি পাঁচন নিয়ে সবাইকে খাওয়াব। রোগ বালাই দূর করে দেব!

হাবুল। কম্ম তো সারছে! আমাগো লিডার ভজাদা শ্যাষে সন্ন্যাসী হইল! হায়—হায়!

ভজ। চুপ কর্, আমার মন উদাস হয়ে গেছে। তোদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করব না। আজই চললাম ধোপাখোলায় (নাটকীয়-ভাবে) বিদায়—বিদায়—

তৃতীয় দৃশ্য

(ধোপাখোলার বাড়ী)

ভজ। গ্রামে তো এসেছি। যা ভেবেছি ঠিক তাই। চারদিকেই ম্যালেরিয়া। যেখানে যাই সেখানেই দেখি লোকে জ্বরে কোঁ-কোঁ করছে। দশ বোতল জ্বরারি পাঁচন এনেছি—গ্রামের রোগ তাড়িয়ে তবে আমি নড়ব। হুঁ—হুঁ—ঐরে, পিসিমা আসছে! ভারি মুশকিল, কানে কম শোনে—কথা বলাই শক্ত!

(পিসিমার প্রবেশ)

পিসিমা। হ্যাঁরে এখন যে বড় দেশে এলি?

ভজ। এমনি এলাম।

পিসিমা। আম নিয়ে এলি। কী আম পেলি এখন অসময়ে? ল্যাংড়া না বোম্বাই?

ভজ। আম নয়। পরোপকার করতে এসেছি পিসিমা।

পিসিমা। পুরি খেতে এসেছিস? পুরি এখানে কোথায় বাবা? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই!

ভজ। ইংরেজ কোথায় পিসিমা? এখন তো আমরা স্বাধীন! মানে ইন্ডিপেন্ডেট!

পিসিমা। কোট-প্যান্ট? ছিঃ বাবা! আমি বিধবা মানুষ, কোট প্যান্ট পরব কেন? থান পরি।

ভজ। দুত্তোর! এ তো মহা জ্বালা হল! ইচ্ছে করছে পিসিমার কানে খানিক পাঁচন ঢেলে দিই! (গলা চড়িয়ে) বলছিলাম, দেশের রোগ বালাই তাড়াতে এসেছি।

পিসিমা। কী বললি, মালাই? মালাই কোথায় পাবি বাবা? দুধ কই? গো-মড়কে সব গরু উচ্ছন্নে গেছে।

ভজ। উঃ—কী জ্বালা! যাই পাঁচনের বোতল বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি!

চতুর্থ দৃশ্য

(গ্রামের পথ)

ভজ। গাঁয়ের লোক তো আচ্ছা খলিফা! ওষুধ খেতে চায় না! বলে, ভগবানের দেওয়া রোগ—তাড়ালে পাপ হয়। কী আকাট মুখ্যু সব! কিন্তু এখন আমি

কী করি? পরের উপকার আমায় যে করতেই হবে! এ তো মহা মুশকিল হল! আরে—আরে—ঐ তো! একটা জামগাছতলায় বসে গজানন সাঁতরা ঝিমুচ্ছে দেখছি। নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া! ওর রোগই আগে সারাই! বেশ হাঁ করে আছে, দিই ওর মুখে খানিক পাঁচন ঢেলে—

গজানন। (চিৎকার করে) কে রে বেল্লিক। উজবুক। ওয়াক থুঃ-থুঃ—। আমার এমন তাড়ির নেশাটা বেমালুম চটিয়ে দিলে! মেরেই খুন করে ফেলব তোকে। ওয়াক থুঃ-থুঃ—

ভজ। ইঃ—বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটা তাড়ি খেয়েছিল। ওরে বাপ রে তেড়ে আসছে যে। পালাই—

গজ। ওয়াক থুঃ। তোর মুণ্ডু ভেঙে দেব। ওয়াক—

পঞ্চম দৃশ্য

(গ্রামের পথ)

ভজ। নাঃ, হাল ছাড়ছি না। পরের উপকার করে—মানে গাঁ-সুদ্ধ লোককে পাঁচন গিলিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব। এই যে সামনেই পাঁচুমামার বাড়ি; ঢুকে পড়ি!

(একটু পরে)

পাঁচু। উঃ। আঃ। ই-হি-হি-হি!

ভজ। কী হল পাঁচুমামা? ইজিচেয়ারে শুয়ে আঃ ইঃ করছ কেন?

পাঁচু। এই গেঁটে বাত বাবা! গাঁটে গাঁটে ব্যথা! ওফ্!

ভজ। বাত! (দেখে নিয়ে) তাই তো, বাত। (উৎসাহভরে) জ্বর হয়নি কখনো মামা? মানে ম্যালেরিয়া?

পাঁচু। ম্যালেরিয়া হয়েছিল বৈকি। গত বছর।—উঃ! আঃ! ইঃ!

ভজ। ওতেই হবে, বুঝলে মামা, ও-ই হল রোগের লক্ষণ! ঐ ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিছু ভেবো না, এখুনি তোমার বাত-ফাত একেবারে কাত করে দিচ্ছি।

পাঁচু। বলিস কী রে! তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস? কই শুনি নি তো!

ভজ। ডাক্তার কী বলছ মামা, তার চেয়ে ঢের বড়। একেবারে মহাপুরুষ!

পাঁচু। মহাপুরুষ!

ভজ। তবে আর বলছি কী? হাতে এই যে বোতল দেখছ—ও ধন্বন্তরি। নাও হাঁ কর।

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

পাঁচু। (চিৎকার করে) ওয়াক, ওয়াক! ওরে বাপ রে—গেছি রে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে! ওরে, কে কোথায় আছিস রে, ওকে দু-ঘা-বসিয়ে দে রে। ওয়াক ওয়াক...

ভজ। আর নয়, এবার কেটে পড়ি।

পাঁচু। (দূরে থেকে চিৎকার) পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার, রাস্কেল, খুনে, গুন্ডা...

ভজ। তা গালই দাও আর যাই কর—পরের উপকার তো হয়েছে। এবার দেখি আর কাউকে পাই কি না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গ্রামের পথ। দূরে থেকে কান্না : ভাঁ আঁ আঁ)

ভজ। ঐ যে আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে বছর দশেকের ছোকরা চ্যাঁচাচ্ছে। ম্যালেরিয়াই নিশ্চয়। যাই দেখি ওর কাছে।

(একটু পরে)

এই, কী নাম তোর?

ছেলেটা। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) লাড্ডু।

ভজ। লাড্ডু। তা, অমন করে কাঁদছিস? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি, আর লাড্ডু থাকবি নে! কী হয়েছে তোর?

লাড্ডু। বড়দা চাঁটি মেরেছে।

ভজ। কেন? তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি?

লাড্ডু। না। আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

ভজ। এই কার্তিক মাসে কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলি? শুধু চাঁটি নয় গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ! ভাল কথা, তুই বুঝি টক খেতে ভালবাসিস?

লাড্ডু। হুঁ, খুব।

ভজ। নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। এই লাড্ডু, তোর জ্বর হয়?

লাড্ডু। হয় বৈকি!

ভজ। তবে আর কথা নেই। হাঁ কর্।

লাড্ডু। কী আছে বোতলে? আচার বুঝি?

ভজ। আচার বলে আচার! দুরাচার, সদাচার, কদাচার,—সকলের সেরা এই আচার। হাঁ কর্। হাঁ কর্। চট্‌পট্!

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

লাড্ডু। ওয়াক্, থু থু! বাবা রে, মা রে, বড়দা রে! ওয়াক্। ওয়াক্! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—

ভজ। ইস্। ঢিল চালাচ্ছে যে। ওরে ব্বাস। একটা আবার পিঠে এসে পড়ল। উঃ—উঃ, ছেলেটার দেখছি তাক ফস্কায় না ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হল।

সপ্তম দৃশ্য

(খোপাখোলার বাড়ি: ভজহরি ও পিসিমা)

পিসিমা। তুই গ্রামে এ কী উৎপাত শুরু করেছিস বাবা ভজহরি? তোকে দেখলে সবাই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়, ছেলেপুলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে!

ভজ। (গম্ভীর গলায়) পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব পিসিমা!

পিসিমা। কী বললি? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি?

(মড়াকান্না জুড়ল) কী সর্বনাশ! ওগো, আমার কী হল গো! আমাদের ভজহরি যে পাগল হয়ে গেল গো!

ভজ। দুত্তোর, কথা কওয়াই ঝকমারি! বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে—

www.boiRboi.blogspot.com

অষ্টম দৃশ্য

(পথ)

ভজ। কী অকৃতজ্ঞ নরাধম দেশ! এই দেশের উপকারের জন্যে মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ কেউ আমার কদর বুঝবে না? ছিঃ ছিঃ! এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি, স্বাধীন! কিন্তু কী করা যায়? কী ভাবে উপকার করি? গাঁয়ে তো যাওয়া যাচ্ছে না, লোকে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করে দেবে! কার উপকার করি এখন?

(একটু পরে)

আরে, নিমগাছতলায় ঐ তো তিনটে ছাগল ঝিমুচ্ছে! ভারি খারাপ লক্ষণ! এখানকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া! ছাগলকেও ধরেছে! ধরাই স্বাভাবিক! আহা অবোলা জীব! কেউ ওদের দুঃখ বোঝে না! আহা—চুক্ চুক্! ছাগলকেই তবে পাঁচন খাওয়াই। মানুষের মতো ওরা অকৃতজ্ঞ নয়। তেড়ে মারতে আসবে না। আজ থেকে এই অবোলা জীবের উপকার করাই আমার ব্রত। যাই ছাগল দিয়েই তবে শুরু করি—

(একটু পরে ছাগলের ডাক—ব্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—)

আঃ ছটফট করছিস কেন? তোর ভালোর জন্যেই তো! (ছাগলের ডাক—ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা) এবার দু-নম্বর। আঃ, ব্যাটা তো ভারি নচ্ছার! নে খা না! (ছাগলের ডাক) চলে আয় তিন নম্বর। খেয়ে নে ধন্বন্তরি পাঁচন—

(তিনটে ছাগলের সমস্বরে ডাক—ব্যা-অ্যা-অ্যা—ভ্যা অ্যা-অ্যা)

লোক। (দূরে থেকে চিৎকার করে) ওগো, সেই খুনে ডাকাতটা গো! আমার তিনটে ছাগলকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে রে—

ভজ। সর্বনাশ! ছাগলের মালিক দেখছি! নাঃ সটকাতে হল।

লোকটা। (চেঁচিয়ে) আমিও হলধর সাঁপুই! সহজে ছাড়ব না! মামলা করব, জেল খাটাবো! (ছাগলের ডাক) হায় হায়, আমার ছাগল বুঝি গেল!

নবম দৃশ্য

(আদালত)

পেয়াদা। ফরিয়াদি হলধর সাঁপুই হা—জির—

হলধর। এই যে হুজুর, হাজির!

উকিল। ধর্মাবতার! হুজুর মাননীয় জজ বাহাদুর!

জজ। অমন করে চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায়! আপনার মক্কেলের নালিশ বলুন।

উকিল। ধর্মাবতার, এই যে কাঠগড়ায় আসামী ভজহরি মুখুজ্জে দাঁড়িয়ে আছে, ও একটা মহা পাষণ্ড! ও যে অন্যায় করেছে তা আমাদের দরখাস্তে বিশদভাবেই লেখা আছে। অবোলা জীবের ওপর ভজহরি যে ভীষণ অত্যাচার করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না! আর একটা সমানে বমি করছে আর একটা তিন দিন ধরে সামনে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদির একটা ট্যাঁকঘড়ি সুদ্ধ চিবিয়ে ফেলেছে!—

কী হে হলধর—তাই নয়?

হলধর। (ফোঁস-ফোঁস করে) আজ্ঞে ধর্মাবতার, জজসাহেব, উকিলবাবু যা বলেছেন সবই সত্যি। আমার ট্যাকঘড়িটা খুব ভাল ছিল স্যার! কী শক্ত! আমার ছেলে সেইটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা! (ভেউ ভেউ, হলধরের কান্না : একটু পরে) ঘড়ি নয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার অমন তিন-তিনটে ছাগল! বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর, একেবারে উন্দাম পাগল!

জজ। আরে জ্বালাতন! আরে বাপু, তুমিও তো দেখছি একটা পাগল! ছাগল কখনো পাগল হয়? সে যাক। অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্জেকে তিনটাকা জরিমানা করলাম—এই টাকায় হলধরের ছাগলেরা রসগোল্লা খাবে।

দশম দৃশ্য

(চাটুজ্জেদের রোয়াক)

ভজ। প্যালা!
প্যালা। হাজির!
ভজ। হাবুল!
হাবুল। সামনে খাড়াইয়া রইছি।
ভজ। ক্যাবলা!
ক্যাবলা। প্রেজেন্ট স্যর—থুড়ি এই যে মহাশয়।
ভজ। শোন্, মনটা বেজায় খিঁচড়ে গেছে। বুঝলি, সংসারে কারুর উপকার করতে নেই!
প্যালা। নিশ্চয়ই না।
ক্যাবলা। উপকারীকে বাঘে খায়।
হাবুল। বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়া খামোকা ঝামেলা বাড়াইয়া হইবো কী!
ভজ। যা কইছস। (হেঁড়ে গলায়) বুঝলি, আমি আর-একখানা নতুন বর্ণপরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে: কখনো পরের উপকার করিও না।
ক্যাবলা। সাধু। সাধু।
ভজ। (গর্জন করে) খবরদার, সাধু-ফাদুর নাম আমার কাছে করবি নে। ঐ সাধুর জন্যেই তো এত কেলেঙ্কারি। একবার সাধুকে যদি হাতের কাছে পাই তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

www.boiRboi.blogspot.com

উপাখ্যান

www.boiRboi.blogspot.com

কমলাসাগরের উপাখ্যান

বিলের ভেতর দিয়ে নৌকো চলছিল আমাদের। বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেছে। দূরে আকাশের কোণে এক ফালি চাঁদ জেগে ছিল, একটুকরো মেঘ দেখা দিতেই চাঁদটা সেই মেঘের মধ্যে ডুব মারলে। ঘন অন্ধকার বিলের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

রতনদা বললেন, আর নৌকো বেয়ে কাজ নেই। এই অন্ধকারে বিলের তো দিশে পাওয়া যায় না—শেষকালে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে! তার চাইতে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আমরা সবাই খুশি হয়ে উঠলাম: বেশ, সে তো চমৎকার কথা।

সত্যিই আমাদের ভয়ানক ভালো লাগছিল। হু-হু করে দিব্যি বাতাস দিচ্ছে—চারদিকে জল দুলছে, খেলা করছে—আকাশ বাতাস পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে সমস্ত। কী আশ্চর্য সুন্দর একটা জগৎ! কূল নেই—কিনারা নেই—জনমানুষের সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। শুধু নৌকোর গায়ে ছলাং ছলাং করে জলের শব্দ হচ্ছিল। যেন একটা মহাসাগরের বুকে আমরা আশ্রয় নিয়েছি এসে।

বড় বড় দাম-ঘাসের মধ্যে লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে ফেলা হল। চাকর পটলা এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো স্টোভে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে—তার একটা মিষ্টি গন্ধ আসছিল। নৌকোর ছইয়ের ওপরে বসে আমরা জটলা শুরু করে দিলাম। খিচুড়ি আর ডিমভাজা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ওই করেই খিদেটাকে চাঙা করে নেওয়া যাক।

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বললে, ওসব কচকচি থামা না বাপু! তর্ক করতে হয় বাড়ি গিয়ে করিস, হাতাহাতির ইচ্ছে থাকে তো ডাঙায় নেমে পড়।

—তাহলে কী হবে?

—গল্প বল কেউ। বাঘের গল্প—ভূতের গল্প, যা খুশি।

—ভূতের গল্প!—ওরে বাবা।—অন্ধকার বিলের দিকে তাকিয়ে সুভাষ বললে, না, না, আমি ভয়ে মরে যাব!

রতনদা একমনে হুঁকো টানছিলেন। তাঁর চোখদুটি বোজা—কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ ঠকাস্ করে হুঁকোটা নামিয়ে বললেন, চারদিকের এই কালো জল আর ঢেউ দেখে আমাদের দেশের একটা গল্প আমার মনে পড়ছে। ঠিক গল্প নয়—সত্যি ঘটনা। শুনতে চাও তো বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

পটলার খিচুড়ির গন্ধটা বেশ লোভনীয় হয়ে আমাদের নাড়ি-ভুঁড়িতে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। স্টোভটার দিকে একবার লোভীর মতো তাকিয়ে সুভাষ বললে, বেশি দেরি হবে না তো? খিচুড়ি হয়ে এসেছে, খিদেও পেয়েছে ভয়ানক—

আমরা সবাই তাকে ধমকে বললাম, চুপ কর হতভাগা রাক্ষস! বেরসিকের মতো কেবল খাই খাই করছে। সুভাষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা চুপ করলাম। কিন্তু খিচুড়িটা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

কেউ তার কথায় কান দিলে না।—বলুন রতনদা, বলুন—

হুঁকোতে আর একটা টান দিয়ে রতনদা বললেন :

আমাদের দেশে যদি কখনো যাও তাহলে দেখতে পাবে, একটা প্রকাণ্ড দিঘি। কী চমৎকার তার জল—টলটলে, কাকের চোখের মতো তার রঙ। দারুণ পিপাসার সময় তার এক আঁজলা খেলে বুকের ভেতরটা অবধি একেবারে ঠান্ডা হয়ে আসে—সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। কমলাসাগর তার নাম।

এই দিঘি কাটিয়েছিলেন দেশের জমিদার—লোকে তাঁকে বলত রাজা। মস্ত জমিদার, হাতিশালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া—পাইক, পেয়াদা, সিপাই সবই তাঁর ছিল। দু-হাতে দান করতেন—দেবত্র, ব্রহ্মত্র দিতেন। তাঁর নামে গরীব দুঃখীর চোখ ছলছল করে আসত। সবাই বলত : দয়ায় দাক্ষিণ্যে তিনি রামচন্দ্রের অবতার।

তাঁর স্ত্রীর নাম কমলা দেবী। আশ্চর্য সুন্দরী তিনি। সুন্দরী শুধু নয়—তাঁকে দেবী প্রতিমা বললেও বোধহয় কম বলা হয়। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ, টানা টানা কালো চোখ, তুলিতে আঁকা ভুরু, চাঁপার কলির মতো আঙুল, পদ্মের মত দু-খানি পা। মনে হত হাঁটলে পরে তাঁর পায়ের দাগ বুঝি মাটিতে আঁকা হয়ে যাবে। আর তাঁর চুল। অমন চুল কেউ কখনো দেখেনি। ঘন মেঘের মতো তার বরণ, পিঠ ছাড়িয়ে তা গোছায় গোছায় পা পর্যন্ত নেমে আসত। সত্যি-সত্যিই কমলা তিনি।

আর তাঁর দয়া। সে দয়ার কি তুলনা হয়। একবার রানীমার কাছে হাত পাতলেই হল—জানালেই হল দুঃখের কথা। নায়েব অত্যাচার করেছে—সঙ্গে সঙ্গে নায়েবকে বরখাস্ত করে তিনি প্রজার ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। দেশে আকাল হয়েছে—অমনি রাজবাড়ির ভান্ডার খুলে দিলেন, গরীব-দুঃখী পেট পুরে খেয়ে দু-হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলে।

কিন্তু দেশের লোকের ভারি কষ্ট। জলের অভাব। দারুণ গ্রীষ্মে খানা-ডোবা নদী-নালা যখন শুকিয়ে যায় তখন পিপাসায় মানুষ গরু ছটফট করে। বহুদূর থেকে জল আনতে হয়, কিন্তু এমন ভয়ানক রোদে যে অনেকে সে পথটুকুও হেঁটে যেতে পারে না, রাস্তাতেই টাটিয়ে মরে যায়।

কমলাদেবীর কানে গেল প্রজাদের এই দুঃখের কথা। তিনি আর থাকতে পারলেন না। রাজাকে এসে বললেন, দীঘি কাটিয়ে দিতে হবে প্রজাদের জন্যে। এমন দীঘি, যার জল কখনো শুকোবে না—একশো, দুশো বছর ধরে যা দেশের লোকের জলের দুঃখ দূর করতে পারবে।

রাজা বললেন, এ পাথুরে মাটির দেশ। এখানে দীঘি করবার উপায় নেই—জল উঠবে না।

রানী জবাব দিলেন—ওসব বুঝি না। এত বড় রাজা তুমি—এত তোমার ক্ষমতা—আর একটা দীঘি কাটাতে পারবে না?

রাজা হেসে বললেন, আচ্ছা বেশ।

দীঘি কাটানো শুরু হল। রাতারাতি হাজার মজুর লেগে গেল কোদাল নিয়ে। পাথর আর কাঁকরে মেশানো শক্ত মাটি।—কোপ দিলেই ঠন করে বেজে ওঠে—কোদালের ফলা দুমড়ে যায়। দুপুর রাতে লোকগুলোর গা দিয়ে টপ্-টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। কিন্তু রাজা বললেন, যত মজুরি চাও তোমরা দেব, কিন্তু দীঘি কাটতেই হবে।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অসীম পরিশ্রমের পর কাজ শেষ হল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে হাহা করতে লাগল বিশাল দীঘি। কিন্তু আশ্চর্য, একফোঁটা জল উঠল না।

সকলে বললে, বৃষ্টির জল পড়লে আপনি দীঘি ভরে উঠবে।

www.boiRboi.blogspot.com

আকাশে আষাঢ়ের নীল মেঘ ঘনিয়ে নামল অঝোর বৃষ্টি। ঝম ঝম—ঝুপ ঝুপ—ঝির্ ঝির্। পথ-ঘাট খানা-খন্দল দিয়ে জল গড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু কী বিস্ময়ের ব্যাপার—দীঘিতে একবিন্দু জল জমল না। যেন ওর তলায় শুকনো একটা মরুভূমি আছে—একটি ফোঁটা জল পড়বামাত্র চোঁ করে শুষে নেয়।

সকলে বললে, দেবতার অভিশাপ।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন! কমলাদেবীর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল দিন রাত—তাঁর চাঁদের মতো মুখখানা ব্যথায় দুঃখে ম্লান হয়ে গেল। দেবতার অভিশাপ? সজ্ঞানে এমন কোন অপরাধ তো তাঁরা করেন নি! তবে কোন পাপে এত বড় দীঘি—এত কষ্ট আর পরিশ্রম সত্ত্বেও এমনি শুকনো কাঠ হয়ে রইল?

রানী পুজো করালেন—শান্তি-সস্ত্যেন করালেন। না, কিছুতেই কিছু হবার নয়। দীঘি যেমন ছিল তেমনি রইল—মাটির বুকে হাহাকার করতে লাগল একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। রাজা আর রানী দুধের মতো বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। রাত যখন প্রায় শেষ, বাইরে অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে আর কদমফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে ভোরের বাতাসে বয়ে যাচ্ছে, এমন সময় দুজনেই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন।

কী স্বপ্ন দেখলেন?

শুকনো দীঘির ধবধবে মার্বেল-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন কমলাদেবী। এক ধাপ—দুই ধাপ—তিন ধাপ। আস্তে আস্তে ঘাটের শেষ পইঠায় এসে তিনি দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই মাটির তলা থেকে—শুকনো দীঘির রোদে ফাটা পোড়া বুকের ভেতর থেকে—যেন একটা গুমরানি শোনা গেল। মাটির সহস্র ফাটলে সাপের ফণার মতো, কোঁকড়ানো কালো চুলের মতো—রাশি রাশি জল উছলে উঠল। দেখতে দেখতে সমস্ত দীঘির বুক জুড়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো গর্জাতে লাগল জলতরঙ্গ!

কমলাদেবী ঘাটের পইঠায় দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। সেই জল, অস্থির কালো জল তাঁর হাঁটু ডোবালো কোমর ডোবালো, বুক ডোবালো—তারপরে গুচ্ছো গুচ্ছো মেঘবরণ চুল তরঙ্গিত জলরাশির সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। কমলাদেবীর এতটুকুও চিহ্ন রইল না কোনখানে।

দু-জনেই স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলেন। রাজা বললেন, কমলা, আমি একটা ভারি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম—এখনো আমার বুক ধড়ফড় করছে।

কমলা বললেন, আমিও স্বপ্ন দেখেছি। তোমার দীঘি বলি চাচ্ছে—আমাকে চাচ্ছে। বলি পেলেই কানায় কানায় ভরে উঠবে।

রাজা শিউরে উঠলেন। কমলার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, সর্বনাশ। অমন কথা বোলো না। দীঘি শুকনো থাকে থাক, কিন্তু তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না।

কমলাদেবী ক্লান্ত মুখে হাসলেন, জবাব দিলেন না।

দিন কাটতে লাগল কিন্তু রানী মনে আর শান্তি পান না। দুপুরের বাতাস আসে—তিনি যেন শুনতে পান শুকনো দীঘি আর্তনাদ করে তাঁকে ডাকছে, গাছের পাতা কাঁপে—তার খস্-খস্ শব্দে তিনি শুনতে পান কারা যেন পিপাসায় কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে বলছে: রানীমা জল দাও, জল দাও। আমরা তোমার প্রজা—তৃষ্ণায় বুক ফেটে আমরা যে মরে গেলাম।

মুখে রাজভোগ রোচে না, দুধের ফেনার মতো নরম তুলতুলে বিছানায় ঘুম আসে না। বুকের ভেতরটা কান্নায় কাঁপে সারাক্ষণ। মনে পড়ে যায় দুঃখ প্রজাদের—

বৈশাখের আগুন-ঝরানো রোদে তিন মাইল দূর থেকে জল আনতে গিয়ে পথের মাঝখানে যারা ছটফটিয়ে মরে যায়।

দীঘি বলি চায়—বলি চায় কমলাদেবীকে।

কমলাদেবী আর থাকতে পারলেন না। নিশুত নিঝুম রাত। আকাশের কোণে পঞ্চমীর চাঁদ অস্ত গেছে—থমথমে আঁধারে ঢেকে গিয়েছে পৃথিবী। পাখিরা ঘুমিয়ে পড়েছে—জন্তু জানোয়ারেরা অবধি ঢলে পড়েছে ঘুমে—শুধু চারদিকে ঝিঁঝির কান্না—রী—রী—রী—

পাশে রাজা ঘুমুচ্ছেন। ঘরের কোণ থেকে ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে সোনার প্রদীপ জ্বলছে—তার ঠাণ্ডা কোমল আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের ওপর। রানী একবার সেদিকে তাকালেন—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এমন দেবতার মতো স্বামী—এমন সোনার সংসার তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু উপায় নেই, সংসারের চাইতেও বড় ডাক আজকে এসেছে। যদি তাঁর প্রজারা তৃষ্ণায় ছটফট করে—যদি একবিন্দু জলের জন্যে ছাতি ফেটে যায় তাদের, তাহলে কী দরকার এমন রাজত্বে, এমন সুখে! তিনি যে তাদের মা। তাদের দুঃখ তিনি না দেখলে কে দেখবে। হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাঁর একটি প্রাণ বিসর্জন দিলে ক্ষতি কী।

কমলাদেবী মনস্থির করে ফেললেন।

সমস্ত রাজবাড়ী ঘুমে মগ্ন। মহলে মহলে প্রদীপের শিখা নিবু-নিবু। দাঁড়ে ঝিমুচ্ছে ময়না চন্দনা। যেসব সিপাই হাঁক দিয়ে ফিরছিল নাগরা জুতো মচমচিয়ে, লাঠি-সোঁটা মাটিতে রেখে তারা মাথা হেলিয়ে দিয়েছে শানের ওপর। রাতের নিদালিতে থমথম করছে চারদিক।

নিঃশব্দ পায়ে রাজবাড়ির সিং-দুয়ার পেরিয়ে কমলাদেবী বাইরে চলে গেলেন। তাঁর রক্ত-পদ্মের মতো পায়ের নিচে পৃথিবী যেন শিশিরের চোখের জলে ভিজে গেল, দাঁড়ের মধ্যে কি একটা স্বপ্ন দেখে কান্নার মতো শব্দ করে উঠল রানীর পোষা চন্দনাটা।

অনেকক্ষণ পরে রাজার ঘুম ভাঙল। ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় তিনি দেখলেন, কমলা পাশে নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আর সন্দেহে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল। ব্যাকুল হয়ে তিনি বিছানার ওপরে উঠে বসলেন।

আর সেই মুহূর্তে তাঁর কানে এল একটা আশ্চর্য শব্দ—একটা প্রবল জলের কলরোল। যেন কোথায় বেনো জলের বাঁধ ভেঙেছে। জলের একটা ভয়ঙ্কর গর্জন উঠেছে—কোথায় যেন আঘাত করেছে—কি যেন ভেঙে-চুরে শেষ করে দিতে চায়।

রাজা পাগলের মতো ছুটে বেরুলেন। তাঁর সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে। মাথার মধ্যে যেন জ্বলে উঠেছে আগুন। ছুটতে ছুটতে তিনি ভৈরব কল্লোল শুনতে পেলেন—শুনলেন জলের করাল গর্জন।

সামনে দীঘি। অন্ধকারের মধ্যে ফুলে উঠছে—ফেঁপে উঠছে—ঢেউয়ে দুলে উঠছে কানায় কানায়। শুকনো মরা দীঘি মুহূর্তে মহাসাগর হয়ে গেছে—আর কমলার মেঘের মতো চুল যেন জলের সঙ্গে মিশে ফুলে উঠছে—দুলে উঠছে।

রাজা চিৎকার করে ডাকলেন, কমলা।

কমলার জবাব এল না, শুধু শোনা গেল কলধ্বনি।

সেই দীঘিই হচ্ছে কমলাসাগর। আজও তার জল স্ফটিকের মতো নির্মল, আজও তা হাজার হাজার লোকের তৃষ্ণা দূর করে।

www.boiRboi.blogspot.com

একটু চুপ করে থেকে বিলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রতনদা বললেন, এমনি কালো জল দেখলেই আমার মনে হয়, শুকনো দীঘির সিঁড়ির ওপর পদ্মের মতো পা ফেলে নিচে নামছেন কমলাদেবী। সাপের ফণার মতো জল উঠছে—তাঁর পা স্পর্শ করছে—তাঁর বুকে—তাঁর মাথা ডুবছে—ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে তাঁর মেঘবরণ চুল—

বিলের বুক থেকে একটা হু-হু করা বাতাসে যেন কার দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল।

—

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

www.boiRboi.blogspot.com

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com